শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
২৫টি
প্রেমের গল্প

২৫টি প্রেমের গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

কোথায় কী আছে

কথা

তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে টুপু।

এ কথা প্রায়ই টুপুকে বলার জন্য যায় কুশল। বলা হয় না। কী করে হবে? টুপু যে বড্ড ব্যস্ত।

কুশল কলকাতায় এসেছে চার বছর। একটা বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং শেখানোর স্কুল থেকে সে লেদ মেশিনের কাজ শিখেছিল। তার বেশি আর কী করার ছিল তার? গাঁয়ে তার বাবা মারা গেছে, কিন্তু চাষবাসের জমি আর অল্প—অল্প কিছু জীবনবিমার টাকা পেয়েছিল। তাও ভাগীদার অনেক। বিধবা মা আছে, এক দাদা আর এক ভাই আছে, ছোটো একটা বোনও। দাদা চাষবাসও দ্যাখে, সেই থেকেই সংসার চলে। কুশল কলকাতায় এসেছিল ভাগ্যের অন্বেষণে। তেমন কিছু হয়নি তার। তবে মাথাটা পরিষ্কার বলে সে মেশিনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেয়। কিন্তু কাজ পাবে কোথায়? মূলধনও নেই যে ব্যাবসা করবে। সেই ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মালিক সুধীর ভদ্র তখন তাকে ডেকে বলে— তোমার তো বেশ পাকা মাথা, কাজ না পেলে আমার এখানেই শেখাতে লেগে যাও বাপু, হাতখরচ পাবে, থাকার জায়গাও দেব।

এক অনিচ্ছুক মামাবাড়িতে প্রায় জোর করে থাকত কুশল। তারা তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কুশল বড়ো মিষ্টভাষী আর সৎ চরিত্রের বলে একেবারে ঘাড় ধাক্কা দিতে পারছিল না। কিন্তু কুশলের বড়ো লজ্জা করত। থাকার জায়গা পেয়ে সে এবার উঠে এল হ্যারিসন রোডের স্কুলের বাড়িতেই।

তো এই হচ্ছে কুশলের অবস্থা। একশো টাকার কাছাকাছি তার রোজগার। থাকার জায়গার ভাড়া লাগে না, নিজে রেঁধে খায়। কষ্টে তার চলে যায়। তবে কুশল সবসময়েই জীবনের আলোকিত দিকগুলোই দেখতে পায়। যেন জগৎসংসারকে দু—ভাগ করে একটা সৌভাগ্যের আলো আর দুর্ভাগ্যের অন্ধকার পাশাপাশি রয়েছে। অন্ধকারে যারা আছে তারা আলোর দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, আবার আলো থেকে অন্ধকারেও কাউকে—কাউকে চলে আসতে হয়। কুশল তাই কখনো হাল ছাড়ে না। কিছু হবে, কিছু একটা হবে। হবেই।

তাই এই অন্ধকারের জীবনে ফুলগন্ধের মতো, জ্যোৎস্নার মতো একটাই আনন্দ আছে। সে হল টুপু।

তাদের গাঁয়ের পুরুতবাড়ির মেয়ে ছিল। বড়ো সুন্দর দেখতে। কত ছোট্ট ছিল। টুপু এখন কলকাতায় এসে খুব অন্যরকম হয়ে গেছে। খুব অল্প আয়াসেই টুপু তার দুর্ভাগ্য জয় করে আলোর দিকে চলে গেছে। সিনেমার অভিনেত্রী হিসেবে তার খুব নামডাক। তার অনেক ভক্ত, অনেক চাহিদা।

কুশলের তাতে কিছু যায় আসে না। সে মাঝে—মাঝে টুপুদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যায়। টুপুর মা আছে, বাবা আছে, একটা ভাইও আছে। তারা এখন সব বড়োলোকের মতো থাকে। ছোট্ট বাগান ঘেরা তিনতলা বাড়ি, গেটে দারোয়ান, শিকলে বাঁধা কুকুর, হুট বলতে ঢোকা যায় না।

তবু কুশল ঠিকই ঢোকে। আর আটকায় না। ওরা যে তাকে অনাদর করে তা নয়, উপেক্ষাও করে না। আবার খুব একটা আদর আপ্যায়নও নেই।

যেমন ওর বাবা বলে— ওঃ কুশল! কী খবর?

মা বলে— কী বাবা, কেমন! খবর সব ভালো?

তার পরই আর তেমন কথা—টথা হয় না।

কুশল দেখতে খুব সুন্দর নয়, আবার খারাপও নয়। সিনেমার নায়ক হিসেবে তাকে মানায় না ঠিকই, কিন্তু রাস্তায় ঘাটে দু—চারজন তার দিকে তাকিয়ে দেখে। মেশিন চালিয়ে তার চেহারা মেদহীন এবং পোক্ত। মুখশ্রীতে বুদ্ধি এবং অসম্ভব ভালোমানুষির ছাপ আছে। সুধীরবাবু টাকাপয়সার বিষয়ে চোখ বুজে তাকে বিশ্বাস করেন।

টুপুর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। বেশিরভাগ সময়েই তাকে বাইরে থাকতে হয়, নয়তো বাড়িতে ঘুমোয়, নয়তো বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইচই করে। তবু দেখা হলে সে—ই সবচেয়ে আন্তরিক ব্যবহার করে। বলে— কুশলদা, আজ বাড়িতে খেয়ে যেয়ো। তোমার দাদা কী করছে এখন? মা কেমন আছে? পুন্তিকে অনেককাল দেখি না। তার তো বিয়ের বয়স হল।

পুন্তি কুশলের ছোটোবোনের নাম। এসব টুপুর মুখে শুনতে বড়ো ভালো লাগে।

কুশল বড়ো লাজুক। টুপুর সুন্দর মুখখানার দিকে ভালো করে চাইতে পারে না। মাথা নত করে বলে— আমরা বড়ো গরিব হয়ে গেছি টুপু।

টুপু বলে— আহা, কী কথা। গরিব হওয়া কি অপরাধ নাকি! এই বলে সান্ত্বনা দেয় টুপু। কখনো বলে— তোমার যদি টাকার দরকার হয় তো নিয়ো কুশলদা, লজ্জা কোরো না।

—না, না, টাকার দরকার নয় টুপু। এই মাঝে—মাঝে তোমাদের দেখে যাই শুধু। বেশ লাগে।

—দেখে যেয়ো। আমাদেরও ভালো লাগে। তুমি যেন কী করো কুশলদা?

—একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কনসার্নে ইনস্ট্রাক্টর।

—ও বাবা, সে তো ভালো চাকরি! বলে টুপু ভ্রূ তোলে।

মিথ্যে কথা বা ফাঁপানো কথা কুশলের মুখে আসে না। তাই সে টুপুর ভুল ধারণা ভাঙার জন্য তাড়াতাড়ি বলে— না, না, সে খুব ছোট্ট একটা কারিগরি স্কুল, আর ইনস্ট্রাক্টর বলতে—

কিন্তু অত কথা শোনার সময় টুপুর প্রায়ই হয় না। হয়তো চাকর এসে খবর দেয় যে গাড়ি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। কিংবা ছুকরি একটা সেক্রেটারি এসে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আসল কথাটাই বলা হয় না।

অবশ্য কথাটা যে কী তা আজও ভালো জানে না কুশল। কেবল তার মন বলে— তোমার সঙ্গে আমার যে অনেক কথা ছিল টুপু।

দুই

একবছর আর তেমন অবসর পেল না কুশল। সুধীরবাবুর স্কুল থেকে একটা পুরোনো মেশিন কিস্তিবন্দিতে কিনে নিয়েছিল সে। হাওড়ায় একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে ব্যাবসা শুরু করেছিল। লাভা—লাভের দিকে তাকায়নি, ভূতের মতো খেটে সে সুধীরবাবুর টাকা শোধ করে দিল সময়ের আগেই। আরও একটা মেশিন কিনল। আরও একটা।

ব্যাবসা শুরু করলে বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। সেইরকম এক যোগাযোগে সে এক কালোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। কিছু টাকা লাগায় তার লোহার কারবারে, বেশ কিছু লাভ পেয়ে যায়। একবছরের মধ্যে তার গা থেকে হাঘরের ভাবটা ঝরে গেল।

টুপুর বাড়িতে একদিন মিষ্টি—টিষ্টি নিয়ে দেখা করতে গেল।

টুপুর বাবা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। তার মা খুব বিষণ্ন মুখে একটু খবরাখবর নিলেন।

বললেন— বাবা, আর তো দেখি খোঁজ নাও না!

—সময় পাই না পিসি। বড্ড কাজ। অভাব দূর করার চেষ্টা বড়ো মারাত্মক, হাড়মজ্জা শুষে নেয়।

—সে তো জানি বাবা। তবু বলি, অভাবই ভালো। প্রাচুর্য মানুষকে বড়ো অমানুষ করে দেয়।

কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার বুঝল না কুশল।

—সুখে থেকো, সৎ থেকো। এই বলেন টুপুর মা।

টুপুর সঙ্গে দেখা হল না। সে ঘুমোচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত।

সেই কথাটা আজও টুপুকে বলা হয়নি। কী কথা তা অবশ্য সে নিজেও জানে না। হয়তো সে বলতে চায় — তুমি খুব সুন্দর টুপু। কিংবা— আমি তোমাকে ভালোবাসি টুপু।

বলেই বা কী হবে? এসব তো কত লোকেই টুপুকে বলে। তবু বলতে ইচ্ছে করে কুশলের।

লোহার ব্যাবসা খুব ভালো লাগছিল না তার। একেই অংশীদারি তার পছন্দ নয়, তার ওপর আয় এক জায়গায় উঠে আটকে যায়। তাই সে মূলধন তুলে নিয়ে লিলুয়ায় নিজের মতো ছোট্ট ঢালাইয়ের কাজ শুরু করল। লোহার বড়ো টানাটানি বাজারে। মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। টাকাও আসে। তবু ঠিক খুশি হতে পারে না সে। একটা কাটিং মেশিন নিলামে কিনল। পাঁচ রকম ব্যাবসার কাজে টাকা ঢালতে লাগল। বড়োভাই চাষবাস নিয়ে রইল বটে, কিন্তু ছোটোভাইটাকে আনিয়ে নেয় কুশল। দুই ভাই মিলে সাংঘাতিক খাটে।

টুপুর বাড়িতে যেতে সেদিন দেখা হয়ে গেল।

—আরে কুশলদা, কেমন আছ? তোমাকে খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—না—না। দাড়ি কামিয়েছি তো, তাই।

—তার চেয়ে কিছু বেশি। বলে টুপু হাসে— তোমার উন্নতি হচ্ছে বোধহয়। চেহারায় ছাপ পড়েছে।

কুশল বলে— তোমার চেহারা একটু খারাপ দেখছি টুপু। কী হয়েছে?

—কী হবে? বড্ড ডায়েটিং করতে হয়। খাটুনিও তো খুব!

—আজকাল তোমার ছবি বড়ো একটা দেখি না তো।

—হচ্ছে। অনেক হচ্ছে। এই বলে টুপু খুব অস্থিরতা আর চঞ্চলতার সঙ্গে একটা সিগারেট ধরায়।

ভীষণ অবাক হয় কুশল। চেয়ে থাকে।

—কিছু মনে করো না কুশলদা। নার্ভের জন্য খাই। আমার নার্ভ বড্ড সেনসিটিভ, ধোঁয়ায় একটু শান্ত থাকে।

—বেশি খেয়ো না। দমের ক্ষতি হয়। খুব ভালো আর শান্ত গলায় কুশল বলে।

—বেশি না। মাঝে—মাঝে খাই, নেশা—টেশা নেই।

আসলে নেশাই। কুশল সেটা টের পায়।

টুপুর মা দেখা হতে অনেকক্ষণ অন্য কথা বলে তারপর বলেন— বাবা, পেটের মেয়ে, পণ্ডিত বংশের সন্তান, বলতে নেই টুপু আজকাল মদও খায়। ভীষণ মাতলামি করে। কাউকে বোলো না।

অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কুশল বলে— পিসি, খায় তো খাক। তুমি বেশি ঝগড়া—টগড়া কোরো না এ নিয়ে। ওর কাজের স্ট্রেন তো হয়, তাই খায়। ওকে রেস্টোরেটিভ বলে, মদ—খাওয়া নয়।

—তুমি বাবা, সব কিছুর ভালো দ্যাখো। আমি দেখি না। ছেলেটাও সিনেমার লাইনে ঢুকবে—ঢুকবে করছে। বারণ করি, শোনে না।

কুশল আবার ভেবে বলে— টুপুর বুঝি আর তেমন চাহিদা হচ্ছে না পিসি? আজকাল ওকে নিয়ে ছবি হয় না তো।

—হয় না তো কী করবে! জীবনে ওঠা—পড়া আছেই। আমি বলি, এবার ভালো আর সৎ দেখে পাত্র খুঁজে বিয়ে করে ফেলুক। সিনেমার নটী সাজা ঢের হল। ওদের বামুন—পণ্ডিতের বংশের রক্তে কি ওসব

সয়!

ভাবতে—ভাবতে কুশল চলে আসে।

স্কুলে থাকতে কবিতা পড়েছিল, সন্ন্যাসী উপগুপ্তর সঙ্গে বাসবদত্তার প্রেম হয়েছিল বুঝি! তো টুপুর সঙ্গে একদিন কি তার সেরকমই হবে?

হতেও পারে।

তিন বছরের মাথায় কুশল দেখল, তার অনেক টাকা। শুধু হয়েছে নয় আসছেও।

ঢালাইয়ের কারখানার জায়গা বদল হয়েছে। ছোট্ট কিন্তু বেশ ভালো একটা ফাউন্ড্রি খুলে ফেলেছে দুই ভাই। দেশের বাড়ি মস্তবড়ো করে করেছে। পুকুর কাটা হয়েছে। চাষের জমিও কিনেছে অনেক। দাদা সেসব দেখাশোনা করছে। কাজের সুবিধের জন্য একটা গাড়ি কিনে ফেলেছে কুশল।

সেই গাড়িতে একদিন গেল টুপুর বাড়ি।

টুপু সব দেখে বলল— কুশলদা, তুমি সত্যিই উন্নতি করেছ।

—আরে না, না। কোম্পানির গাড়ি।

—ওই হল। কোম্পানি তো তোমারই।

কুশল লজ্জা পায়। বড়োলোকি দেখাতে সে তো আসে না। সে আসে টুপুকে একটা কথা বলবে বলে।

আজও বলা হয়নি।

তিন

টুপু একজন প্রডিউসারকে বিয়ে করল, কুশল খবর পায় এক পত্রিকায়।

গিয়ে দেখে মা খুব খুশি নয়।

বললেন— দোজবরে বাবা, আগের বউকে বিদেয় করেছে। তা টুপুকেই কি রাখবে। বড়ো ভয় করে। বড়োলোকি বিয়ে আমার একদম পছন্দ নয়। বিয়ে ওরা করে না। আসল বিয়ে হয় মধ্যবিত্ত পরিবারে।

পিসি বলেছিল অদ্ভুত।

ওরা হানিমুন করতে জাপান না কোথায় গিয়েছিল। ঠিক তিন মাস বাদে ফিরে এসেই টুপু তার বরকে ডিভোর্স করে।

খবর পেয়ে ছুটে গেল কুশল।

—কী হল টুপু? বিয়ে ভেঙে দিলে?

—দিলাম। ওর হৃদয় নেই।

—আগে জানতে না?

—জানতাম। তবু ঢুকে দেখলাম আছে কি না।

—ঢুকতে গেলে কেন টুপু? শরীরটা খামোখা এঁটো করলে।

মুখ ফসকা কথা। কুশল জিভ কাটল।

কিন্তু টুপু রাগ করল না। খুব অন্যমনস্ক হয়ে বলল— ঠিক বলেছ। এঁটো হয়ে এলাম। তবে অনেক টাকা পেয়েছি।

কুশল বলল— ভালো। টাকাগুলো রেখো। অসময়ে টাকা মানুষকে খুব দ্যাখে।

টুপু এই প্রথম কাঁদল কুশলের সামনে।

বলল— টাকা আর নাম আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে কুশলদা। তুমি তো উন্নতি করেছ, আমি যদি কখনো রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাই তো কিছু ভিক্ষে দিয়ো।

—ছিঃ টুপু, ওকথা বোলো না। টাকা রেখো। আর দরকার হলে নিয়ো আমার কাছ থেকে। লজ্জা কোরো না।

—বড়ো লজ্জা কুশলদা। বড়ো লজ্জা।

আলোর পৃথিবী এগিয়ে আসছে।

কুশল বুঝতে পারে, সে নিজে সৌভাগ্যের আলোর চৌকাঠে পা রেখেছে, কিন্তু টুপুর সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়ার নয়। কারণ টুপু আলোর জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে চলে আসছে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার জগতে, সে—ও সেই যাত্রাপথে অন্ধকারের চৌকাঠে পা রেখেছে, ঠিক এই সীমানায় তাদের প্রথম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আজও বলতে পারল না কুশল। কিন্তু মন বলল— তোমার সঙ্গে আমার যে একটা খুব গোপন কথা আছে টুপু।

আজকাল কুশলের সময় বড়ো কম। কলকাতার ব্রাবোর্ন রোডে তার নতুন শোরুম আর সেলস অফিস চালু হল। তার ওপর আবার জাপানি একটা কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনে চাষের যন্ত্র—লাঙল তৈরি করবে বলে সে গেল জাপান। ওই পথে দূর— প্রাচ্যের সব দেশ দেখে এল। কারখানা খোলার জায়গা পেল কলকাতার কাছেই। বড্ড পরিশ্রম গেল ক—দিন। বয়সও তো প্রায় সাঁইত্রিশ—আটত্রিশ হয়ে গেল। এখন শরীর না হোক মনটা বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মা বিয়ের তাগাদা দেয়। কুশল রাজি হয় না। ছোটোবোনের বিয়ে দিল বড়োলোকের বাড়িতে। সেই বিয়েটা আসলে একটা অলিখিত চুক্তি। আত্মীয়তার সূত্রে যাদের পেল তারা সমাজের ওপরতলার ভালো সব যোগাযোগের মধ্যমণি। এইসব বুদ্ধি এখন মাথায় খুব খেলে কুশলের।

কিন্তু তবু ক্লান্তি তো ছাড়ে না। যোধপুরের প্রকাণ্ড বাড়িতে ফিরে যখন কখনো অবসর কাটায় তখন বড়ো একা আর ক্লান্ত লাগে। মেয়েলি স্পর্শ জীবনে বড়ো দরকার। মেয়েরা হল পুরুষের বিশ্রাম, একটু সৌন্দর্য, আশ্রয়।

কিন্তু বিয়ে করবে কী করে কুশল? সেই কথাটা যে আজও টুপুকে বলা হয়নি। তাই সে ছোটোভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। অনেকদিন ধরেই এক সরকারি হর্তাকর্তা তাঁর মেয়েকে কুশলের ঘরে দেওয়ার জন্য অস্থির। কুশল তাঁকে তাই বিমুখ করল না। নিজে বিয়ে না করে ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিল।

আজও বড়ো লাজুক কুশল, এখনও যতদূর সম্ভব সৎ ও সচ্চচরিত্র। এখনও তার চেহারায় তীকষ্ন বুদ্ধি ও অসম্ভব ভালোমানুষির ছাপ রয়ে গেছে।

খুব সকালবেলায় একদিন একটা পুরোনো গাড়িতে টুপু এসে তার বাড়ির সামনে নামল। খুবই কুণ্ঠিত আর লজ্জিত ভঙ্গিতে এল ভিতরে।

বলল— তুমি কী ভীষণ বড়োলোক হয়ে গেছ! কী করে হলে?

লজ্জিত কুশল বলে— শোনো টুপু, ওসব কথা বোলো না। মেয়েরা টাকাপয়সার কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে— আমার খবর জানো?

— জানি টুপু, তুমি আজকাল একদম কন্ট্রাক্ট পাচ্ছ না। খবর নিয়ে জেনেছি, তুমি অনেক টাকা চাও বলে কেউ তোমাকে ছবিতে নেয় না! তার ওপর তুমি শুটিংয়েও যাও না ঠিকমতো।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে— আরও আছে। আমি নাকি নতুন নায়কদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছি। প্রায়ই নাকি ইউনিট থেকে তাদের কাউকে নিয়ে ইচ্ছেমতো চলে যাই ফুর্তি করতে। এসব শোনোনি?

—শুনেছি।

—বোগাস এর কিছুই সত্যি নয় কুশলদা। এখন আমি ঘর থেকে মোটেই বেরোই না। অন্ধকারে বসে—বসে কাঁদি।

—কেন কাঁদো টুপু। তোমার দুঃখ কী?

—বোঝো না? মানুষ যখন গুরুত্ব হারায়, যখন নিজের ধর্ম থেকে, ভিত থেকে নড়ে যায় তখন যে দুঃখ তার তুলনা নেই।

—বাজে কথা টুপু। তুমি গরিব বামুনের মেয়ে। তোমার ধর্ম বলো, ভিত বলো, গুরুত্ব বলো, তার কিছুই তো তুমি পাওনি। যা পেয়েছিলে, যে অর্থ যশ ও গুরুত্ব, তা তোমার পাওনা জিনিস ছিল না। একটু ভেবে দ্যাখো।

—তবে কী আমার পাওনা ছিল?

কুশল ভেবে বলে— বোধহয় ভালোবাসার মানুষের জন্য কষ্ট করার তৃপ্তিই মানুষের সবচেয়ে বড়ো পাওনা।

—ও বাবা, তুমি খুব কথা শিখেছ আজকাল। শিখবেই, বড়োলোক হয়েছ তো। বড়োলোকদের সব কথা বলবার অধিকার আছে।

কুশল যন্ত্রণায় কাতর স্বরে বলে— না টুপু। আমাকে বড়োলোক বোলো না। আমি চেষ্টা করেছি মাত্র। চেষ্টাই মানুষের জীবন। বিষয়ের পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন কি সবার হয়?

—আমি অত বুঝি না কুশলদা। আমি বলতে এসেছি আমি একটা ছবি প্রডিউস করব। টাকা দাও। শেষবার একটা চেষ্টা করে দেখি।

—দেব। কুশল বিনা দ্বিধায় বলে।

চার

উপগুপ্ত আর বাসবদত্তার কবিতাটার শেষে যা ছিল, তাই বুঝি ঘনিয়ে আসে। ছবিটা একদম চলল না। কুশল জানত, তাই টাকাটাকে খরচের খাতায় ধরে রেখেছিল।

প্রেস শো—তে তার পাশেই বসে ছিল টুপু। বলল— চলবে না, না গো কুশলদা?

কুশল খুব দুঃখিত মনে মৃদুস্বরে বলে— বোধহয় না।

—কেন কুশলদা? আমি তো আমার সর্বস্ব দিয়ে অভিনয় করেছি, গল্পটাও ভালো ছিল। সবই চেষ্টা করেছি।

কুশল তেমনি মৃদুস্বরে বলে— টুপু, কেন এত করলে? এর চেয়ে অনেক কম কষ্টে সুখী হওয়া যেত জীবনে।

বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টুপু একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে এখন। একা—একা। মা আর ভাই আলাদা থাকে। তাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না টুপুর।

তার সেই অ্যাপার্টমেন্টে বিরাট পার্টি দিয়েছে টুপু তার জন্মদিনে। কুশলকেও নিমন্ত্রণ করেছে। কুশল সময় পায় না, তবু সময় করে গেল পার্টিতে।

গিয়ে দেখে, ফ্ল্যাটটা একদম ফাঁকা। রাশি—রাশি খাবার সাজানো টেবিলে, ঘরদোরে প্রচুর আলো, সাজগোজ। তবু কেউ নেই। এমনকী একটা বুড়ি ঝি ছাড়া অন্য কাজের লোকও কেউ নেই। টুপু একটা সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরে এলোচুলে জানলার ধারে বই পড়ছে। মুখটা ম্লান, কিন্তু প্রসাধনহীন বলে তার সেই কৈশোরের কমনীয়তাটুকু ফুটে আছে।

কুশল অবাক হয়ে বলে— কী হল, লোকজন সব কই?

টুপু বই বন্ধ করে হেসে উঠে আসে, বলে— লোকজন! তারা আবার কারা? কাউকে বলিনি তো? শুধু তোমাকে।

—তাহলে এত আয়োজন দেখছি কেন?

টুপু অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে কুশলের মুখের দিকে। তারপর খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলে— শোনো আমি জীবনে দেদার পার্টি দিয়েছি। পার্টির শেষে যখন সবাই চলে যায়, তখন এঁটো বাসন, শূন্য মদের বোতল, ভাঙা কাচ, দলিত ফল সব পড়ে থাকে। ঘরটা বীভৎস লাগে। মনে হয় পরিত্যক্ত, ভূতুড়ে। তাই আজ কাউকে বলিনি।

—আমাকে যে বললে!

—তুমি! ওঃ, তোমার কথা আলাদা। আজ আমরা দু—জনে পার্টি করব। আর আমাদের চারিদিকে শূন্য চেয়ার, ফাঁকা ঘর, আর নির্জনতা থাকবে। কুশলদা তোমার একার জন্যই আজ পঞ্চাশজনের আয়োজন। তুমি সব এঁটো করে, নষ্ট করে যাও। আমি দেখি।

—পাগল। কুশল বলে।

—আমি পুরুষকে লজ্জা পেতে বহুকাল ভুলে গেছি। কিন্তু জানো আবার আমার খুব ইচ্ছে করে লজ্জা করতে। আমাকে একটু লজ্জা দাও কুশলদা।

—পাগল! কুশল হেভরে বলে।

—শোনো, তুমি ভাবছ আমি মদ খেয়েছি। না গো, এই দ্যাখো, শুঁকে দ্যাখো মুখ। বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। এই বলে ছোট্ট সুন্দর মুখখানা হাঁ করে কাছে এগিয়ে আনে টুপু।

কুশল ওর মুখের বাতাস শুঁকল। কী সুন্দর গন্ধ। ওইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে।

টুপু শ্বাস ফেলে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল— আজ আমার জন্মদিন কুশলদা। তুমি আমাকে কী দেবে?

সোনার একটা গয়না এনেছে কুশল! কিন্তু সেটা বের করল না। একটু ভাবল। তারপর বলল— টুপু, বহুকাল হয় তোমাকে একটা কথা বলার চেষ্টা করেছি। আজ তোমাকে সেই কথাটা বলি বরং। সেইটেই জন্মদিনের উপহার বলে নিয়ো।

—কথা! বলে টুপু হাঁ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে— এতদিন বলোনি কেন?

—সময় হয়নি। কথারও সময় আছে টুপু।

টুপু হেসে মাথা নীচু করে লজ্জায়। তারপর অল্প একটু শ্বাসকষ্টের সঙ্গে বলে— আজ বুঝি সময় হয়েছে?

—হ্যাঁ। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এবার বলি। টুপু...

টুপু দু—হাতে কান চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে— পায়ে পড়ি, বোলো না, বোলো না তো! বললেই ফুরিয়ে যাবে।

—বলব না? কুশল অবাক।

টুপু স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে হাসল। বলল— সারাজীবন ধরে ওই কথাটা একটু—একটু করে বোলো। কথা দিয়ে নয়, অন্যরকম ভাবে।

খগেনবাবু

নলতাপুরের বাসে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সামনের দিকে খগেনবাবুকে দেখতে পেল দিগম্বর। অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকে উঠল। নলতাপুরের বাসে খগেনবাবু কেন? ইদিকে তো ওনার আসার কথাই নয়। তবে কি এত বছর বাদে খবর হয়েছে।

মেয়েদের সিটে এঁটে বসে আছে জুঁইফুল। সংক্ষেপে জুঁই। জায়গা নিয়ে একটু আগে ক্যাটর ক্যাটর করে ঝগড়া করেছে অন্য সব মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তারা বলছে, জায়গা নেই। জুঁই বলছে, ঢের জায়গা, চেপে বসলেই হয়। সেই কাজিয়ায় দিগম্বর নাক গলায়নি। জুঁইয়ের গলার জোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পারেও বটে মেয়েটা। সিটে গায়ে গায়ে মেয়েমানুষ বসা, সর্ষে ছড়ালেও পড়বে না এমন অবস্থা। তার মধ্যেই ঠিক ঠেলে গুঁতিয়ে জায়গা করে বসেছে। খুব আরামে না হলেও বসেছে তো। এখন দিব্যি ঘাড় ঘুরিয়ে চলন্ত বাস থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

জুঁইয়ের মুখোমুখিই প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল দিগম্বর। প্রাইভেট বাস, কন্ডাক্টর ঠেলে লোক তোলে, যতক্ষণ না বাসের পেট ফাটো—ফাটো হয়। ফলে লোকের চাপে ঠেলা খেতে—খেতে অনেকটা সরে এসেছে সে। আরও সরত, সামনে এক বস্তা গাঁটি কচু থাকায় ঠেকে গেছে। এখান থেকে জুঁই মাত্র হাত তিনেক তফাতে। কিন্তু মাঝখানে বিস্তর কনুই, হাত, মাজা আর মাথার জঙ্গল থাকায় তিন হাতই এখন তিনশো হাত। আর বাসের মধ্যে চতুর্দিকে এমন গণ্ডগোল হচ্ছে যে, খুব চেঁচিয়ে না ডাকলে জুঁই শুনবেও না।

কিন্তু জানান দেওয়াটা একান্ত দরকার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা দাঁড়াল কিনা ব্যাপারটা। আর কেউ নয়, স্বয়ং খগেনবাবুই বাসে সামনের দিকে।

একটু আগে জুঁই যখন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিল তখন তার গলা খগেনবাবুর কানে যায়নি তো! এতদিনে অবশ্য জুঁইয়ের গলার স্বর খগেনবাবুর ভুলে যাওয়ারই কথা। আর বাসের কে না চেঁচাচ্ছিল তখন? অত চেঁচামেচিতে কে কার গলা চিনবে!

সুবিধে এই যে, বাসে একেবারে গন্ধমাদন ভিড়। একটু আগেও দিগম্বর ভিড়ের জন্য কন্ডাক্টরকে দু—কথা শুনিয়েছে, পয়সাটাই চিনলে, মানুষের সুখ দুঃখ বুঝলে না? আমাদের কি গোরু ছাগল পেয়েছে, নাকি তামাকের বস্তা? এখন অবশ্য দিগম্বর মনে—মনে বলছে, ভিড় হোক, বাবা, বাসে আরও ভিড় হোক। গাড়ির পেট একেবারে দশমেসে হয়ে যাক।

খগেনবাবুকে দেখেই ঘাড়টা নামিয়ে ফেলেছে দিগম্বর। এখনও সেটা শোয়ানো অবস্থাতেই আছে। সুযোগ বুঝে পিছন থেকে কে যেন হাত ভেরে যাওয়ায় নিজের হাতব্যাগটা আলতো করে তার কাঁধে রেখেছে। অন্য সময় হলে খেঁকিয়ে উঠত, এখন কিছু বলল না। বরং ব্যাগটার আড়াল থাকায় একরকম স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তিটা বড়ো ঠুনকো। সানকিডাঙায় বেশ কিছু লোক নেমে যাবে, হত্তুকিগঞ্জে আজ হাটবার—সেখানে তো বাস একেবারে শুনশান হয়ে যাওয়ার কথা। তবে উঠবেও কিছু সেখান থেকে। কিন্তু তা ওঠানামার ফাঁকেই খগেনবাবু যে পিছনে তাকাবেন না এমন কথা হলফ করে কি বলা যায়। জুঁইকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এদিকে তাকাচ্ছে না। নতুন—নতুন কারণে অকারণে তাকিয়ে থাকত। পুরোনো হওয়ায় এখন আর চোখেই পড়ে না।

ভেবে একটু অভিমান হচ্ছিল দিগম্বরের। এই যে সে ভালোমানুষের চাপে অষ্টাবক্র হয়ে গাঁটি কচুর বস্তায় ঠিক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যে 'আহা, উহু', করার আছে কে এই দুনিয়ায়?

কিন্তু অভিমানের সময় নেই। জানান দেওয়াটাই এখন ভীষণ দরকার। গলা তুলে ডাকতে পারছিল না দিগম্বর। খগেনবাবু শুনে ফেলবে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জুঁইয়ের প্লাস্টিকের চটি পরা একটা পা একটু এগিয়ে আছে। চেষ্টা করল পা বাড়িয়ে জুঁইয়ের পা—টা হয়তো ছোঁয়া যায়।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যেই না পা তুলেছে অমনি হড়াস করে কচুর বস্তায় বসা লোকটার কোলসই হয়ে গেল দিগম্বর। লোকটা খুন হওয়ায় আগে যেমন মানুষে চেঁচায় তেমনি চেঁচাতে থাকে, ওরে বাবারে! গেলাম! গেলাম!

দিগম্বর বুঝল, হয়ে গেছে। এই গোলমালে খগেনবাবু নিশ্চয়ই তাকাবে। সে মুখ তুলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ! চুপ!

লোকটা কোঁকাতে—কোঁকাতেও তেজের সঙ্গে বলে, কেন চুপ করব? চুরি করেছি নাকি? কোথাকার ঢ্যামনা হে তুমি? ওপরের শিক ভালো করে ধরতে পারো না? ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

কাঁকালে লেগেছিলে দিগম্বরের। গাঁটি কচু যে বাসের ছাদেই ওঠানো উচিত, বাসের ভিতরে নয়, সে কথাটা তুলতে পারত। কিন্তু খগেনবাবুর ভয়ে বলল না কিছু।

ভেবেছিল চেঁচামেচি শুনে সবাই তাকাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল, চারদিকে হাটুরে গণ্ডগোলে ব্যাপারটা লোকে গ্রাহ্যই করেনি। জুঁইও আচ্ছা লোক বটে। সামনেই এতবড়ো কাণ্ড ঘটে গেল, একবার তাকাবে তো! তা নয়, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঠঘাট দেখছে।

বাস থামে। চলে। আবার থামে। দিগম্বরের দু—জোড়া চোখ থাকলে ভালো হত। তবু সাধ্যমতো সে খগেনবাবু আর জুঁইয়ের দিকে নজর রাখে। খগেনবাবুর কপালের বড়ো আঁচিলটা এখনও দিব্যি আছে। মাথার চুলে বাঁকা টেরি। গায়ে সেই একপেশে বোতামঘরওলা পাঞ্জাবি। জুঁই কালো রঙের মধ্যেই আরও ঢলঢলে হয়েছে। চোখ দু—খানা আগের মতো চঞ্চল নয়। ধীরস্থির।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিগম্বর। পাপ কাজ করলে ধরা পড়ার ভয়ও থাকে বটে। কিন্তু এই হাওড়া জেলার নলতাপুরের বাসে খগেনবাবুর দেখা পাওয়ার কথাই নয়। পেট থেকে একটা ভয়ের ভুড়ভুড়ি গলায় উঠে আসায় দিগম্বর একটা ঢেঁকুর তুলল।

জুঁইয়ের মাথার ওপর দিকে কে একজন জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে! তার বগলটা জুঁইয়ের নাকের ডগায়। জুঁই দুর্গন্ধ পাওয়ার মতো নাক কুঁচকে মুখ তুলে বগলবাজকে কী যেন বলল। জয় মা! যদি এবার তাকায়!

তা তাকালও, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে চ্যাপটা দিগম্বরকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বগলবাজ ধমক খেয়ে তার বগল গুটিয়ে নিয়েছে। যত সব মেনিমুখো পুরুষ! বগলটা আর একটু রাখলে আবার তাকাত জুঁই।

সানকিডাঙা! সানকিডাঙা! দিগম্বরের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কন্ডাক্টর।

বাস থেমেছে! হুড় হুড় করে লোক নামছে। দিগম্বর পাটাতনে উবু হয়ে বসে। সর্বনাশ! বাস খালি হয়ে যাবে নাকি! নেমেই যাচ্ছে যে!

উবু হওয়ায় জুঁইয়ের চটির ডগাটা হাতের কাছে পেয়ে গেল সে। ভিড়ও অনেক কমেছে। হাত বাড়িয়ে একবার নাড়ল। কচুওয়ালা বড়ো—বড়ো চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। কিছু বলতে মুখটা ফাঁকও করেছিল বোধহয়। কিন্তু তা দেখার অত সময় নেই দিগম্বরের।

জুঁই পা—টা পট করে টেনে নিয়ে সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, ও কী গো?

এমন সুযোগ আর আসবে না। দিগম্বর একটু হামা টেনে মুখটা কাছে নিয়ে বলল, বাসের সুমুখ দিকে খগেনবাবু। তাকিয়ো না বোকার মতো। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বোসো।

শুনে কেমনধারা ফ্যাকাশে মেরে গেল জুঁই। দু—বার বলতে হল না। ফট করে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলল।

সানকিডাঙায় নামল যত, উঠলও তত। আবার ঠাসা—চাপা গন্ধমাদন ভিড়। তবে দিগম্বর বসে ছিল, বসেই রইল। দু—একজন হাঁটুর গুঁতো দিয়ে অবশ্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। বলল, দাঁড়াও! দাঁড়াও! বসলে জায়গা আটকে থাকে। দিগম্বর কাতর মুখ করে বলল, শরীর খারাপ। বড়ো বমি আসছে। শুনে লোকজন আর কিছু বলল না, বরং একটু যেন তফাতে চেপে থাকারই চেষ্টা করতে লাগল। কচুওয়ালা মহা ত্যাঁদড়! কিছু আঁচ করে মাঝে—মাঝে শেয়ালের মতো চাইছে। দিগম্বর তার দিকে চেয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলল, হত্তুকিগঞ্জের হাটে যাচ্ছ নাকি? কচুওয়ালা দিগম্বরকে পাত্তা না দিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছোটোলোক আর বলে কাকে!

বসে থেকে চারদিকে বাঁশবনের মতো লোকের পা দেখে দিগম্বর। পা দেখে কে কেমন লোক তা বোঝা যায় না। মুখ দেখে যায়। বেশিরভাগ পা—ই প্যান্ট ধুতি পায়জামা আর লুঙ্গিতে ঢাকা। এর ফাঁক—ফোঁকর দিয়ে অবশ্য জুঁইকে দেখতে পাচ্ছে দিগম্বর। কাণ্ড দেখ! জুঁই গলা টানা দিয়ে ঘোমটা ফাঁক করে সামনের দিকে চাইছে মাঝে—মাঝে। মেয়েমানুষ কোনোকালে কথা শুনবে না। হাঁ—হাঁ করে ওঠে দিগম্বর, কিন্তু তার কথা জুঁইয়ের কানে যায় না।

বসে আরও কষ্ট। হাঁটু ঝিনঝিন করে এত টাইট মেরে বসে থাকায়। চারদিকে পা, তার ঠেলাও কম নয়। কচুর গাঁটটায় এক হাতে ভর দিতে গিয়েছিল, কচুওয়ালা তেরিয়া হয়ে বলল, ভর দেবে না। কচু থেঁতলে যাবে। দিগম্বর ফোঁস করে ওঠে, আর তুমি যে বসেছ কচুর ওপর! কচুওয়ালা তার জবাব দিল, আমার কচু। আমি বসব তোমার তাতে কী যায় আসে?

বিপদে পড়লে সবাই মাথায় চড়ে। দিগম্বর আর কথা বাড়ায় না।

কখন যেন একটা মেয়েছেলে নেমে যাওয়ায় জুঁই একটু এগিয়ে এসে বসতে পেরেছে! এখন প্রায় দিগম্বরের মুখোমুখি। হঠাৎ ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা নামিয়ে এনে বলল, কোথায় দেখলে? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিগম্বর দাঁত কিড়মিড় করে। আহা, দেখার জন্যে একেবারে আঁকপাঁকু যে। দু—দুটো বউ পেরিয়েও মেয়েছেলেদের ব্যাপারটা আজও ধাঁধা লাগে দিগম্বরের। কী যে চায় তা ওরাই জানে।

সে চাপা ধমক দিয়ে বলল, আছে আছে। ঘোমটা টেনে চুপ মেরে বসে থাক। খবরদার তাকাবে না।

কচুওয়ালা সব শুনেছে। ভারি লজ্জা লাগে দিগম্বরের।

ভুল দ্যাখোনি তো! জুঁই বলে।

জলজ্যান্ত খগেনবাবু। ভিড় টপকে দেখবে কী করে? দাঁড়ালে দেখা যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখব?

আ মোলো? একজন বসা মেয়েমানুষের হাঁটুতে কপালটা ঠুকে গেল দিগম্বরের। বলল, পাগল হলে নাকি?

আহা আমার তো ঘোমটা আছে। দেখব?

মরবে বলছি, মরবে!

জুঁই আবার সোজা হয়ে বসে। দেখার চেষ্টা করে না ঠিকই। তবে বে—খেয়ালে ঘোমটা অনেক সরে গেছে।

হত্তুকির হাট! হত্তুকির হাট! কন্ডাক্টর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেনবাবু কোথায় নামবে তা জানা নেই। কাঁটা হয়ে থাকে দিগম্বর। চারদিকে পায়ের যে ঘন বাঁশবন ছিল তা এক লহমায় ফাঁকা—ফাঁকা হয়ে এল। হত্তুকির হাট জায়গাটা বড়ো ভয়ের। এখানেই সবচেয়ে বেশি লোক নামে। এমনকী কচুওয়ালা পর্যন্ত তার গাঁট কাঁধে তুলছে। সামনে একটা আড়াল ছিল। তাও গেল। গাঁট তুলতে—তুলতে কচুওয়ালা কটমট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। কিছু লোক আছে কিছুতেই অন্য মানুষকে ভালো চোখে দেখে না।

দিগম্বর চোখ বুজে ভগবানকে বলছিল, খগেনবাবুর যেন এখানেই কাজ থাকে।

বেহায়া মেয়েছেলেটাকে দ্যাখো। ঘোমটা প্রায় খসে পড়েছে। মুখখানা উদোম খোলা। গলা টানা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ড্যাবা ড্যাবা চোখে। লজ্জার মাথা খেয়ে দিগম্বর জুঁইয়ের কাপড় ধরে টান দিল। চাপা গলায় বলল, বসে পড়ো। বসে পড়ো।

জুঁইয়ের জ্ঞান ফেরে। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর কুঁজো হয়ে দিগম্বরকে বলে, দেখেছি।

দিগম্বর কটমট করে তাকায়। বলে, উদ্ধার করেছ। তোমাকে দেখেছে?

না। এদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে কারা আছে মনে হল। তারা বসে আছে বলে দেখা গেল না। আবছা যেন মনে হয়, বউ মতো কেউ। তার সঙ্গে কথা বলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। বলেই জুঁই আবার সোজা হয় এবং ফের অবাধ্য হয়ে সামনের দিকে টালুকটলুক চেয়ে থাকে।

বাসের মাথায় ধমাধম মাল চাপানোর শব্দ হচ্ছে। বিস্তর চেঁচামেচি। কাতারে লোক উঠছে ভিতরে। অনেক ধমক চমক অপমান সয়েও দিগম্বর বসেই থাকে। সামনে বাঁশগেড়ের খাল। পুরোনো পোল দু—বছর আগের বানে ভেসে গেছে। নতুন পোল তৈরি হচ্ছে সবে। ফলে বাস ওপারে যায় না। যাত্রীরা একটা বাঁশের সাঁকো পায়ে হেঁটে পেরিয়ে ওপাশে বাস ধরে। বাঁশগেড়েতে বাস থেকে নামলে কী হবে তাই ভাবে দিগম্বর, আর বিরক্ত চোখে জুঁইয়ের কাণ্ড দেখে! নতুন—নতুন যেমন তাকে অপলক চোখে দেখত, এখন ঠিক সেই চোখে সামনের দিকে চেয়ে খগেনবাবুকে দেখছে! মেয়েছেলেদের কি ভয়ভীতি নেই?

ভিড়টা আবার চেপে আসার পর বুকে আটকানো দম ছাড়ে দিগম্বর। জুঁই এখনও দেখছে। বিরক্তি কেটে এবারে একটু মায়া হল দিগম্বরের। জুঁইকে দোষ দেওয়া যায় না। একসময়ে তো খগেনবাবুরই বিয়ে করা বউ ছিল জুঁই। চার—পাঁচ বছর সুখে দুঃখে টানা ঘরও করেছে। তারপর না হয় পালিয়ে এসেছে দিগম্বরের সঙ্গে। তা বলে তো আর সব কিছুই ভুলে যাওয়া যায় না। দিগম্বরের সঙ্গে আছে মাত্র চার বছর, ভুলে যাওয়ার পক্ষে সময়টাও বেশি যায়নি। বাচ্চচা কাচ্চচা হয়নি ভাগ্যিস! হলে এতক্ষণে বোধহয় গিয়ে হামলে পড়ত।

জুঁই হঠাৎ আবার নীচু হল। বলল, সঙ্গের জন মেয়েছেলেই বটে, বুঝলে।

হোক না, দিগম্বর তেতো মুখে বলে।

মুখটা দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য। নীল রঙের শাড়ি, জরির পাড়।

তোমাকে দেখেনি তো!

না। দু—জনে খুব কথা হচ্ছে!

হোক। তুমি মুখ ঘুরিয়ে থাকো!

পান খেল এইমাত্র। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলতে দেখলাম। মেয়েছেলেটাই পান দিল।

দিকগে। অত দেখো না, ধরা পড়ে যাবে।

জুঁই ভ্রূ কুঁচকে বলে, মেয়েছেলেটা কে বলো তো! বউ নাকি?

কে বলবে! তুমিও যা জান, আমিও তাই।

খুব বলত, আমি মরে গেলে নাকি আর বিয়ে করবে না।

আহা, তুমি তো আর মরে যাওনি!

মরার চেয়ে কম কী? মেয়েমানুষের কতরকম মরণ আছে, জানো?

জুঁই আবার সোজা হয়।

বাঁশগেড়ে এসে গেল বলে। বসে থেকেও বুঝতে পারে দিগম্বর। এইবার নামতে হবে। ভাবতে শরীর হিম হয়ে আসে। মাঝখানে শুধু পাথরগড়ে একটুখানি থামবে। তা সে পাথরগড়েই থামল বোধহয়। কারা যেন নামল সামনের দরজায়। এখানে বেশি লোক নামেও না, ওঠেও না। তাই নামবার তেমন হইচই নেই। তবু বোঝা গেল কারা যেন নামছে। খগেনবাবুই কি?

জুঁইয়ের শাড়ি ধরে আবার একটু টান মারে দিগম্বর। জুঁই নীচু হয়।

কী বলছ?

কারা নামল?

কী করে জানব? কত লোক নামছে উঠছে! কেন?

ওরা কি না?

জুঁই ফিক করে এই বিপদের সময়ে একটু হাসেও। বলে, না। কর্তা বসার জায়গা পেয়েছেন। এদিকে পিছন ফেরানো! ভয় নেই। মেয়েমানুষটাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।

দেখতে চাইছ কেন?

দেখি না কীরকম।

ভালোই হবে। খগেনবাবুর মেলা পয়সা। ভালো মেয়েছেলেই পাবে। তুমি তো খারাপ ছিলে না।

আমি তো কালো।

রংটাই কি সব?

জুঁই মুখ গোমড়া করে বলে, কর্তা অবশ্য কোনোদিন কালো বলেনি। বরং বলত, মাজা রংই আমার পছন্দ।

এদিকে কোথায় যাচ্ছে বলো তো। দিগম্বর জিজ্ঞেস করে।

কী জানি।

আত্মীয়স্বজন কেউ নেই তো।

না। তবে শ্বশুরবাড়ি হতে পারে।

দুর। এদিকে বিয়ে হলে সে খবর আমি ঠিক পেতাম।

জুঁইয়ের কথা বলায় মন নেই। আবার সোজা হয়ে বসে দেখছে। মাঝে—মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে প্রায়।

এই করতে—করতে বাসটা থেমে এল। কন্ডাক্টর ছোকরা তেজি গলায় চেঁচাল বাঁশগেড়ে, বাঁশগেড়ে। বাস আর যাবে না।

ঘচাং করে বাসটা থামতেই হুড়ুম হুড়ুম লোক নামতে থাকে। জুঁই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দিগম্বর হাত ধরে টেনে বলল, দেখেশুনে! দেখেশুনে!

জুঁই হাঁ করে চাইল দিগম্বরের দিকে, যেন চিনতেই পারছে না। চেয়ে থেকে—থেকে হঠাৎ যেন চেতন হয়ে বলে উঠল, ফরসা। খুব ফরসা। বুঝলে!

কে?

বউটা।

হোক না। তাতে তোমার কী?

জুঁই মাথা নেড়ে বলে, কিছু না। বললাম আর কী!

সাবধানে মাথা তোলে দিগম্বর। ভিড়ের প্রথম চোটটা নেমে গেছে। ধীরে—সুস্থে খগেনবাবু উঠল। ফরসা মেয়েছেলেটাও। খগেনবাবু মেয়েছেলেটার কোল থেকে একটা বছরখানেকের খোকাকে নিজের কোলে নিলে।

বলল, সাবধানে নেমো।

জুঁই প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, খোকাটা দেখেছ! কী সুন্দর নাদুস—নুদুস।

আর একটু হলেই খগেনবাবু ফিরে তাকাত। ধুতির খুঁটটা সিটের কোণে আটকে যাওয়ায় সেটা ছাড়াচ্ছিল বলে তাকিয়েও তাকাল না। সেই ফাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে জুঁইয়ের হাত ধরে টেনে নেমে পড়ে দিগম্বর। বাসের পিছনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার মতলবখানা কী বলো তো! বুদ্ধি—সুদ্ধি লোপ পেল নাকি?

জুঁই হাঁ করে দিগম্বরের দিকে তাকায়। মেঘলা আকাশের ফ্যাকাশে আলোয় ওর মুখখানা দেখায় যেন ঘোরের মধ্যে আছে। চিনতে পারছে না দিগম্বরকে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিনতে পারল যেন। বলল, বিয়েই করেছে তাহলে।

করবে না কেন? দুনিয়ায় কে কার জন্য বসে থাকে?

জুঁই মাথা নেড়ে ভালো মানুষের মতো বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

দিগম্বর উঁকি দিয়ে দেখল বহু মানুষ বাঁশের সাঁকো পেরোতে লাইন দিয়েছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার মধ্যে খগেনবাবু বা সেই ফরসা মেয়েছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে ধীরে ধীরে দিগম্বর আর জুঁই এগোয়। দেরি হয়ে গেছে। ওপারের বাসে আর বসার জায়গা পাবে না তারা। কিন্তু সে কথা কেউ ভাবছে না।

সাঁকোটা নড়বড় করে দোলে। মেলা লোকের পায়ের চাপে মড়মড় শব্দ উঠছে। কখন ভাঙে তার ঠিক নেই। খুব সাবধানে জুঁই আগে আগে, দিগম্বর তার পিছু পিছু সাঁকোতে ওঠে। নীচে ভরা বর্ষার খাল গোঁ—গোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে সাঁকো থরথর করে কাঁপে। সবটাই ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে একেবারে জমিতে পা দেওয়ার মুখে জুঁইয়ের পা ফসকাল।

উরে বাবাঃ। বলে টাল্লা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে, কিন্তু গায়ে গায়ে মেলাই লোক, পড়বে কোথায়। তাই পড়ল না জুঁই। একজনের পিঠে ধাক্কা খেয়ে সেই পিঠেই হাতের ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠল।

একটা খোকা কেঁদে উঠল, হঠাৎ। লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, দেখেশুনে চলবে তো মেয়ে! আর একটু হলেই ছেলেটা ছিটকে পড়ত।

জুঁই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিগম্বরের বুক হিম হয়ে যায়। লোকটা খগেনবাবু। কোত্থেকে যে উদয় হল হঠাৎ।

দু—জনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে তার সাধ্য কী? সাঁকোর সরু মুখে ঠেলাঠেলি দৌড়াদৌড়ি। কে আগে যাবে। তাই দু—জনকেই এগোতে হল।

সামনেই খগেনবাবু যাচ্ছে। কোলের খোকাটা চুপ করে চেয়ে দেখছে পিছন বাগে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দিগম্বরের। চাপা স্বরে বলে, চিনতে পারেনি।

জুঁই ফিরে চায়। তেমনি ভ্যাবলা আনমনা মুখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন সর পড়ছে। কিছু দেখছে না যেন।

কিছু বলছ?

বললাম, কপালটা ভালো। আমাদের চিনতে পারেনি।

বউটাকে দেখলে ভালো করে?

ও আর দেখব কী? রংটাই যা ফরসা।

জুঁই মাথা নাড়ে, না মুখটাও সুন্দর।

থ্যাবড়া মুখ। তোমার মতো বড়ো—বড়ো চোখ নয়।

তুমি তো ভয়ে চামচিকে হয়ে আছ, দেখলে কখন?

দেখেছি।

ছাই দেখেছ। বউটা সুন্দরীই।

আমার চোখে লাগল না।

জুঁই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা। দ্যাখো ওরা মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে।

দু—জনেই দাঁড়িয়ে যায়। কাঁচা সরু রাস্তায় লোকের ঠেলাঠেলি। বাসটা সামনেই দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে। তার গায়ে লোকে গিয়ে পিঁপড়ের মতো জমাট বাঁধছে।

পথ ছেড়ে দু—জনে ঘাস জমিতে সরে দাঁড়ায়। দ্যাখে খগেনবাবু কোলে বাচ্চচা আর পিছনে বউ নিয়ে মাঠের পথ ধরে পুবমুখো যাচ্ছে।

দিগম্বর বলল, এ জায়গা হল দীঘরে। পুবে গামছাডোবা। গামছাডোবাতেই যাচ্ছে তাহলে।

জুঁই তেমনি আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে আস্তে বলল, বেশ দেখাচ্ছে না?

বউ বাচ্চচা নিয়ে খগেনবাবু মেঘলা আকাশের নীচে মাঠ পেরিয়ে গামছাডোবায় যাচ্ছে তাতে সুন্দর দেখানোর কী আছে বোঝে না দিগম্বর।

দেরি করলে চলবে না। বাস ছাড়বে এখুনি। নলতাপুরে জুঁইয়ের দেড় বছরের মেয়েটা বড়ো বউয়ের জিম্মায় আছে। বড়ো বউ আবার বেশিক্ষণ বাচ্চচা রাখতে হলে চেঁচামেচি করে। তার নিজেরই তিনটে।

দিগম্বর তাড়া দেয়, চলো চলো। দেরি হচ্ছে।

আঃ, দাঁড়াও না।

দাঁড়াব! বলো কী? এরপর সেই সাড়ে সাতটায় লাস্ট বাস।

হোকগে।

তার মানে?

জুঁই কথাটা শুনতে পায় না। সামনে আদিগন্ত খোলা হা—হা করা মাঠে মেঘলা আলোর মধ্যে খগেনবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাবধানে আল পেরোচ্ছে। বউয়ের হাতে একটা চামড়ার ছোটো সুটকেস।

কন্ডাক্টর হাঁকাহাঁকি করছে জোর গলায়, নলতাপুর...নলতাপুর...চরণগঙ্গা।

দিগম্বর চেয়ে দেখে, বাসের বাইরে আর লোক পড়ে নেই। যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। ছাদে পর্যন্ত।

জুঁইফুল! কী হচ্ছে শুনি। দিগম্বর একটু আদর মিশিয়ে ডাকে।

জুঁই জবাব দেয় না। তবে বড়ো—বড়ো চোখে তাকায়। এরকম তাকানো কোনো কালে দ্যাখেনি দিগম্বর। আজই কেমনধারা একটু অন্যরকম দেখছে। ভূতে পেলে বোধহয় এমন হয়।

কিছু বলছ? আবার জিজ্ঞেস করে জুঁই। কিন্তু জবাব শোনার আগেই আবার মাঠের দিকে চেয়ে দেখে। ফিসফিস করে বলে, সত্যি বলছ চিনতে পারেনি?

বরাতজোর আর কাকে বলে। চিনলে রক্ষে ছিল না। একসময়ে তো খগেনবাবুর চামচাগিরি করতাম।

কিন্তু চিনল না কেন বলো তো।

ভুলে গেছে। মুখটা ভুলে গেছে।

তা কি হয়! আমি তো ভুলিনি। তবে কর্তা ভোলে কী করে?

দেখেনি ভালো করে।

ধমকাল কিন্তু। মেয়ে বলে ডাকল।

শুনেছি তো।

এত কাছে থেকে দেখেও না চেনারা কথা তো নয়।

তুমিই বা বেছে—বেছে ওর ঘাড়ে পড়তে গেলে কেন?

সে কী ইচ্ছে করে? পড়লাম, উঠে বুঝলাম একেবারে কর্তার পিঠের ওপর...ওঃ, গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দ্যাখো। কতকাল পর...

কী কতকাল পর?

সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি তোমায় মেয়েমানুষটা যত ফরসাই হোক, কর্তার চোখে ও রং ধরবে না।

তাই বা বলছ কী করে?

বলছি, জানি বলেই। কর্তার পছন্দ মাজা রং।

বিরক্ত হয়ে দিগম্বর বলে, না হয় তাই হল। এবার চলো না। বাস ভেঁপু দিচ্ছে। কন্ডাক্টর ওই হাতছানি দিয়ে ডাকতে লেগেছে, দ্যাখো চেয়ে।

দাঁড়াও না। এ বাসটা ছেড়ে দাও। পরের বাসে যাব।

উরে ব্বাস। বলে কী। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব কোথায়? জল এলে দীঘরেতে মাথা বাঁচানোর জায়গা নেই।

আমি এখন যাব না। দেখব।

কী দেখবে?

ওরা কতদূর যায়। একদম মিলিয়ে গেলে তবে যাব।

কিন্তু বাস যে—

তাহলে তুমি একা যাও। আমি একটু দেখি।

বাস তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে অবশেষে ছাড়ে। দিগম্বর অবশ্য যায় না। একটা হাই তুলে গাছতলায় গিয়ে বসে বিড়ি ধরায়।

জুঁই মেঘলা আলোয় মাঠের দিকে তেমনি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তোমার উদ্দেশে

“In search of you, in search of you....”

ওইখানে তুমি থাকো। ওই সাদা বাড়িটায়, যার চূড়ায় শ্বেতপাথরের পরিটাকে বহু দূর থেকে দেখা যায়। নির্জন তোমাদের ব্যালকনি, বড়ো—বড়ো জানালায় ভারী পরদা ঝুলছে, দেয়ালে লাগানো এয়ারকুলার। মসৃণ সবুজ লনে বুড়ো একটা স্প্যানিয়াল কুকুর ঘুমিয়ে আছে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, এসব এক পুরুষের ব্যাপার নয়। জন্মের পর থেকেই তুমি দেখেছ খিলান—গম্বুজ, বড়ো ঘর, ছাদের ওপর ডানা মেলে—দেওয়া পরি— যা কেবলই উড়ে যেতে চায়। যায় না।

বিকেলের রাস্তায় ক্বচিৎ চোখে পড়ে কালো যুবতী আয়া মন্থর পায়ে প্র্যাম ঠেলে নিয়ে চলেছে। কদাচিৎ দু—একজন ভবঘুরে লক্ষহীন চোখ চেয়ে হেঁটে যায়। বড়ো সুন্দর অভিজাত নিস্তব্ধতা তোমাদের। তাই যদিও আমার পথে পড়ে না, তবু আমি মাঝে—মাঝে তোমাদের এই নির্জন পাড়ার রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে যাই।

আজ দেখলুম তোমাকে। তুমি একা হেঁটে যাচ্ছিলে।

যখন ক্বচিৎ কখনো তুমি এরকম হেঁটে যাও, তখনই বলতে কী তোমার সঙ্গে এক সমতলে আমার দেখা হয়। আজ যেমন। নইলে মাঝে—মাঝে তোমাকে দেখি তোমাদের মভ রঙের মোটরগাড়িতে। হু—হু করে চলে যাও।

তোমাদের পুরোনো মোটরগাড়িটার কোনো গোলমাল ছিল কি আজ! কিংবা নিকেলের চশমা চোখে তোমাদের সেই বুড়ো ড্রাইভারটার!

অনেকদিন দেখা হয়নি। দেখলুম এই শীতকালে তুমি বেশ কৃশ হয়ে গেছ। সাদা শাড়ি পরেছিলে, তবু কচি সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছিল তোমাকে। সুন্দর অভ্যাস তোমার— শাড়ির আঁচল ডান ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীর ঢেকে দাও, মুখ নীচু করে হাঁটো— যেন কিছু খুঁজতে—খুঁজতে চলেছ। নাকি পাছে কারও চোখে চোখ পড়ে যায় সেই ভয়েই তোমার ওই সতর্কতা। ওরকম মুখ নীচু করে যাও বলেই বোধহয় তুমি কোনোদিন লক্ষ করোনি আমায়। আজকেও না।

মোড়ের মাথায় রঙ্গন গাছের ছায়ার যে লাল ডাকবাক্সটা আছে তুমি সেটা পেরিয়ে গিয়ে বাঁক নিলে। তোমাকে আর দেখা গেল না। এত কাছ দিয়ে গেলে আজ যে, বোধহয় তোমার আঁচলের বাতাস আমার গায়ে লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল একটুক্ষণের জন্য তোমার পিছু নিই। নিলুম না। কেননা ফাঁকা রাস্তার মোড় থেকে বেঁটে, মোটাসোটা কালো টুপি পরা লাল ডাকবাক্সটা স্থির গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়েছিল। মনে হচ্ছিল তোমার পিছু নিতে গেলেই সে গটগট করে হেঁটে এসে আমার পথ আটকাবে।

একটু আগে আমি ওই মোড় পেরিয়ে এলুম। বাঁক ছাড়িয়ে কিছুদূরে এক গাড়িবারান্দার তলায় দেখলুম জটলা করছে পাড়ার বখাটে ছেলেরা। বড়ো রাস্তাতেও রয়েছে নির্বোধ পুরুষের ভিড়। একা ওইভাবে কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? আমার কাছ থেকে তুমি যত দূরে আছ, সুরক্ষিত আছ, অনেকের কাছ থেকে কিন্তু তুমি তত দূর নও। আমি তাই অনেকক্ষণ ভাবলুম তুমি ঠিকঠাক চলে যেতে পেরেছিলে কি না।

তোমাদের পাড়া ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় পা দিতেই কয়েকটা ভিখিরির ছেলেমেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। রুক্ষ চুল করুণ চোখ কৃশ চেহারা। লক্ষ করলুম একটি ছেলের মাথায় ঠোঙার মুকুট। একটি মেয়ের গলায় শুকনো গাঁদা ফুলের মালা। কাছেই ফুটপাতের কোথাও বসে এতক্ষণ বর—বউ খেলছিল বোধহয়। কিছু সময় তারা আমার পিছু নিল। 'দাও না, দাও না।' উলটো দিক থেকে ধীর গতিতে হেঁটে আসছিল একজন পুলিশ। কাছাকাছি হতে হঠাৎ কী ভেবে সে তার হাতের ব্যাটনটা দুলিয়ে বলে, 'ভাগ।' বাচ্চচাগুলো পালিয়ে গেলে সে একবার আমার দিকে চেয়ে একটু তৃপ্তির হাসি হাসল। আমিও হাসলুম। বাচ্চচাগুলো দূর থেকে চেঁচিয়ে বোধহয় আমাকেই বলছিল 'ভাগ! ভাগ!'

২

রাত সোয়া ন—টায় সোমেনের পড়ার ঘরের পাশে হলঘর থেকে ওদের পুরোনো প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘড়িটায় পিয়ানোর টুংটাং বেজে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে হাই তুললাম। সোমেন তার বইপত্র গুছিয়ে রাখছিল।

চলে আসছিলুম, সোমেন ডাকল, 'মাস্টারমশাই।'

'বলো।'

'কাল সবাই বরানগর যাচ্ছি, মাসিমার বাড়ি। পড়ব না।'

'আচ্ছা।'

'আর মাস্টারমশাই...' বলে ও লাজুক মুখে একটু হাসল।

'কী হল?'

কথা না বলে ও ইঙ্গিতে হলঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিল। হলঘর পেরিয়ে ওদের অন্দরমহল। আজ হলঘরটা অন্ধকার। মাঝে—মাঝে অন্ধকার থাকে। বললুম, 'তুমি না এসো ও পি সি—তে বক্সিং করো। একটা অন্ধকার হলঘর পার হতে পারো না! বলতে— বলতে কাঁধে হাত রাখলুম। কিছুদিন আগে পইতে হওয়ার পর মাথার চুল এখনও ছোটো ছোটো— আর দণ্ডীঘরের ব্রহ্মচর্যের আভা এখনও ওর সমস্ত শরীরে ফুটে আছে।

'এই ঘরে তোমার দাদু মারা গিয়েছিলেন না! বেঁচে থাকতে যিনি তোমাকে অত ভালোবাসতেন, মরার পর কি তিনি তোমাকে ভয় দেখাতে আসবেন?'

শুনে সামান্য শিউরে উঠল সোমেন। আমি ওর মাথায় হাত রাখলুম। কখনো যখন হোমটাস্কের খাতার দিকে ঝুঁকে থাকা ওর মনোযোগী মুখে টেবিল বাতির সবুজ ঢাকনার আলো এসে পড়ে, কিংবা যখন কখনো ভুলে যাওয়া পড়া মনে করার চেষ্টায় ও দাঁতে ঠোঁট চেপে, হাত মুঠো করে অসহায় চোখে টালমাটাল তাকায় তখন আমার কখনো—কখনো মনে হয়— এই সুন্দর, পবিত্র ছেলেটি আমার। এই আমার ছেলে সোমেন — যার হাতে রাজ্যপাট দিয়ে খুব শিগগিরই একদিন আমি বানপ্রস্থে যাব।

আমি হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সোমেন এক ছুটে অন্ধকার হলঘর পার হয়ে গেল।

আমাদের বাসার সদর দরজার ছিটকিনিটা বাইরে থেকেই খোলা যায়। প্রথমে দরজাটা টেনে বন্ধ করো। তারপর ডানদিকের পাল্লাটা আস্তে—আস্তে চেপে ধরো। খুব অল্প একটু ফাঁক হবে। সেই ফাঁকে সাবধানে ঢুকিয়ে দাও বাঁ—হাতের আঙুল। এইবার আঙুলটা ডানদিকে বেঁকিয়ে দিলেই তুমি ছিটকিনির মুখটা নাগালে পাবে। সেটা ওপরে তুলে ঘোরাও। তারপর ছেড়ে দাও। ঠক করে ছিটকিনি খুলে যাবে।

রাত সাড়ে দশটায় কৌশলে সদরের ছিটকিনি খুলে, অন্ধকার প্যাসেজ পার হয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম। বাতি জ্বলছে। মা—র বিছানায় মশারি ফেলা। মা—র জেগে থাকার কোনো শব্দ শোনা যায় না।

রান্নাঘরে আমার ভাতের ঢাকনা খুলে বেড়ালে মাছ খেয়ে গেছে। মা টেরও পায়নি। আজকাল বড়ো সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে মা। বয়স হচ্ছে। কথা বলতে বলতেও হঠাৎ বুকের ওপর ঝুঁকে নেমে আসে মাথা। খেয়াল হতে চমকে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করে, 'কী বলছিলাম যেন!' আমি হেসে বলি, 'কিছু না মা, কিছু না।'

রান্নাঘরের জানালার একটি শার্সি ভাঙা! মেঝের ওপর ফোঁটা—ফোঁটা ঝোল, আর তার সঙ্গে এখানে—ওখানে বেড়ালের পায়ের ছাপ। ভাঙা শার্সিওলা জানালাটা পর্যন্ত গেছে। ভাতের পাশে কালচে আর মেরুন রঙের দুটো তরকারি, হাতল ভাঙা কাপে হলুদ ডাল! রাতে ঠান্ডা এই খাবারের দিকে চেয়ে মনে হয় মুখে দিলে বড়ো বিস্বাদ লাগবে।

খেয়ে ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরাব, মা ঘুমের মধ্যেই 'অঃ' শব্দ করে পাশ ফিরল।

'কে!'

'আমি।'

মা চৌকির শব্দ করে উঠে বলল, 'দ্যাখ তো, একটা চিঠি এসেছে বিকেলে। চোখে ভালো দেখি না। দ্যাখ তো। কর্তার চিঠি মনে হয়।'

মশারির ভিতর থেকে হাত বের করে মা আমার হাতে চিঠি দিল, 'জোরে পড়'।

কালচে রঙের পাকিস্তানি পোস্টকার্ডের ওপরে ইংরেজিতে লেখা— 'কালী। তার নীচে পাঠ : 'পরমকল্যাণবরেষু বাবা রম, ইতিপূর্বে তোমার নিকটে কার্ডে পত্র দিয়াছি তাহা পাইয়াছ কিনা জানাইও। তোমাদের চিঠি না পাইলে চাঞ্চল্য ও চিন্তা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখুনি অসুখ অশান্তি দেখা দেয়, সঙ্গে—সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খারাপ হইয়া যায়— চোখে ভালোরূপ দেখিতে পারি না বলিয়া নানারূপ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বর্তমান অবস্থা ব্যবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, তাড়াতাড়ি কোনো কিছু না হইলে ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল ও সংকটাপন্ন হইবে। তোমার কাগজাত ঢাকা আসিলে অবশ্য খবর পাওয়া যাইত। অনিলের সহিত যোগাযোগ করিয়ো। ওই সঙ্গে কলিকাতা পাকিস্তানি হাই—কমিশনার বরাবর দরখাস্ত দিয়া তাহাতে অনুমতি পাইবার ব্যাপারে রিকমেন্ড করাইয়া পাঠাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভালো হয়। কারণ এখানকার ডি আই জি হইতে পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও দুষ্প্রাপ্য জানিবা।...বলিয়াছিলাম, বরং মুসলমান হইব তবু ভিটা ছাড়িব না। ...অসুখে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি...তোমরা নিকটে না থাকায় অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল বোধ করি। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, রিকমেন্ড থাকিলে কাজের সুবিধা হইবে। দেরি হইলে আরও বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া পড়িব...তোমাদের সহিত আর দেখা হইবে না। হিন্দুস্থানে মরিতে চাহি। তোমার গুড়া কাকিমার মাথার কিছু বিকৃতি দেখা দিয়াছে— আজ চার—পাঁচ মাস যাবৎ নানারূপ চিকিৎসা চলিতেছে। সোনারপুরে আমাদের যে জমি তাহাতে অন্তত দুইখানি দুই চালা তোলার চেষ্টা করিয়ো। বর্তমান যে দুঃসময় দেখা দিয়াছে তাহাতে মিতব্যয়ী না হইলে নিরুপায় হইবা। সাবধানে থাকিয়ো ও মঙ্গল জানাইয়ো। অন্যান্য এক প্রকার। ইতি আং তোমার বাবা।'

চিঠি শুনে মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে—আস্তে বলল, 'সারাদিন তুই করিস কি? সার্টিফিকেটটার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করলে যদি হয়, করিস না কেন! অনিলের কাছে যা— ও অতবড়ো চাকরি করে, ঠিক বের করে দেবে।'

'যাব!'

'যাস! বুড়ো বয়সে এখন জেদ কমেছে লোকটার, এইবেলা নিয়ে আয়।'

মা মশারির ভিতরে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। বলল, চোখে কেন কুয়াশার মতো দেখি আজকাল। কর্তা আসবে, তার আগেই একবার হাসপাতালে নিয়ে যাস তো!'

আমি মা—র মশারি তুলে দিয়ে ভিতরে পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে শুলুম। 'মশা ঢুকছে না!' বলে ছোট্ট একটু ধমক দিয়ে মা আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'কী এত খরচ করিস! এতদিন একটু—আধটু জমালে দুটো দোচালা সত্যিই উঠে যেত। একটু গাছ—গাছালি লাগাতে পারতুম। নিজেদের বাগানের ফল—পাকুড় খাই না কত দিন!'

'একটু আদর করো না সোনা মা!'

৩

আমার সামনের রাস্তায় হঠাৎ পড়ে লাফিয়ে উঠল একটা লাল বল। এমন চমকে উঠেছিলুম! তারপরই শোনা গেল সামনের হলুদ বাড়িটার দেওয়ালের আড়াল থেকে বাচ্চচা ছেলেদের চিৎকার, 'ওভারবাউন্ডারি...ওভারবাউন্ডারি!...মিলনের একুশ।' শুনে আমি আপন মনে হেসে উঠলুম।

পিছনের পার্কটায় দেখে এলুম একপাল কাকের সভা বসেছে। আর খোলা মাঠে ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে খেলছে বাতাস। মোড় ফিরতেই মুখোমুখি দেখা হল সেই মোটা, লাল ডাকবাক্সটার সঙ্গে। দূরে দেখা যায় তোমাদের বাড়ির চূড়ায় পরিটাকে— আকাশের দিকে বাড়ানো এক হাত— অন্যহাতে সে তার বাঁদিকের স্তন ছুঁয়ে আছে।

এখন দুপুর। রাধাচূড়া গাছের তলায় জলের ড্রাম, পেতলের থালা, আর ছাতুর ঝুড়ি সাজিয়ে বসেছে এক অল্পবয়সি ছাতুওয়ালা। তাকে ঘিরে রিকশাওয়ালাদের ভিড়। এক হাত খাবারের থালায় রেখে অন্যহাতে লোভী পাখিপক্ষীদের তাড়াতে—তাড়াতে যখন মাঝে—মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে তখন মনে হয় খাবারের সঙ্গে আকাশ, মাটি ও উদ্ভিদের বড়ো মায়া মিশে আছে। ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে বসে যাই।

চমৎকার দিন আজ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। শীতের খর বাতাস বইছে।

তুমি আজ কোথাও ছিলে না। যখন তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেলুম তখন দেখি একটা ঘাস—ছাঁটা কল বাগানময় ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের মালি। ব্যালকনিতে দুটো ডেকচেয়ার। তোমাদের অর্ধবৃত্তাকার গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা একটু স্কুটার, যার রং ছানার জলের মতো সবুজ।

সারা দুপুর আমি আজ আর ভুলতে পারলুম না— ওই ঘাস—ছাঁটা কল, দুটো ডেকচেয়ার, আর ওই সবুজ একা একটা স্কুটার।

৪

আজ প্রথম পিরিয়ডে আমি ক্লাসে ছাত্রদের ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের ভিতরে তখনকার গার্হস্থ্য চিত্র আর সমাজজীবন বিষয়ে একটা প্রশ্ন লিখতে দিয়ে জানালার কাছে এসে যখন দাঁড়ালুম তখন দেখা যাচ্ছে আকাশে নীচু একটু মেঘ। বৃষ্টি হবে কি! বৃষ্টির আগে ভেজা মাটির যে গন্ধ পাওয়া যায় আমি তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম। বৃষ্টি এল না! শেষ ক্লাস ছিল সেভেন—এ। ওরা গেল ক্লাস লিগে ক্রিকেট খেলতে। টিফিনে তাই ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসছি, গিরিজা হালদার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, সই করুন।' চটপট সই করে দিলুম। হালদার গজগজ করতে—করতে কমনরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'কীসে সই করলেন, একবার পড়েও দেখলেন না।' চেঁচিয়ে বললুম, 'যেকোনো আন্দোলনই করুন— আমি সঙ্গে আছি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।' বেরিয়ে এসে খুশি মনে দেখলুম ঝকঝক করছে দিন।

পাবলিক ইউরিন্যালের নোংরা দেয়ালে পেনসিলে লেখা অনেক অশ্লীল কথার মধ্যে কে লিখে— গোপাল আর নাই। 'গোপাল' থেকে পেনসিলের হালকা রেখা 'নাই'—তে এসে গম্ভীর। যেন বা হতাশা থেকে ক্রমে

ক্রোধ! লেখা নেই, তবু মনে হয় হতাশার 'হায় গোপাল' থেকে শুরু, শেষে এসে রাগ— 'নাই কেন?' লেখা আছে— গোপাল আর নাই। আমি পড়লুম— 'হায়! গোপাল!' পড়লুম, গোপাল আর নাই কেন?'

বেরিয়ে আসছি, দেখি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ট্রামের স্টপে ভিড়ের মধ্যে একটা চেনা মুখ! সুধাকর না! কলেজ টিমের দুর্দান্ত লেফট আউট ছিল! দেখি গায়ে চর্বি জমেছে, থলথল করছে ভুঁড়ি, কাঁধে ঝুলছে শান্তিনিকেতনের ঝোলা ব্যাগ। পরনে ধুতি—পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল।

ফার্স্ট ডিভিশনেও কিছুদিন খেলেছিল সুধাকর। তখন ওর দৌলতে ডে স্লিপে কত খেলা দেখেছি। মনে পড়ে লাইটহাউসে দু—জনে দশ আনার লাইন দিতে গেছি, দুটো অচেনা ছেলে লাইন থেকে ডেকে বলল, 'আপনি এস সেন না?' সুধাকর মাথা নাড়ল— 'হ্যাঁ'। 'আসুন না, এখানে জায়গা করে দিচ্ছি।' লাইনে দাঁড়িয়ে সুধাকর চাপা গলায় বলেছিল, 'কিরে শালা দেখলি!'

চার বছর আগে শেষ দেখা চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের সামনে। তখন ওর মায়ের ক্যানসার। ইউটেরাসে। দু—জনে চৌরঙ্গি পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলুম। বললে, 'খেলা ছাড়ার পরই একটা মজার চাকরি পেয়ে গেছি ভাই। কনস্ট্রাকশনে। কাজকর্মে কিছু বুঝি না, কিন্তু এধার—ওধার থেকে কেমন করে যেন পয়সা এসে যায়!' পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বলল, কিন্তু আমি ইমমর্যাল নই, খেলার মাঠেও মার না খেলে কখনো মারিনি।' তখন শীত শেষ হয়ে কলকাতায় গরম পড়ে গেছে, তবু সুধাকরের গায়ে ছিল একটা পুরোনো ব্লেজার— বুকের কাছে মনোগ্রাম করা, যেন চোখ পাকিয়ে বলছিল— আমি খেলোয়াড় সুধাকর।

আমি ওকে ডাকলুম না। দূর থেকে দেখলুম ধুতি—পাঞ্জাবি—চপ্পল পরা মোটা থলথলে সুধাকর যেন সবাইকে দেখিয়ে চলন্ত ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে চটপটে পায়ে পা—দানিতে উঠে গেল।

সন্ধেবেলায় কফি হাউসে অনেকের সঙ্গে দেখা। অমর ফিরেছে বিলেত থেকে অনেক দিন পর। আড্ডা তাই জমজমাট ছিল। অমররা সিং। পাঞ্জাবি শিখ, বাঙালি হয়ে গেছে। আগে দাড়ি গোঁফ পাগড়ি ছিল না।

আজ দেখি জালে ঢাকা দাড়ি, মাথায় জরির চুমকি দেওয়া পাগড়ি, বললুম, 'আগে না তুই ছিলি মেকানাইজড শিখ! তবে আবার কেন দাড়ি গোঁফ পাগড়ি, হাতে কেন তোর বালা?'

হাতজোড় করে বলল, রিলিজন নয় ভাই, এ আমার পলিটিক্স। বিলেতে গিয়ে দেখি ইন্ডিয়ানদের পাত্তা দেয় না। আমার গায়ের রং ফরসা, অনেকেই সাহেব বলে ভুল করে, খাতির—যত্ন পাই। কেমন লেগে গেল সেন্টিমেন্টে। তাই দাড়ি গজিয়ে পাগড়ি বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম— ইন্ডিয়ানদের যে পাওনা তাই দাও আমাকে। খাতির চাই না।

রাত আটটার সময় ওরা উঠে গেল মদের দোকানে। সেলিব্রেট করবে। আমি গেলুম না। যাওয়ার সময় তুলসী আড়ালে ডেকে বলে গেল, 'অনিমেষকে একবার দেখতে যাস। ওর অসুখ।'

'কী অসুখ!'

মুখ টিপে হেসে বলল, 'বলছিল, অসুখের নাম মীরা। দেখিস গিয়ে।'

৫

রাত সাড়ে ন—টায় আমি লন্ডনের এক অচেনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। চারদিক হিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ পড়বে। একটা দোতলা বাস হল্টে থেমে আছে, বাস—এর পিছনে বিজ্ঞাপন— 'সিনজানো'। চোখ পড়ে অদ্ভুত পুরোনো ধরনের গথিক লাইটপোস্ট, ভিকটোরিয় দালানের ভারি স্থাপত্য, পিছনে দূরের বহুতম স্কাইক্র্যাপারের জানালায় আলোর আভাস। ওভারকোটের পকেটে আমার দুই হাত। আমি হেঁটে যাব। সামনের যেকোনো পাব—এ রহস্যময়ভাবে ঢুকে আমি খেয়ে নেব এক গ্লাস বিয়ার, অল্প গুনগুন করে গাইব ওই অচেনা শব্দটি যা কিনা কোনো মদের নাম—'সি—ই—ন—জা— আন— ও—

ও'। ঘরে ফেরার আগে আমি কোনো হোটেলের বলরুমে ঢুকে নেচে নেব। দু—চক্কর নাচ, 'হেঃ এ, টুইস্ট, টুইস্ট, টুইস্ট।'

আমি দূর বিদেশে পৌঁছে গেছি আজ। ঘন কুয়াশার পরদা সরালেই দেখা যাবে আমার চারধারে জীবন্ত এই ছবি।

চেনা রাস্তাঘাট আজ আর চেনা যাচ্ছিল না। বিবর্ণ দেওয়াল, ছেঁড়া পোস্টার, কালো ক্ষয়া চেহারার মানুষ—এই সবই ঢাকা পড়েছিল। কলকাতায় বড়ো সুন্দর ছিল আজকের কুয়াশা। হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি ধরিয়ে নিলুম একটা সিগারেট। ট্রাফিকের সবচেয়ে সুন্দর আর ক্ষণস্থায়ী হলুদ বাতিটি ঝলসে উঠলে স্টেটবাসের গিয়ার বদলানোর শব্দ হয়েছিল। জ্বলে উঠল সবুজ। 'আস্তে ভাই ট্যাক্সিওয়ালা' বলতে—বলতে আমি ডানহাত ট্র্যাফিক পুলিশের ভঙ্গিতে তুলে ধরে দুই লাফে রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

আমার যাওয়ার কথা বকুলবাগান, সেদিকে না গিয়ে আমি মোড় নিলুম ডাইনে, এসে দাঁড়ালুম আদিগঙ্গার পোলের ওপর। আমার পায়ের তলা দিয়ে অন্ধকার রেলগাড়ির মতো বয়ে চলেছে জল। না, গঙ্গা কোথায়! এ তো রাইন! অদূরে ট্রাফলগার স্কোয়ার থেকে ভেসে আসছে রাতের ঘুমভাঙা কবুতরের পাখার শব্দ, আমার পিছনে অস্পষ্ট ইফেল টাওয়ার, সামনে বহুদূরে স্ট্যাচু অব লিবার্টি, বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে শম্ভুগঞ্জের দিকে ভেসে চলেছে গুদারা নৌকা। কুয়াশার আবডাল সরে গেলেই সব দেখা যাবে। কিংবা বলা যায়, কুয়াশার আবডালেই বহু দূরের সবকিছু পুরোনো এই কলকাতার হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি এসে গেছে। কাছে আসবার এই তো সুসময়— বর্ষায়, বা ঝড়ে, বা কুয়াশায়! ভালোবাসায় একাকার হয়ে যায় পৃথিবী, সমুদ্র তার তট অতিক্রম করে উত্তাল হয়ে আসে স্থলভূমির দিকে, আমাদের চেনা শহরে ফুটে ওঠে অচেনা বিদেশের ছবি।

আজ রাতে তুমি একবারও খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে কি? যদি দাঁড়াও, তবে— আমার মনে হয়, তুমি টের পাবে তোমাদের বাড়ির চূড়ার শ্বেতপাথরের পরিটা কুয়াশার আড়ালে তার মার্বেলের ভিত ছেড়ে উড়ে গেছে মোড়ের ওই লাল রঙের বেঁটে ডাকবাক্সটার কাছে। বহুকালের পুরোনো তাদের প্রেম—কেউ কখনো টেরও পায়নি। এখন পায়ের কোনো শব্দ না করে যদি তুমি ছাদে উঠে যেতে পারো তবে দেখবে— পরিটা সত্যিই নেই।

নাকি রাতের ডাকে চিঠিপত্র চলে গেছে বলে হালকা সেই ডাকবাক্সটা বেলুনের মতো উড়ে এসেছে তোমাদের ছাদে! পরিটার কাছে! এখন তাই ডাকবাক্সটা খুঁজে না পেয়ে পৃথিবীর ভুলো মানুষেরা ভাবছে—কোথায় গেল আমাদের এতকালের চেনা সেই ডাকবাক্স! নাকি আমাদেরই রাস্তা ভুল!

৬

অনিমেষ একা থাকে। অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম।

শুয়ে আছে। দেখলুম নাকটা অল্প ফুলে লাল হয়ে আছে। মুখের এখানে ওখানে ফাটা—ছেঁড়া, কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত টানা লম্বা একটি কালশিটের দাগ।

আমাকে দেখে কনুইয়ে ভর রেখে উঠবার চেষ্টায় মুখ ভয়ংকর বিকৃত করে বলল, 'চারটে লোক! বুঝলি, চারটে লোক ফিলজফি পালটে দিয়ে গেল।'

'কী হয়েছে তোর?'

'কী জানি। একা পড়ে আছি, সিগারেট এনে দেওয়ারও লোক নেই। আর শালা দুপুরটা যে কী লম্বা মনে হয়!'

'চারটে লোক কারা?'

পাশ ফিরে বলল, 'চিনি না! নাইট শো দেখে ট্যাক্সিতে ফিরছি, তখন রাত বারোটা। আমার ঘরের সামনে ওই যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, মাঠের মতো, বড়ো রাস্তায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে যেই মাঠে পা দিয়েছি, টের পেলুম ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আবছা চারটে লোক। তক্ষুনি কেন যেন মনে হল— বিপদ। ফিরে দেখলুম ট্যাক্সিটা ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভাবলুম ট্যাক্সিওয়ালাকে একবার ডাকি। ততক্ষণে চারটে লোক চটপটে পায়ে এসে আমার চারধারে দাঁড়াল। মুখোমুখি যে, তার হাতে একটা সাইকেল চেন। জিজ্ঞাসা করল— তুমি শালা অনিমেষ চৌধুরী? মীরার সঙ্গে তোমারই ভাব? বোঁ করে চেনটা এসে মুখে লাগল। পড়ে যাচ্ছিলুম, ধরে বলল, ঘরে চল। ঘর নিয়ে এল! আমি তালা খুললে চারজনেই ঢুকল ঘরে। বলল, তোমাকে কাট মারতে হবে। আমি অল্প টলছিলুম, মাথার ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগছিল, তবু ওদের কথা বুঝলুম। বললুম, কেন? বলল, মীরার সঙ্গে বিয়ে হবে হরির। ছেলেবেলা থেকে ওদের ভাব, মাঝখানে তুমি কে? হরিকে আমি চিনি, মীরাদের বাসায় কাজকর্মে আসে, ছুতোরের কাজ করে, জগুবাজারে দোকান আছে। আমি মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, মীরা শিক্ষিতা মেয়ে, হরিকে বিয়ে করবে কেন? আমার বুকে আঙুল ঠুকে বলল, কেন, শালা শিক্ষিতা মেয়ের শরীরে ফুল ফোটে না! পাতা গজায় না? হাসল, বিয়ে করতে না চায়, আমরাই জোর করে দেব। সমাজের ব্যবস্থা আমরা পালটে দিচ্ছি শিগগিরই। তোমাকে চিঠি লিখতে হবে। লেখো। ওরা বলে গেল, আমি লিখলুম— প্রিয় মীরা, তোমার সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নেই। কাল থেকে তোমার সঙ্গে কাট। দেখা হলে আমাকে না চিনবার চেষ্টা কোরো। আমি তোমাকে আর ভালোবাসি না। ইনি অনুতপ্ত অনিমেষ। লেখা হলে ওরা একটা খাম বের করে দিয়ে বলল, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দাও। দিলুম। তারপর ওরা আমাকে মারল, মেরে শুইয়ে দিয়ে গেল মেঝেয়। বলে গেল, 'যদি কথার নড়চড় হয় তবে আবার দেখা হবে, না হলে গুডবাই।'

অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে চকমকে চোখে হাসল, মীরা এসেছিল দু—দিন পর। দরজা খুললুম না। বাইরে থেকেই বলল, 'অফিসে তোমাকে ফোন করে পাইনি। তুমি এত খারাপ বাংলা লেখো, জানতুম না। এ চিঠি তুমি লিখেছ?' শান্তভাবে বললুম, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করল, কেন? বললুম—

'কী বললি!'

ধপ করে বালিশ মাথা থেকে ফেলে অনিমেষ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, 'দুর শালা! সে অনেক কথা। ছেড়ে দে। তোর কাছে যে ক—টা সিগারেট আছে দিয়ে যা।'

আমার সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বালিশের পাশে রাখল, মীরার কথা এখন আর ভাবছিই না। ভাবছি ওই চারটে লোকের কথা। কী আত্মবিশ্বাস! আমাকে দিয়ে ওই চিঠি লিখিয়ে নিল, আর ঘরে ঢুকে মেরে গেল আমাকে, বুঝিয়ে দিয়ে গেল আমার জোর কতখানি। আমি শালা হারামির বাচ্চা এতদিন ভদ্রলোক...'

রাতে বেড়াল খুঁজতে গিয়ে মা পড়ে গিয়েছিল উনুনের ধারে। হাঁটুতে চোট। একটা আঙুল সামান্য পুড়েছে। ডাক্তার বলে গেল— হাই প্রেশার, সাবধানে রাখবেন। খুব বিশ্রাম। আর নুন বারণ।

পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, 'কেন মা, এত কাজকর্ম করতে যাও?'

মা মিনমিন করে বলল, 'বউ আন।'

স্বপ্ন দেখলুম।

আমার চোখের সামনে দেয়ালের পর দেয়ালের সারি। আর সেই অসংখ্য দেয়ালের গায়ে কে যেন অবিশ্রাম চক দিয়ে লিখে যাচ্ছে— গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। কোথাও লেখা— 'হায় গোপাল!' কোথাও বা—'গোপাল আর নাই কেন?' আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিয়ের 'স্বাগতম' লিখবার লাল শালুতে উড়ছে কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন, বসন্ত—টিকা নিন। বিপদ—টিকা নিন। ভয় —টিকা নিন।

৭

দেখলুম স্টিয়ারিং হুইলে তোমার দুই অসহায় হাত, অহংকারে একটু উঁচু তোমার মাথা। কপালের ওপর নেমে এসে দুলছে চুলের একটা ঘুরলি। দাঁতে ঠোঁটে চেপে হাসছ। তোমার কপালে ঘাম। তোমার মুখ লাল। পাশে খাকি শার্ট পরা নিকেলের চশমা চোখে বুড়ো সেই ড্রাইভার। একটু ডানদিকে হেলে সে তার একখানি সাবধানী হাত বাড়িয়ে রেখেছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর তোমার হাতের দিকে।

বড়ো ভালোবাসার তোমাকে আগলে নিয়ে গেল তোমাদের পুরোনো মভ রঙের গাড়ি। মোড়ের বেঁটে মোটা লাল ডাকবাক্সটা তার কালো টুপি পরা মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চিৎকার করে বলল, 'হ্যাপি মোটরিং মাদমোয়াজেল, হ্যাপি 'মোটরিং।' বাড়ির চূড়া থেকে শ্বেতপাথরের পরিটা পুব থেকে পশ্চিম মাথা ঘুরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত একবার দেখে নিল— কোনো বিপদ আছে কি না। যত দূরেই যাও, সে তোমাকে ঠিক চোখে চোখ রাখে।

যদিও একটু টাল খাচ্ছিল তোমার গাড়ি, তবু বলি, তুমি অনেকটা শিখে গেছ। আর ক—দিন পরেই তুমি তোমার গাড়ি একা চালিয়ে নিয়ে যাবে।

চোখ বুজে দেখলুম, দূরে রাসবিহারীর জংশনে ট্রাফিকের লাল আলোয় থেমে আছ তুমি।

থেমেছিলে? নাকি অপেক্ষা করেছিলে? দেখো একদিন আমি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দু—হাত দু—দিকে ছড়িয়ে দাঁড়াব তোমাদের ওই মভ রঙের মোটর গাড়িটার মুখোমুখি। চেঁচিয়ে হয়তো বলব, 'বাঁচাও', কিংবা হয়তো বলব, 'মারো আমাকে।' কুয়াশায় বা ঝড়ে বা বৃষ্টিপাতে কোনোদিন সেই সুসময় দেখা দিলে, তখন আর ওই দুই শব্দের আলাদা মানে নেই।

৮

ফেব্রুয়ারি। কলকাতায় এবারের শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম। রাস্তায় খুব ধুলো উড়ছে। চারদিকেই রাগী ও বিরক্ত মানুষের মুখ।

বিদায়ী শীতের সম্মানে একদিন স্কুল কামাই করা গেল। 'ম্যাটিনি'তে বেলেল্লা একটা হিন্দি ছবি দেখলুম। আমি আর তুলসী। বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি। লবিতে দাঁড়িয়ে তুলসী হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরছিল। বললুম, 'তোর জমবে না কিছুই। তোর হাতে জল দাঁড়ায় না।' অসময়ে বৃষ্টি, তবু রাস্তায় জল জমে গেল। ট্রাম বাস বন্ধ। হাতে স্যান্ডেল, কাপড় গুটিয়ে দু—জনে ছপ করে জলে নামলুম। হঠাৎ অকারণে খুশি গলায় তুলসী বলল, 'পৃথিবী জায়গাটা মন্দ নয়, কী বলিস।'

পাড়ার চেনা ডাক্তার ধরে একদিন টিএবিসি দিয়ে দিল। দু—দিন জ্বরে পড়ে রইলুম। মা কাছাকাছি ঘুরঘুর করে গেল বারবার। এমন ভাব— কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস, হতভাগা ছেলে, এবার পেয়েছি তোকে। তৃতীয় দিনে গা—ঝাড়া দিয়ে উঠে বললুম। সকালেই দেখি, মা বাক্স খুলে কবেকার পুরোনো লালপেড়ে গরদের শাড়িটা বের করে পরেছে। 'কী ব্যাপার?' মা অপ্রস্তুত মুখে একটু হাসল 'কাল রাতে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি।' মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোর জ্বরটাও সারল। কালীঘাটে একটু পুজো দিয়ে আসি।'

আমি আর গিরিজা হালদার স্কুল থেকে একসঙ্গে বেরোলুম একদিন। হালদার গলা নামিয়ে বলল, 'আমার জীবনে একটা ট্র্যাজেডি আছে মশাই। আপনাকে বলব একদিন।' পরমুহূর্তেই রুমাল বের করে বলল, 'গরম পড়ে গেল।' রেস্টুরেন্টে বসলুম দু—জনে, গিরিজা হালদার কাটলেট খেল না, আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দুটো টোস্ট। আমার মশাই নিরামিষ। দেখেন না হিন্দুর বিধবারা কতদিন বাঁচে।' হালদার প্রাণায়াম—টানায়াম করে। দম বন্ধ করে এক গ্লাস জল খেয়ে মুখ মুছে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লক্ষ করেছেন কলকাতায় অনেকদিন কিছুই ঘটছে না। না লাঠিচার্জ, না গোলাগুলি, না কারফিউ। তেমন বড়োসড়ো একটা মিছিলও

দেখছি না বহুকাল। লোকগুলো মরে গেছে, কি বলেন!' অন্যমনস্কভাবে বললুম, 'হুঁ।' হালদার টেবিলে আঙুল বাজিয়ে গুন গুন করল, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে...'

দূর গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপরে উড়োজাহাজের বিষণ্ণ শব্দ। অন্যমনে সাড়া দিই— 'যাই।'

রাতে হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসলুম, 'মা, ও মা, তুমি আমায় ডাকলে।' মা জেগে উঠে অবাক গলায় বলল, 'না তো।' বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র পড়ে বলল, 'ঘুমো।' চৌকির শব্দ করে পাশ ফিরল মা, বলল, 'বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না রে!' আমি নিঃশব্দে হাসলুম, 'না তো!'

তারপর অনেকক্ষণ জেগে থাকি। মা—রও ঘুম আসে না। বলে, 'সারাদিন কী যে করিস। ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনদের একটু খোঁজখবরও তো নিতে হয়! আমি মরলে আর কেউ তোকে চিনবেই না। দেখলেও ভাববে কে না কে!' মা—র দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, 'বুঝতেও পারি না, কে বেঁচে আছে, আর কে মরে গেছে। একটু খোঁজ নিস।' জবাব দিই, 'কে কোথায় থাকে মা!' মা আস্তে আস্তে বলে যায়, 'কেন, মাঝেরহাটে তোর রাঙা কাকিমা, কাঁচড়াপাড়ায় সোনা ভাই...' শুনতে—শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মনে পড়ে, ছুটির এক দুপুরে বসেছিলুম ছোটো একটা চায়ের দোকানে। চারটে টেবিল, প্রতি টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার, আর সবুজ পরদাওয়ালা দুটো কেবিন খালি পড়ে আছে। মাছি ওড়ার শব্দ শোনা যায়। দেওয়ালে ভয়ংকর সব যুবতীদের ছবিওলা ক্যালেন্ডার! দুপুরের ঝিমঝিম ভাবের মধ্যে অনেকক্ষণ একা বসেছিলুম। এ সময়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন সাদা চাদর গায়ে বুড়ো এক ভদ্রলোক। চোখে চোখ পড়তেই ভীষণ চমকে উঠেছিলুম। বড়ো দয়ালু ওঁর চোখ। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম উনি মনে মনে বললেন, 'এই যে, কী খবর?' তটস্থ আমি তৎক্ষণাৎ মনে—মনে উত্তর দিলুম 'এই যে, সব ভালো তো?' পরমুহূর্তেই উনি চোখ সরিয়ে নিলেন, গিয়ে বসলেন কোণের একটা চেয়ারে, পত্রিকা খুলে মুখ আড়াল করে নিলেন। আমি টেবিলের কাছে আমার অন্ধকার ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম। সেই ভাবটুকু তারপর কেটে গিয়েছিল, যখন সদ্য ঘুম—থেকে—ওঠা বাচ্চচা বয় খালি গায়ে হাই তুলতে—তুলতে এসে চা দিয়ে গেল।

একদিন স্কুলে এল টেলিফোন! 'শিগগির বাড়িতে আসুন।' শরীর হিম হয়ে গেল। রিসিভার নামিয়ে রাখলুম আস্তে আস্তে। দীর্ঘদিন ধরে যেন এরকম একটি আহ্বানেরই ভয় ছিল আমার। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে 'মা' এই শব্দ বেজে উঠেছিল। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি এসে দেখলুম ঘরে চার—পাঁচজন পাড়া পড়শি, বালিশে মা—র নিবন্ত মুখ, আধখোলা চোখ ভয়ংকর লাল, ঠোঁট ফ্যাকাসে। ডাক্তার ব্লাডপ্রেশারের পারদের দিকে চেয়ে আছে। বলল— 'তাড়াতাড়ি করুন।' বুঝতে না পেরে আমি চারদিকে চেয়ে বললুম, 'কী?' আবার কে যেন বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন।' আমি বুঝতে পারলুম না, বাচ্চচা ছেলের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কী?' বাড়িওয়ালার বউ আমাকে একদিন টেনে নিয়ে বলল, 'যা তারকেশ্বরে মানত করে আয়!'

পরদিন। আমি তারকেশ্বর থেকে ফিরলুম। ভিড়ের ট্রেন! আমি বসবার জায়গা পাইনি। ট্রেন থামছে। প্রতিবার আমি মফসসলের লোকের মতো নিজেকেই জিজ্ঞেস করছি, 'এটা কি হাওড়া? এই কি হাওড়া?' অনেক ঘাড়, অনেক মাথার জঙ্গল সামনে, আমি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করছিলুম। হঠাৎ একঝলক তেতো জলে ভেসে গেল মুখ, কষ বেয়ে জামাকাপড় ভাসিয়ে দিল, 'এটা কি হাওড়া' আবার এই প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখি চোখের সামনে নড়ছে কালো—চাদর, ঝড়ের মতো ছুটছে ট্রেন, অথচ যেন বাতাস লাগছে না। পড়ে যাচ্ছি, কয়েকটা হাত আমাকে ধরল। টের পেলুম, আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবীর সব শব্দ— যেন আমি আবার মায়ের কোলের সেই শিশু রম— এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। তবু সেই আধ—চেতনার মধ্যে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'আপনারা সবাই শুনুন। আমি রমেন। আমার মায়ের বড়ো অসুখ। দু—দিন আমি তাই কিছুই খাইনি।' আমি বলতে চাইছিলুম, 'আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের সকলের কাছে অপরাধী।' আমার প্রাণপণে বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, 'আমি আজ আপনাদের ইচ্ছাশক্তিগুলি ভিক্ষা চাই। আপনাদের আশীর্বাদগুলি ভিক্ষা চাই।' ট্রেনের মেঝেয় ঘোর

অন্ধকারের ভিতরে দুটো সাদা পা। যেন চেনা! মুখ দেখা যায় না, তবু বুঝলুম সেই বুড়ো ভদ্রলোক। আজও তার চোখ কথা বলছিল। 'আমি তোমার জন্যই এসেছি রমেন। তুমি ভাগ্যবান। চলে এসো।' আমি কাঁদছিলুম, 'আমার মা—র বড়ো অসুখ। আমার বাবা বিদেশে পড়ে আছে।' সহজে উত্তর দিল না তার চোখ, বলল, 'জীবন ও মৃত্যুই কিছু লোকের দেখাশোনা করে; কিছু লোককে দেখে ভাগ্য; কিছু লোককে ধর্ম এসে নিয়ে যায়।'

ভালো হয়ে গেলে মা একদিন চিন্হিত মুখে বলল, 'চোখে ভালো দেখি না। কিন্তু মনে হচ্ছে তুই বড়ো রোগা হয়ে গেছিস!' হাসলুম, 'কই!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলল, 'আর কর্তার সার্টিফিকেটটা। সেটা পেলি না!'

৯

তখন বিকেল। পাকিস্তানি হাই কমিশনারের অফিস থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে যাব, এমন সময় হঠাৎ দেখি— তুমি! শিকড়সুদ্ধ আমার ডালপালা নাড়া খেয়ে গেল।

বলতে কী, স্কুটারের পিছনের সিটে তোমাকে মানায় না। এত খোলামেলা আর এত ভিড়ের মধ্যে।

দেখলুম সবুজ রুমালে ঘিরেছ মুখ, আজ নীল শাড়ি পরেছিলে, স্কুটারের পিছনের সিটে তুমি জড়োসড়ো, টালমাটাল। চওড়া পুরুষের কাঁধ আঁকড়ে ধরে হাসছিলে ভয় পাওয়া হাসি—'পড়ে গেলু—উ—উম!'

তারপরই অবহেলায় আমাকে পিছনে ফেলে রেখে ছুটে গেল তোমাদের স্কুটার। যেতে—যেতে আচমকা ঘুরে গেল বাঁয়ে— পড়ো—পড়ো হল, পড়ে গেল না। তোমরা গেলে পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

আমি গড়িয়াহাট রোড ধরলুম। অপরাহ্নের আলোয় ফুটপাথে আমার দীর্ঘ ছায়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে অচেনা মানুষ। তাদের ছায়া ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। সামনেই ট্রাফিক পুলিশের উত্তোলিত হাত, আর গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে আছে। একজন হকার আমাকে উদ্দেশ করে ধীর গম্ভীর গলায় হাঁকল 'গেঞ্জি...!' এসব কিছুই আমি তেমন খেয়াল করলুম না। আমার মন গুনগুন করছিল, কেন তুমি কোনোদিনই লক্ষ করলে না আমায়! 'হায়, আমি যে আছি তুমি তো জানোই না!'

রাতে ঘুম না এলে জেগে থেকে মাঝে—মাঝে বড়ো সাধ হয়। তুমি এসে একদিন বলবে, 'আমাকে চাও?'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আমি শান্ত চোখে চেয়ে বলব, 'চাই না।'

অবেলায়

ব্রতীন

খুব ভোরবেলায় আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম। ঘুম থেকে ওঠা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয় অবশ্য। আসলে রাতে আমার সত্যিকারের ঘুম একটুও হয়নি। একটু—একটু তন্দ্রা এসেছিল হয়তো বা, আর সঙ্গে—সঙ্গে অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন। পাগলাটে, অযৌক্তিক সব স্বপ্ন। ভয় পেয়ে বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে বিছানা ছাড়লাম। ঘড়িতে দেখি সোয়া পাঁচটা প্রায়। শীতকাল বলে আলো ফোটেনি। পাছে মায়ের ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে নিঃসাড়ে উঠে কলঘরে গিয়ে চোখে জল দিয়ে এলাম। না ঘুমোনো চোখ কর—কর করে উঠল। স্নায়ু শিরা সব উত্তেজিত হয়ে আছে, মাথার মধ্যে এলোমেলো অস্থির চিন্তা। আমি পাথরের মতো ঠান্ডা বাসি জল ঘাড় মাথার তালু কনুই আর পায়ে ঘষে থাবড়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। হাড়ের ভিতরে চলে গেল শীতের ভাব তবু একটুও সতেজ লাগল না নিজেকে।

ভোর রাতের দিকেই মা—র একটু ঘুম হয়। সকালের দিকে আমার ডিউটি থাকলে আমি মা—র সেই সামান্য ঘুমটুকুও কেড়ে নিই। অত সকালে বিশেষত শীতকালে বড়ো কষ্ট হয় মা—র। খদ্দরের একটা পুরোনো খাটো চাদর জড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে মা যখন আমাকে চা করে বাসি রুটি তরকারি সাজিয়ে দিতে থাকে, তখন প্রায়ই মনে হয়, মাকে সারাজীবন বড়ো কষ্ট দিলাম। মা—র গলায় কিছু একটু অসুখ আছে, সকালে সারাক্ষণ মা কাশতে থাকে। শুকনো কাশি, কিন্তু সেই শব্দে আমার বুকের ভিতরটা কেমন গুলিয়ে ওঠে। মনে হয় আমারও ওইরকম কাশি শুরু হয়ে যাবে।

আজ মাকে আমি ঘুমোতে দিলাম। জানালাটা খুলে দিয়ে একটু বাইরের বাতাসে শ্বাস টানতে ইচ্ছে করছিল। ঘরের মধ্যে কেমন একটা ভেজা চুলের গন্ধ, পুরোনো কাপড়চোপড়ের গন্ধ। স্যাঁতসেঁতে ঘর, অস্বাস্থ্যকর। ইচ্ছে করলেও জানালা খুললাম না। মায়ের কাশিটার কথা মনে পড়ল। গতকাল রাতে এক প্যাকেট সিগারেট কেনা ছিল। তোশকের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। বের করে দেখি প্যাকেটটা চেপটে গেছে। কোনোদিনই অভ্যাস ছিল না, কিন্তু কয়েক দিন খাচ্ছি সিগারেট। খুব যে কিছু হয় খেলে তা বুঝি না। অন্তত মন বা শরীরের কোনো পরিবর্তন টের পাই না, গলাটা কেবল খুশখুশ করে, আর ধোঁয়া লেগে চোখে জল আসে। তবু সিগারেট ধরালে নতুন খেলনার মতো একটা কিছু নিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

পাশের ঘরে যাওয়ার দরজাটা খোলা। ঘরটা আমার দাদা মতীনের। পাগল মানুষ। ঘরটায় আমার আজকাল আর ঢোকাই হয় না। আমি আর মা ঘরটা দাদাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি দাদার মাথার কাছে জানালাটা খোলা। সারা রাত ধরে হিম এসে ঘরটাকে ঠান্ডা করে রেখেছে। মেঝেয় অনেক সিগারেটের টুকরো। আমার দাদা মতীন সত্যিই সিগারেটের স্বাদ জানে। সস্তা বাজে সিগারেট, তবু কতগুলো খায় দিনে! কতবার মাকে ঘর ঝাঁট দিতে হয়। অনেক দিন পরে এ ঘরে এলাম। তাও সিগারেট খাওয়ার জন্য। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমি একটা সিগারেট খাব। কোনোদিন দাদার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এরকম সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবা যায়নি। ঘুমন্ত দাদার শিয়রে দাঁড়িয়েও না। আমার দাদা মতীনকে ছেলেবেলা থেকেই আমি ভয় করি। সাত—আট বছরের তফাত তো ছিলই। তা ছাড়া ছিল আমাদের সবাইকে আড়াল করে রেখে দাঁড়ানোর অদ্ভুত গুণ। তাই সিগারেট ধরাতে আমার বাধো—বাধো লাগছিল একটু। একবার চেয়ে দেখলাম। গা থেকে লেপ সরে গেছে, মশারির চারটে খুঁট ছিঁড়ে সেটাতে জড়িয়েছে সারাটা শরীর। মুখটা দেখা যায় না। বালিশের ওপর চুলের ভারে প্রকাণ্ড একটা মাথা পড়ে আছে। আসবাব বলতে চৌকি বাদ দিলে একটা টেবিল আর চেয়ার, একটা শেলফে বই। এ সবই দাদার মাস্টারির চাকরির সময় কেনা। তখন সামান্য আসবাবেরই কত গোছগাছ ছিল, যত্ন ছিল বইয়ের মাঝে মাঝে টেবিলের ফুলদানিতে নিজেই ফুল এনে সাজাত, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিত সন্ধেবেলায়। দেখলাম সুন্দর পাতিলেবুর রঙের ফুলদানিটার গায়ে সন্ন্যাসীর শরীরের মতো ছাই মাখা। বোধহয় ওতে এখন সিগারেটের ছাই ফেলা হয়। ভালো করে দেখলে দেখা যাবে সারা ঘরেই সন্ন্যাসীর শরীরের সেই ছাই রং। উদাসীন ঘরখানা। সারা ঘরে ছড়ানো চিঠির প্যাডের নীল কাগজ। সুন্দর কাগজ। প্রতি কাগজেই খুদে খুদে কী যেন লেখা। সারাদিন লেখে আমার দাদা মতীন। চিঠি লেখে। কাকে লেখে কে জানে। শুনেছি বালিগঞ্জে কোথায় যেন পাথরের কড়িওয়ালা একটা প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল, তার চারধারে ছিল ঘেরা—পাঁচিলে ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান, আর সেই বাড়িতে ছিল একটি মেয়ে। না, তাদের সঙ্গে কোনো কালে বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না দাদার। দাদা কেবল দূর থেকে তাকে মাঝে মাঝে দেখেছিল। আমার দাদা মতীনকে সে মেয়েটি বোধ হয় দেখেওনি। বোধ হয় দুর্বল লোকেদেরই অসম্ভব কিছু করার দিকে ঝোঁক বেশি থাকে। আমার দাদারও ছিল। কথাটা হয়তো একটু কেমন শোনাবে। একটু আগেই বললাম দাদা আমাদের সবাইকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল। তবু কথাটা কিন্তু সত্যি। আমার বিশ্বাস দাদা দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। অতি বেশি টান ভালোবাসা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। আমার এবং মায়ের প্রতি দাদার অসম্ভব ভালোবাসা দেখে বরাবর মনে হয়েছে দাদা বড়ো দুর্বল মানুষ! মা—র সঙ্গে রাগারাগি করে আর ভাব করার জন্য চিরকাল ঘুরঘুর করেছে মায়ের আশেপাশে। যা বলছিলাম, অসম্ভব কিছু করার দিকে এই দুর্বল মানুষটির হয়তো প্রবল একটা ঝোঁক ছিল। নইলে আমাদের মতো ঘরের সাধারণ ছেলে হয়ে কেউ ওই বড়ো বাড়ির মেয়ের জন্য পাগল হয়! তাও পরিচয় নেই, নাম জানা নেই, ভালো করে চোখাচোখি অবধি হয়নি। সঠিক ঘটনাটা আমি জানি না। শুনেছি ওই অসম্ভব সুন্দর নির্জন পাড়ার রাস্তায়—রাস্তায় ঘুরে আমার দাদা মতীন তার অবসরের সময় বইয়ে দিত। সম্ভবত মা ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। মায়েরা পায়। মাঝে মাঝে মাকে বলতে শুনেছি, 'কী জানি কোন ডাইনি ধরেছে।' আমি তখন সদ্য বেহালার একটা কারখানায় ঢুকেছি, প্রথম মাসের মাইনে পাইনি। সে সময়ে একদিন দাদা ফিরলে দেখলাম তাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। অবাস্তব। জ্বলজ্বল করছে চোখ, মুখখানা লাল, আর ক্ষণে ক্ষণে হাসির লহর তুলে সে যে কত কী কথা! খেতে বসেছি পাশাপাশি, সামনে মা, দাদা হঠাৎ হেসে বলল, 'একটা ব্যাপার হয়ে গেল মা।' বলে নিজেই খুব হাসল। 'একটা মেয়ে বুঝলে— বেশ সুন্দর চেহারার পবিত্র মেয়ে— সন্ন্যাসিনী হলে মানাত— তাকে দেখলাম স্কুটারের পিছনে বসে বিচ্ছিরি গুন্ডা টাইপের একটা ছেলের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল।' বলেই ভীষণ হাসল দাদা। 'সমাজটা যে কী হয়ে যাচ্ছে না মা! কার বউ যে কার ঘরে যাচ্ছে! কী ভীষণ যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সব, তোমরা ঘরে থেকে বুঝতেই পারছ না।' বলতে বলতে বিষম খাচ্ছিল দাদা। মা মাথায় ফুঁ দিয়ে বলল, 'কথা বলিস না আর। জল খা।' কার

বউ কার ঘরে যাচ্ছে! আমার দাদা মতীনের ওই কথাটা আমার আজও বুকের মধ্যে লেগে আছে। আমরা তখন পাশাপাশি চৌকিতে দু—ভাই শুই, অন্য ঘরে একা মা। সে রাতে দাদাকে দেখলাম খুব হাসিখুশি মনে শুতে এল। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে শোয়ার আগে কী যেন লিখছিল। চিরকালই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা কম হয়। সে রাতে দাদা জিজ্ঞেস করল হঠাৎ, 'তুই যেন কত মাইনে পাস?' বললাম। শুনে দাদা একটু ভেবে আপনমনে বলল, 'চলে যাবে।' নতুন চাকরির পরিশ্রমে খুব নিঃসাড়ে ঘুম হত তখন। মাঝরাতে সেই চাষাড়ে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে দেখি আমার শরীরের ওপর দু—খানা হাত ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উঠে বসলাম। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে দাদা, মাথাটা চৌকির ওপর রাখা, হাত দু—খানা দিয়ে আমাকে জাগানোর শেষ একটা চেষ্টা করছে সে। আমি উঠতেই তার অবশ শরীর মাটিতে পড়ে গেল। তখনই আমাদের পরিবারের একজন কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু কমল না। ছারপোকা মারার যে বিষ দাদা খেয়েছিল হাসপাতালের ডাক্তাররা সেটা তার শরীর থেকে টেনে বের করে দিল। বের করল কিন্তু পুরোটা নয়। খানিকটা বোধ হয় দাদার মাথার মধ্যে রয়ে গেল।

ওই তো এখন বিছানায় মশারি জড়িয়ে শুয়ে আছে আমার দাদা মতীন। পাগল মানুষ। দাদা কিছুই দেখে না, লক্ষও করে না আমাদের। ঘুমিয়ে আছে। তবু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে কেমন বাধো—বাধো লাগে। ভেবে দেখলে আমার সেই দাদা মতীন তো আর নেই। তবু না থেকেও যেন আছে।

সিগারেট ধরিয়ে আমি খোলা জানালার কাছে দাঁড়ালাম। অমনি হি—হি বাতাস নাক গলা চিরে ভিতরে ঢুকে অবশ করে দিল। চোখে জল এসে গেল। শরীরে উত্তেজিত অসুস্থ ভাবটা সামান্য নাড়া খেল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আছে, তবু একটুও ঘুম হয় না আজকাল। কারখানা বন্ধ না থাকলে শীতের এই ভোরে সামনের ওই রাস্তাটা দিয়ে আমি কাজে যেতাম। এই ভোরবেলায় চারপাশ কী সুন্দর থাকে। ঠিক কতখানি সুন্দর তা বলে বোঝানোই যায় না। একমাত্র এই ভোর—রাত্রেই কলকাতাকে নিঃঝুম মনে হয়। অন্ধকারে পাখিরা ডাকাডাকি করে বাসা ছাড়ে না। রাস্তায় পা দিয়ে মনে হয় গ্রামের রাস্তায় চলেছি। বাতাস খুব পরিষ্কার থাকে, জীবাণুশূন্য। একটু অন্ধকার আর একটু কুয়াশা থাকে বলে চারপাশে নানা রহস্যময় ছবি এসে ওঠে, চেনা জায়গার গায়ে অচেনার প্রলেপ পড়ে যায়। চারদিকের বাড়িগুলো আবছা আর ঝুপসি গাছের মতো দেখায়। প্রকৃতির সঙ্গে তারা এক হয়ে যায়। দাদার ঘরে একখানা বই আছে, সংবাদপত্রে সেকালের কথা। তাতে পুরোনো কলকাতার দুটো চারটে ছবি আমি দেখেছি। কাঁচা রাস্তা, পুকুর আর গাছগাছালিতে ভরা কলকাতা, শেয়াল ঘুরে বেড়ায়। পুরোনো আমলের গোল গম্বুজ আর থামওয়ালা বাড়ির সামনে ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বাঙালিবাবুদের মাথায় টোপরের মতো টুপি, পায়ে নাগরা, আর পরনে কাবাকুর্তা। ভোর রাত্রের কলকাতা সেই পুরোনো কলকাতা। পুকুর আর গাছগাছালির গ্রাম্য শহর। আমি সেই পুরোনো শহর ধরে হেঁটে যাই কসবা থেকে বালিগঞ্জ স্টেশনের ট্রাম ডিপো পর্যন্ত। ভোরের প্রথম ট্রাম ধরি।

কারখানার মধ্যে বিলিতি শহর। ফুলগাছে আধো—ঢাকা কাচের বাড়ি যত্নে লাগানো ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসের সারির লন। স্বয়ংক্রিয় লন—মোয়ার বটবট করে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। দয়ালু পাদরির মতো সুন্দর হাসিমাখা মুখে সাহেব ম্যানেজার ডিলান সারাদিন আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ভাবতেই এখন বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। আমি মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দেওয়াল খুঁজলাম। দাদার ঘরে কোনো ক্যালেন্ডার নেই। না থাক। গতকাল ছিল ষোলো, আজ ধর্মঘটের সতেরো দিন। মনে হচ্ছে আমরা একটা হারা—লড়াই লড়ে যাচ্ছি। প্রবেশন পিরিয়ডে বিশ্বনাথকে ছাঁটাই করা হল। সেটা কোম্পানির ইচ্ছে। শিক্ষানবিশের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। বিশ্বনাথের হাতের জব বারবার স্ক্র্যাপ হয়ে যেত। কোম্পানির দোষ ছিল না। তবু ইউনিয়ন রুখে দাঁড়াল। তিনদিন ধর্মঘটের পর কোনো বিজ্ঞ লোক এসে বলল — এটা বে—আইনি হচ্ছে। স্ট্রাইক টিকবে না। তোমরা বরং চার্টার অব ডিমান্ড দাও। রাতারাতি চার্টার অব ডিমান্ড তৈরি হল। চোদ্দো দফা দাবি। তবু বোঝা যাচ্ছিল হারা—লড়াই। ট্রাইব্যুনালে চলে গেল দাবিপত্র। কোথাকার কোন আনাড়ি কারিগর বিশ্বনাথের জন্য সুন্দর মনভোলানো বিলিতি শহর থেকে আমি চললুম

নির্বাসনে। যেমন নাম—না—জানা অচেনা একটা বড়ো বাড়ির মেয়ের জন্য আমার দাদা মতীন চিরকালের জন্য হয়ে রইল পাগল মানুষ। কেমন যেন অদ্ভুত যোগাযোগ। বললে অবিশ্বাস্য শোনাবে। তবু এটা সত্য যে, সেই অচেনা মেয়েটার জন্য দাদা পাগল না হলে আমি ইউনিয়নে নামতামই না। সে ছিল বড়ো বাড়ির মেয়ে, আমার খ্যাপা দাদা মতীন তার কাছাকাছিই যেতে পারল না। বলতেই পারল না, 'তোমাকে চাই।' কেবল ঘুরে বেড়াল রাস্তায় রাস্তায়। তারপর একদিন তার চোখের ওপর দিয়ে চালাক একটি সাহসী ছেলে মেয়েটিকে স্কুটারের পেছনে নিয়ে চলে গেল। কেন এরকম হবে? কেন এরকম দুষ্প্রাপ্য হয়ে থাকবে একটি মেয়ে আমার দাদার কাছে? কেন থাকবে তাদের এরকম দামি বাগানের চারদিকে ওই অত উঁচু ঘেরা—পাঁচিল, যার মধ্যে আমরা কোনোদিনও যেতে পারব না? মেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারও কারও থাকবে স্কুটার, যা কেন আমাদেরও নেই? নিজের ঘরসংসার বজায় রেখে, পাগল ভাই আর বিধবা মায়ের দায় নিয়ে সমাজের সেই অব্যবস্থা আমি কী করে পালটে দেব? তেমন কোনো উপায় আমার ছিল না হাতের কাছে। টিমটিম করে অফিসের ইউনিয়নটা চলছিল তখন। আমার মাত্র একুশ কি বাইশ বছর বয়স। রাগে আক্রোশে ক্ষোভে আমি সেই ইউনিয়নের মধ্যে ফেটে পড়লাম। যদি তা না পড়তাম তবে আজ আমার পিছিয়ে যাওয়ার রাস্তা থাকত। আমি ইউনিয়নের চিহ্নিত কর্মী, দাঙ্গাবাজ, আক্রমণকারী মনোভাবাপন্ন লোক; আমার পিছনে ঘুরছে চার্জশিট আর তিনটে পুলিশ কেস। ভেবে দেখলে আমার দাদা মতীনের জন্যই আজ আমার এই রাত জাগার ক্লান্তি, অনভ্যাসের সিগারেট আর ভয়। হাইস্কিলড অপারেটরের সুন্দর বেতন থেকে শূন্যতা। কিংবা এই সবের জন্য সেই মেয়েটাই দায়ী, যাকে আমি চিনি না, যাকে চিনত না আমার দাদা মতীনও। তা হোক। তবু সমাজের ব্যবস্থা পালটে যাওয়াই ভালো। আজ বরং আমি একটা হারা—লড়াই নাহয় হেরেই গেলাম। মেয়েটিকে ধন্যবাদ।

চিঠির একটা নীল কাগজ সামান্য উড়ে এসে আমার পায়ের গোড়ালিতে লাগল। কৌতূহলে তুলে নিলাম। খুদে খুদে অক্ষরে লেখা— 'কেউ ঠিকঠাক বেঁচে নেই। পুরোপুরি মরেও যায়নি কেউ। ওরকম কিছু কি হয় কোনোদিন? ঠিকঠাক বেঁচে থাকা, কিংবা পুরোপুরি মরে যাওয়া?...' আমি আর পড়লাম না। কী যে লেখে পাগল। মাঝে মাঝে ঠিকানা—না—লেখা খাম আমাকে দিয়ে বলে, 'ডাকে দিয়ে দিস।' কখনো নিজেই গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে আসে ভাঁজ করা কাগজ। পিওনেরা হয়তো ফেলে দেয়, কিংবা হয়তো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়ে হাসাহাসি করে। সারা ঘরময় ছড়ানো এই কাগজ আর সিগারেটের টুকরো। পয়সা নষ্ট। হঠাৎ রাগ হয়ে গেল বড়ো। তোমার জন্যই, তোমার জন্যই এতসব গণ্ডগোল।

আমি মশারির ঢাকাটা রুক্ষ হাতে সরিয়ে নিলাম। রোগা একখানা মুখ। চমকে চোখ খুলল। জুলজুল করে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আমাকে দেখতে থাকল। মশারির মুঠ ধরে থাকা আমার লোহাকাটা প্রকাণ্ড হাতখানার দিকে তাকিয়েই আমি লজ্জা পেলাম। আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম দাদার মুখ। ও তো খুব বেশি কিছু চায় না। কেবল চিঠির কাগজ আর সস্তা সিগারেট। দেখলাম ওর ময়লা ঘেমো গন্ধের গেঞ্জি, গালে না—কামানো দাড়ি, আ—ছাঁটা চুল। বড়ো যত্নে নেই আমার দাদা মতীন। ঘুম ভেঙে ও এখন সন্দেহের চোখে ভীত মুখে আমাকে দেখছে। না, আমি ওর স্বপ্নের কেউ না। আমি বাস্তব, যার সঙ্গে ওর পাট অনেক দিন চুকে গেছে। আমি তাই আস্তে আস্তে ওর ঘর থেকে এ ঘরে চলে এলাম।

থাক, আমার দাদা মতীন ওরকমই থাক। আমরা যা দেখতে পাই না, ও হয়তো তাই দেখে। বনের পাখিপাখালিরা এসে হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলে যায়, হয়তো মায়ারাজ্য থেকে আসে ওর চেনা পরিরা, ওকে ঘিরে আছে স্বপ্নের সব মানুষ। মনে হয় আমার দাদা মতীনের এখন আর কোনো দুঃখ নেই। সেই অচেনা মেয়েটি যদি এসে এখন সামনে দাঁড়ায়, যদি বলে, 'আমাকে চাও?' তা সে ওইরকম ভয় পাওয়া চোখে জুলজুল করে চেয়ে দেখবে। চিনবেই না; সেও তো এখন আর দাদার সেই স্বপ্নরাজ্যের কেউ নয়। কী হবে ওকে আর সুখ—দুঃখের বাস্তবের মধ্যে টেনে এনে? তার চেয়ে এই বেশ আছে আমার দাদা মতীন। পাগল মানুষ।

মা

কাল রাতে যেন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল। ঘুমের মধ্যেই শুনছিলাম টিনের চালের ওপর খই—ফোটার মিষ্টি শব্দ। করমচা গাছের ডালপালায় বাতাস লাগছে। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! সেই বৃষ্টির মধ্যে দেখি কর্তা খোলা জানালা বন্ধ করবার চেষ্টা করছে। বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাচ্ছে মানুষটা। সেদিকে খেয়াল না করে আমি রাগে দুঃখে মানুষটাকে জিজ্ঞেস করছি— তুমি বেঁচে থাকতেও আমার বিধবার দশা কেন! সেই শুনে খুব হাসছিল মানুষটি। বেঁচে থাকতে একটা হাড়জ্বালানো শ্লোক বলত প্রায়ই— 'সেই বিধবা হলি আমি থাকতে হলি না।' দেখলাম জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বিড়বিড় করে সেই শ্লোকটাই বলছে। এই দেখতে—না—দেখতেই ঘুম ভেঙে গেল। ওমা, কোথায় বৃষ্টি। আর কোথায়ই বা সেই মানুষ। টিনের চালই বা কোথায়, কোথায়ই বা সেই করমচার গাছ। মরা মানুষের স্বপ্ন দেখা ভালো না। তবু আমি প্রায়ই দেখি। তাঁর মরার পর বারো বছর হয়ে গেল। ধর্মকর্মের দিকে ঝোঁক ছিল খুব। বলত— 'যদি জন্মান্তর থাকে— বুঝলে, তবে আমি বতুর ছেলে হয়ে আসব।' বোধহয় সেইজন্যেই এখনও পৃথিবীতে জন্মায়নি মানুষটা। আত্মাটা আমাদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। দেখে যায় তাঁর আসার রাস্তা কতদূর তৈরি হল। ঘুম ভেঙে উঠে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছিলাম। কর্তার স্বপ্ন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওদের তো বাড়িঘর নেই, আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ানো। হয়তো শীতে বৃষ্টিতে বড়ো কষ্ট পেতে হয়। ওম পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে চলে আসেন। ইচ্ছে করে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ডেকে ছাতা আর কম্বল দান করি। অনেক টাকার ঝক্কি! মাঝরাতে বসে কত কথা ভাবছিলাম। শুনি বাইরে কাক ডাকছে। রাতে কাক ডাকা ভালো নয়। হয়তো জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। তবু বড়ো বুক কাঁপে। মঙ্গলের কোনো চিহ্ন তো দেখি না। টের পেলাম বতু তার বিছানায় পাশ ফিরল। আগে এক কাতের ঘুম ছিল ওর। ভোরবেলা তুলে দিতে গেলে ময়দার দলার মতো বিছানার সঙ্গে লেগে থাকত। বাচ্চাবেলার মতো খুঁতখুঁত করে বলত— আর একটু মা, আর একটু। ডান কাতের ঘুম হল, এবার বাঁ—কাতে একটু ঘুমোতে দাও। পাঁচ মিনিট, কষ্ট হত তুলতে। তবু চাকরি উন্নতি এসব ভেবে মায়া করতাম না। তুলে দিতাম। যখন চা করে রুটি তরকারি খেতে দিতাম তখনও দেখতাম, ওর দু—চোখে রাজ্যের ঘুম লেগে আছে। আর, এখন কয়েকদিন হল রাতে ওর পাশ ফেরার শব্দ পাই। সারারাত কেবলই পাশ ফেরে। ঘুম হয় না বোধ হয়। ও এখন জামিনে খালাস আছে। পরশু দিনও পুলিশের লোক এসে বলে গেল— ও যেন বাড়িতে থাকে, কোথাও না যায়। কারখানার ব্যাপারটা আমি একটু একটু জানি। বেশি জানতে ভয় করে। তবু একদিন সাহস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম— 'তোরা কী জিতবি?' ও ঠোঁট ওলটাল। বুঝি অবস্থা ভালো নয়। বললাম— 'কী দরকার ওসব হাঙ্গামা করে! মিটিয়ে ফেল।' ও শুকনো হেসে একটা কবিতার লাইন বলল— 'যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান...!' ভালো বুঝলাম না। কারখানা থেকে ওর বন্ধুরা আসে। আমি রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকি, এ ঘরে ওরা মিটিং করে। মাঝে মাঝে একটু চেঁচামেচি হয়, এ ওকে শাসায়। বুঝি ওদের মধ্যে মিল হচ্ছে না। সবাই এককাট্টা নয়। বতু গোঁয়ার। তবু জানতে ইচ্ছে করে ও এখন কোন দলে। ওর অবস্থাটা কী! আবার ভাবি বাইশ বছর বয়স থেকে সংসার ঘাড়ে নিয়েছে। ও কি আর ওর দায়িত্ব বোঝে না! আমার চেয়ে বরং ভালোই বোঝে। আমি তো মাত্র রান্না করি আর ঘর আগলাই। ওকে কত কষ্ট করতে হয়, হয়তো অপমান সহ্য করে বকাঝকা খায়, শীতে বৃষ্টিতে কতটা পথ পার হয়ে যাতায়াত করে। খুঁটে এনে আমাদের খাওয়ায়। গত আশ্বিনে আঠাশে পা দিল বতু। কারখানায় যখন ঢুকল তখনও দাড়িতে ভালো করে ক্ষুর পড়েনি, কচি মুখখানি। এখন বয়েসকালের গোটাগুটি মানুষ হয়ে উঠেছে। মতু যদি ঠিক থাকত তবে বতুর বিয়ে দিতাম। এটাই ঠিক বয়স। কর্তাকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার রাস্তা তৈরি হয়ে যেত। বতুর ছেলে হলে রোদে বসে তেল মাখাতাম, চুপচুপে করে। ঠাট্টা করে বলতাম, 'হ্যাঁ রে সত্যিই কি আর জন্মে তুই আমার ভাতার ছিলি?'

ভাবতেই গায়ে কেমন শিরশির করে কাঁটা দেয়। বতুর ছেলে হয়ে কর্তা যদি সত্যিই আসত তবু নতুন সম্পর্কে কেমন লাগত আমার!

আজকাল কেমন যেন ভুলভাল হয়ে যায়। পুরোনো কথার সঙ্গে আজকালের কথা গুলিয়ে ফেলি। তাল থাকে না। বোধ হয় পরশু দিন দুপুরে একটু ঘুমিয়েছি। ঘুম ভাঙল যখন তখন শীতের বেলা ফুরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে সুদর্শন চাকরের নাম করে ডাকছিলাম। মনে হয়েছিল শ্বশুরমশাই কাছারি থেকে ফিরে এলে বড়োঘরের বারান্দায় পুবমুখো ইজিচেয়ারটায় বসে আছেন, এখনও তাঁকে তামাক দেওয়া হয়নি। সুদর্শনকে ডাক দিয়ে আমি মাথার ঘোমটা ঠিক করে উঠতে যাচ্ছি, শ্বশুরমশাইয়ের পা থেকে জুতো খুলে দেব বলে। ভুল বুঝতে পেরে কেমন যেন অবশ—অবশ লাগল। কতকালকার কথা, সব তবু যেন মনে হয় গতকালের দেখা। সুদর্শন সাতাশ বছর চাকরি করে শ্বশুরবাড়ির কাছারিঘরে মারা গেল। তখন বতুর বয়স বোধ হয় চার কি পাঁচ। সুদর্শনের কাঁধে চড়ে সে অনেক ঘুরেছে। সুদর্শন মরে গেলে বাড়িসুদ্ধু লোক কেঁদেছিল। সাতাশ বছরে ও আর চাকর ছিল না। যে কথা বলছিলাম, যে ভুল পেয়ে বসেছে আমাকে। বতু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, সারাক্ষণ বিড়বিড় করে কী বকো মা? চমকে উঠি। বিড়বিড় করি। হয়তো করি। সারাদিন বড়ো কথা বলতে ইচ্ছে করে। মাথার মধ্যে ঠাসা সব পুরোনো দিনের কথা। শোনার লোক নেই। তাই বোধ হয় আকাশ বাতাসকে শোনাই। তোরা তো কাছে থেকেও নেই। বতুর চাকরি আর ইউনিয়ন, সারা দিনে কথা দূরে থাক, আমার দিকে ভালো করে তাকায় না পর্যন্ত। আর মতু! সে আমাকে চেনেই না। সারাদিন নীল চিঠির মধ্যে ডুবে থাকে। কর্তা বলত, 'তোমার দুটো ঘোড়া, গাড়ি চলবে ভালো।' গাড়ি বলতে আমাকেই বোঝাত, যেন আমার চলার ক্ষমতা নেই ছেলেরা না চালালে। কাছে তাকে পেলে এখন বলতাম— ঘোড়া দুটো কেমন দু—মুখো ছিটকে গেল দ্যাখো। খাদের মুখে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, একটু জোর বাতাস এলেই গড়িয়ে পড়বে। আর উঠবে না।

মরতে অবশ্য আমার একটুও দুঃখ নেই। কিন্তু মতু—বতুর কথা ভাবলে মরার ইচ্ছেটাই চলে যায়। ওরা দু—জন দু—রকমের পাগল। আবার ভাবি, ওদের জন্যেই যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে তো আরও বহুকাল বেঁচে থাকতে হবে। সে যে বড্ড একঘেয়ে। আবার যদি মরে যাই তবে ওদের দেখবে কে? বিশেষ করে মতুকে। হয়তো ততদিনে বতুর বউ এসে যাবে। কিংবা এমনও তো হতে পারে যে, মতু ভালো হয়ে গেল আবার আগের মতো চাকরি—বাকরি করল। হতে পারে না কেন! এরকম কি হয় না।

সামনের শনিতে একটু বারের পুজো দেব। আর প্রতি বিষ্যুৎ বারে একটা বামুন ছেলেকে ডেকে এনে পাঁচালি পড়াব। নিজে কয়েকদিন পড়বার চেষ্টা করেছি। চোখে বড়ো জল এসে যায়। তিনটে মানসিক করা আছে আমার মতুর জন্য। অনেক দিন হয়ে গেল। মনের ভুলে একটা মানসিক করে রেখেছি ময়মনসিংহের কালীবাড়িতে। কালীর সোনার চোখ গড়ে দেব। এখানে বসেই করেছি সেই মানসিক, এখন ভাবি মতু ভালো হলে কী করে ওখানে পুজো পাঠাব? ওরা কি দেবে আমাকে যেতে? বতুই কি ছাড়বে? কিন্তু বুঝি না, গেলে কী হয়! ওসব তো আমাদেরই দেশ জায়গা ছিল। বতু মতু দু—জনেই জন্মেছে ওখানে। কত যে বালাই তৈরি করছে মানুষ।

বতুর বউ এসে মতুকে দেখবে— এইরকম একটা বিশ্বাস আঁকড়ে আছি। মরার সময় হলে— যদি বতু ততদিনে বিয়ে না করে—

তবে ওই বিশ্বাস নিয়েই আমাকে যেতে হবে। তবু বড়ো ভয় করে। যদি বতুর বউ তেমন লক্ষ্মীমন্ত না হয়! যদি মায়াদয়া না থাকে তার! মাঝে মাঝে এসব কথা ভেবে উতলা হয়ে বলে ফেলি। বতু রাগ করে— সমাজ—সংসারের কথা ভাবো মা, কেবল নিজেরটুকু চিন্তা করে করেই গেলে। দ্যাখো না, সমাজের চেহারা এমন পালটে দেব যে, মানুষকে আর নিজের সংসারের কথা ভাবতেই হবে না। তখন সবাইকেই দেখবে সমাজ। বতুটাও একরকমের পাগল। সমাজ কি আমার ঘরে এসে হাড়ির খোঁজ নেবে! কিংবা হয়তো ও ঠিকই বলে। সমাজ—সংসারের আমি কতটুকু দেখেছি? ঘোমটার মধ্যেই তো আদ্দেক বয়স কেটে গেল।

যখন সহজভাবে চারদিকে তাকাতে পারলাম তখন চোখে ছানি আসছে। তবু আমি বতুর সমাজের ওপর ভরসা না করে ওর বউয়ের ভরসাই করে আছি। যদি সে মেয়েটার মনে একটু মায়ের ভাব থাকে তবে মতুর জন্য চিন্তা নেই। ওকে বালাই বলে না ভাবলেই হল। ও তো কাউকে জ্বালায় না, চেঁচামেচি করে না। খুব শান্ত থাকে। সারাদিন কেবল চিঠি আর সিগারেট। আমি মাঝে মাঝে ঘরটা পরিষ্কার করি। চিঠির কাগজ জড়ো করে টেবিলে গুছিয়ে দিই। ওই কাগজগুলো ফেলতে গেলেই ভীষণ রাগ করে মতু। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু 'উঃ' 'উঃ' বলে ওপর দিকে হাত ছুড়তে থাকে। তবু জোর করে যদি ফেলি তবে মাথার চুল ছেঁড়ে, দুম—দুম করে দেওয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদে। নিজের মাথাটার ওপরেই ওর চিরকালের রোখ। চুল ছেঁড়া, মাথা ঠোকা সেই ছেলেবেলার মতোই আবার ফিরে এসেছে। ছেলেবেলায় আমার ওপর রাগ হলে ও মাথা দিয়ে আমাকে টুঁ মারত। একবার বুকের মাঝখানে টুঁ মেরেছিল। এমনিতেই অম্বলের ব্যথা আমার, সেই টুঁ খেয়ে দম বন্ধ হয়ে চোখ কপালে উঠল। এখনও বুকের হাড়ে পাঁজরায় সেই ব্যথা একটুখানি রয়ে গেছে। আর কোনোদিন কি মতু আদর করতে গিয়ে আমার বুকে মুখ গুঁজবে কিংবা রেগে গিয়ে মারবে টুঁ? না, মতু আর সে মতু তো নেই। তাই বুকের সেই ছোটো ব্যথাটুকু আমার চিরকাল থাক। সেই ব্যথাটুকুই মতু হয়ে আমার কাছে আছে।

খুব ভোরবেলাতেই বতু উঠে তার দাদার ঘরে গিয়েছিল আজ। এমনিতে বড়ো একটা যায় না। কী জানি আজ বোধহয় দাদার জন্য মায়া হয়েছিল একটু। তাই দেখে এল। কিংবা হয়তো রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছিল দাদাকে নিয়ে। বতুর ভালোবাসা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মতুরটা যেমন যেত। তবু বতুর মনেও বড়ো মায়া— আমি জানি। মানুষের জন্য ও ভাবে, সমাজ—সংসারের জন্য ভাবে। পাড়ার লোকেদের দায়ে দফায় ও দেখে। মতুরও ভালোবাসা ছিল, তবে সেটা অন্য রকমের। অন্যর দুঃখ দেখলে মন খারাপ করে থাকত, হয়তো লুকিয়ে কাঁদতও, কিন্তু বুক দিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত না, বতু যেমন করে। হয়তো মতুর লজ্জা সংকোচ বেশি ছিল। তা ছাড়া ছিল ওর কুনো স্বভাব, মাথার মধ্যে ছিল চিন্তার কারখানা। তাই ওর ভালোবাসা ছিল ভাবের।

চা খেয়ে সকালেই বতু বেরিয়ে গেল। বলে গেল— 'ভাত ঢাকা দিয়ে রেখো, ফিরতে দেরি হবে।' ওর মুখ চোখের অবস্থা ভালো না। কী জানি কী হবে। ওর বন্ধুরা আমাকে বলে যায়— ওর কিছু হবে না। চাকরি গেলেও ও আবার চাকরি পাবে। পুলিশের কথা ভাবি। ওরা নাকি বড্ড মারে!

অনেক বেলা পর্যন্ত মতু শুয়ে আছে। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম— ওঠ রে। উঠল। পারতপক্ষে অবাধ্যতা করে না। চায়ের কাপ হাতে দিলাম। বাসি মুখে চা খেতে লাগল। অনেক করেও ওকে দাঁত মাজাতে পারি না, স্নান করাতে পারি না। গায়ে চিট হয়ে ময়লা বসেছে। ওকে যে জোর করে কলঘরে টেনে নিয়ে যাব এমন আমার সাধ্যে কুলোয় না। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে বতু জোর করে স্নান করিয়ে দেয়। ওই জোর করাটা দেখতে আমার ভালো লাগে না। বুকের মধ্যে একটু কেমন করে। বেশ কয়েক দিন হল বতু দাদাকে স্নান করায় না।

মেঝে থেকে সিগারেটের টুকরোগুলো তুলে, বাঁ—হাতে তেলোয় জমা করছিলাম। শিউলি ফুল কুড়োনোর কথা মনে পড়ে। সামান্য একটু শ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে গেল। আস্তে আস্তে অথর্ব হতে চললাম। অথচ খুব বেশি দিন আগে জন্মেছি বলে মনে হয় না। বে—ভুল মনে কেবল পুরোনো দিনের কথা কালকের কথার মতো মনে হয়। কিন্তু সেটা তো সত্যি নয়। মতুরই বয়স ছত্রিশ পার হয়ে গেল। ওর আগেও একটা হয়েছিল। বাঁচল না। ভালোই হয়েছে। সেটা আবার কোন রকমের পাগল হত কে জানে।

মতু একটুক্ষণ আমাকে দেখল। যেন চেনে না। তবু আমি জানি মতু মাঝে মাঝে খুব স্বাভাবিক হয়ে যায়। একদিন মাঝরাতে ওর ডাক শুনলাম— মা, ওমা, আমার টেবিলে জল রাখোনি কেন? ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। আনন্দে ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা। জল খাওয়ার পর কিন্তু আর চিনল না আমাকে। তারপর মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে জল না রেখে দেখেছি আবার 'মা' বলে ডাকে কি না। ডাকত মাঝে মাঝে।

কিন্তু জল খাওয়ার পরই ভুলে যেত। জল না রেখে কষ্ট দিয়ে ওকে পরীক্ষা করতে আর ইচ্ছে হয় না। বেশি সিগারেট খায় বলেই বোধ হয় ওর জলতেষ্টা খুব। তেষ্টার জলের চেয়ে কি মা ডাকটা বেশি? তাই আমি জল রাখতে ভুলি না।

ওর এ অবস্থা হওয়ার সময়ে প্রথমদিকে বন্ধুরা খুব আসত। এখন আর আসে না। লজ্জার মাথা খেয়ে তাদের কাছে মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করতাম। কেমন মেয়ে, কীরকম বয়স, কোন জাত! তারাও কেউ দেখেনি। মতুর কাছেই শুনেছে বেশি বয়স না তার, খুব পবিত্র সুন্দর চেহারা, আর খুব অহংকারী। কোনোদিকে নাকি তাকাতই না। তার নাম, জাত কেউই জানে না। এসব শুনে আমি একদিন বতুকে বলেছিলাম— 'কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দে। তাতে মেয়েটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে লেখ যে, আপনার জন্যই আমার দাদার এই অবস্থা, আপনি এসে তাকে বাঁচান। আমরা আপনার কাছে কেনা হয়ে থাকব।' বতু রাজি হল না, ঝাঁকি দিয়ে বলল— 'সে মেয়েটা কী করে বুঝবে যে, এটা তাকেই লেখা? তা ছাড়া আমরা এত হীন হতে যাবই বা কেন? তারপরেই বতু মেয়েটাকে গালাগাল দিতে লাগল, সে বড়োলোকের মেয়ে বলে। আমি কিন্তু বতুর মতো করে বুঝি না। মেয়েটাকে চিনতে পারলে আমি গিয়ে তাকে সাধ্যসাধনা করতাম, দরকার হলে পায়ে ধরতাম। সম্মানের চেয়েও যে ছেলেটা আমার বেশি। হয়তো বিজ্ঞাপন মেয়েটা দেখত না, হয়তো দেখলেও বুঝত না, তবু চেষ্টা করলে দোষ কী ছিল? তা না করে বতু গেল সমাজের ব্যবস্থা পালটাতে। দূর থেকে যে এত ভালোবাসা যায় আর পাগল হওয়া যায় তা বতু বোঝেই না। আমি কিন্তু একটু—একটু বুঝি। বতু—মতুর বাবা এখন তো বহুদূরের লোক, তার শরীর নেই, ডাকলেও তার সাড়া পাওয়া যাবে না। তবু আমার এই বুকটাতে ওই লোকটার জন্য ভালোবাসা টলটলে হয়ে আছে। যদি ভগবানকে দেখতে চাই তবে হয়তো বলব— 'তুমি ওই চেহারা ধরে এসো।' কী জানি হয়তো মতুর ভালোবাসা সেরকম নয়। আমি তো তাকে পেয়েছিলাম কোনোদিন, মতু তো পায়ইনি। কিংবা হয়তো মতুও সেই মেয়েটিকে তার নিজের মতো করে মনে মনে পেয়েছে। ঠিক জানি না। আমার ভাবনা—চিন্তায় অনেক গণ্ডগোল। মতুর মনের ভিতরটা তো আমরা কেউ দেখতে পাই না।

একটা নীল কাগজ কুড়িয়ে টেবিলে রাখতে গিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। ছানিকাটা চোখ, মোটা চশমা, তাই ভালো পড়া গেল না। মনে হল যেন লেখা আছে যে, পৃথিবীতে কেউই ঠিকঠাক বেঁচে নেই, পুরোপুরি মরেও যায়নি কেউ। সুন্দর কথাটা। মতুর মাথায় চিরকালই সুন্দর সুন্দর কথা আসে। মনে মনে বললাম— 'ঠিকই লিখেছিল মতু। পৃথিবীতে কেউই ঠিকঠাক বেঁচে নেই, আবার পুরোপুরি কেউই মরে যায়নি। তোর অনেক জ্ঞান, তুই বড়ো ভালো বুঝিস।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখি মতু তাকিয়ে আছে। ঠিক যেমন ছেলে মায়ের দিকে তাকায়। মনে হল এক্ষুনি 'মা' বলে ডাকবে, বলবে, 'খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইলাম ওর একটু কথা শোনার চেষ্টায়। ও চোখ ফিরিয়ে নিল।

সেই মেয়েটার ওপর মাঝে মাঝে বড়ো রাগ হয় আমারও। কেন রে পোড়ারমুখী, কোন কপালে আমার ছেলের চোখে তুই পড়েছিলি? হ্যাঁ, ঠিক ওইরকম গ্রামের ভাষায় মেয়েটার সঙ্গে আমি মনে মনে ঝগড়া করি। আবার ভাবি, আমার মতু যাকে অত ভালোবেসেছিল তাকে আমি কী করে ওরকম ঘেন্না করব। তাই আবার মনে মনে বলি, 'তোমাকে চিনি না, তবু বলি, মা, সুখে থাকো।'

মতীন

কেউ ঠিকঠাক বেঁচে নেই। পুরোপুরি মরেও যায়নি কেউ। ওরকম কিছু কি হয় কোনোদিন? ঠিকঠাক বেঁচে থাকা, কিংবা পুরোপুরি মরে যাওয়া?

তবু দ্যাখো মাঝে মাঝেই মানুষেরা মরে যায়। হঠাৎ সময় চলে আসে। অসময়ে কেউ বুঝতেই পারে না। সখেদে বলে— বহু কাজ বাকি রয়ে গেল। বাস্তবিক মানুষের, পিঁপড়ের, পাখিদেরও বহু কাজ বাকি থেকে যায়। ঠিক সময়ে সময়ে হয় না।

আবার একটু পুরোনো হলে সকলেই নতুন জীবন চায়, নতুন শরীর কিংবা চায় দুঃখ—দূর, কিংবা চায় তাকে, যাকে এবার পাওয়া হল না।

তাই নির্বাসনে কেউ যায় না, কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে। কেউ একজন করপুটে ধরে নেয়। আবার ফিরিয়ে দেয় খেলার ভিতরে।

ফিরে এলে আবার সেই অবিরল মাটি কাটার শব্দ। ধুপ ধুপ ধুপ। দিনরাত। খুব দূরে নয়। মাঝে মাঝে অন্য সব শব্দের সঙ্গে মিশে যায়। তবু শোনা যায়, ঠিকমতো কান পাতলে। যেন গভীর মাটির নীচে নেমে যাচ্ছে একজন মাটি—মজুর। পরিশ্রমী সে। সারাক্ষণ তৈরি করছে বিচিত্র সুড়ঙ্গ, সুঁড়িপথ। হয়তো তুচ্ছ কাজ, অকাজের। তবু তার মনোযোগ! সে ফিরেও দেখে না কতখানি কাটা হল, হিসেবও করে না আর কতখানি বাকি। সারাদিন রাত অবিশ্রান্ত তার কাজ চলতে থাকে। শব্দ উঠে আসে, গর্ত গভীরের দিকে নেমে যায়।

মনে হয় ওটা বুকের শব্দ! কিন্তু তা নয়।

কিংবা হয়তো ওটা বুকের শব্দই! আমারই ভুল হয় কেবল।

কোনো কাজ নেই। তাই মাঝে মাঝে মিঠিপুর ঘুরে আসি। তুচ্ছ শহর। জানালার তাকের ওপর এক দুই দানা চিনি ফেলে দিই। শূন্য শহরের লুকোনো জায়গা থেকে অমনি উঠে আসে পরিশ্রমী পিঁপড়ের সারি। মিঠিপুরে সচ্ছলতা দেখা দেয়। ওরা কি জানে পরিশ্রমই সচ্ছলতা? কিংবা মনে করে সচ্ছলতা ঈশ্বরের দয়া?

হামাগুড়ি দিয়ে আমি জেলেদের গ্রামে চলে আসি। আমার টেবিলের তলায় ঘন ছায়ায় নিবিড় সেই গ্রাম। জাল ছড়িয়ে অপেক্ষা করছে তিনজন জেলে। শান্ত, ধৈর্যশীল, আশাবাদী তিন মাকড়সা। কখনো মুড়ির টুকরো ছুড়ে মারলে জালে একটু আটকে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা নড়ে ওঠে। শান্ত ধৈর্যশীল তিনজন আশাবাদী মাকড়সার কাজে জ্ঞানলাভের জন্য বসে থাকি।

খনিশ্রমিকের মতো আঁকাবাঁকা পথ কাটছে উঁইপোকা আমার বইয়ের তাকে। তাক থেকে বইয়ের ভিতরে। আমার বইগুলো ঝুরঝুরে হয়ে এল। তবু আমি বাধা দিই না। তাদের ক্লান্তিহীন কাজ দেখি। দ্যাখো, কেমন তৈরি করছে গভীর জালিপথ, নকশা ছাড়াই মিলিয়ে দিচ্ছে এ ধারের সঙ্গে ওধারের সুড়ঙ্গ। যশোলাভ নেই, বাহবার ধারও ধারে না।

দেখে যাই। আশ্চর্য এইসব শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে খনির কাছাকাছি। সুন্দর ভ্রমণ। লোভ বেড়ে যায়। দেখতে ইচ্ছে করে আর কত গ্রাম, গঞ্জ, পাহাড় ও প্রান্তর পড়ে আছে এইখানে, রয়েছে নিস্তব্ধ জীবাণুদের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র, ধুলোর কণার মধ্যে নিহিত রয়েছে পরমাণুর দিক—প্রদক্ষিণ। দ্যাখো আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কত কম। সব আছে চারধারে, দেখা যায় না।

দুঃশীল রত্নাকর বসে আছে গাছতলায়। পথিকের অপেক্ষায়। এ পথে এখন আর কোনো পথিক আসে না। সম্ভবত ঈশ্বর তাদের নিরাপদ ঘুরপথ চিনিয়ে দিয়েছেন। তবু অপেক্ষায় বেলা যায়। জীর্ণ হয়ে আসে ঘরদুয়ার, বয়স বেড়ে যায়, ক্ষুধা বাড়ে। রত্নাকর বসে থাকে গাছতলায় পথিকের অপেক্ষায়। বহুকাল কেটে যায়। অভ্যাসবশত রত্নাকর বসে আছে, পাশে রাখা বশংবদ খাড়া, হঠাৎ দূরে শোনা গেল পথিকের গান, সর্বাংস্তত্রবানুরঞ্জয়ানি...।' অমনি শরীরে রক্ত ছলকে ওঠে। রত্নাকর খড়্গ তুলে নেয় শূন্যে, দৌড়ে যায়। তারপরই ঢলে পড়ে, ভয়ংকর ভারী খড়্গ তাকে টেনে রাখে। ঝাপসা চোখে রত্নাকর চেয়ে দেখে অদূরে পথিক। তরুণ, ঐশ্বর্যবান। রত্নাকর কেঁদে ওঠে। পথিক সামনে এসে দাঁড়ায়, 'কী চাও রত্নাকর?' রত্নাকর হাতজোড় করে বলে, 'আমার পরিবার উপোস করে আছে, দয়াময়, দয়া করো। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।'

মাঝে মাঝে তাকে ডাক দিই, 'রত্নাকর, ওহে রত্নাকর।' বুড়ো ভিখিরিটা জানালার কাছে চলে আসে। আমি তাকে একটা দুটো পয়সা দিই। জিজ্ঞেস করি, 'কখনো কী ডাকাত ছিলে?' সে মাথা নাড়ে। হাসে। চলে যায়।

প্রায়ই তাকে দেখি বসে আছে গাছতলায়। পথিকের অপেক্ষায়। একমাত্র সঙ্গী তার কর্মফল।

কোনো মানে নেই। তবু দেখি ভাঙা, ছেঁড়া, অবান্তর দৃশ্য ভেসে যায়। কিছুতেই মেলানো যায় না।

কখনো দেখি একটা বল গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের ওপর। খেলুড়ির দেখা নেই। তবু বল গড়িয়ে যাচ্ছে। একা, সাদা, রৌদ্রের ভিতরে।

কখনো দেখি প্রকাণ্ড ভাঙা একটা মসজিদবাড়ি। আগাছায় ভরা, পরিত্যক্ত, দেউলিয়া। তবু পড়ন্ত বেলায় তার উঠোনে কে একজন নীরবে নমাজ পড়ছে।

দেখি আল্লা বুড়ো দরজি। আমার বুকের ভিতরে হঠাৎ জেগে উঠছে ধানভানার তোলপাড় শব্দ। ফসলের মতো উঠে আসছে ভালোবাসা। তাই তার ছুঁচের মুখে সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে বারবার। আল্লা বুড়ো দরজি অন্যমনে চেয়ে আছে। কিছুই মেলানো যায় না। কিছুতেই মেলানো যায় না। তবু চেয়ে দেখি আমার ছেলেবেলায় হারানো বল তার কোলের কাছে পড়ে আছে।

একদিন সুসময়ে তিনি সব ফিরিয়ে দেবেন।

চায়ে চিনি কম হয়েছিল, খুব কম। হয়তো দেওয়াই হয়নি। কদাচিৎ কখনো টের পাই চায়ে চিনি কম কিংবা বেশি। আজ পেলাম। তার মানে আজ আমি স্বাভাবিক আছি। অন্য অনেক দিনের চেয়ে ভালো।

আমি ভালো আছি। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। তুমি কেমন আছ?

মনে হয় তুমি একরকমের ভালো আছ। আমি আর—একরকমের। তবু হয়তো চেনা মানুষেরা একে অন্যকে ডেকে যতীনের দুঃখের কথা বলে, 'দেখ হে, এতদিনে সুখেই মতীনদের দিন কেটে যাচ্ছিল। সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু তারপর একদিন মতীনের চোখে পড়ে গেল সুন্দর একটি মেয়ে...।' এইভাবেই মতীনের দুঃখের কথা ছড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো তোমার কানেও যাবে একদিন। চিন্তা কোরো না। আমি ভালো আছি। ভালো থাকা এক—একরকমের।

চায়ে চিনি কম হয়েছিল। কেন? কোথাও কি কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে খুব! দূরে কোথাও যুদ্ধ বাধলে আমাদের চায়ে মাঝে মাঝে চিনি কম হয়ে যায়। মনে হয় কী যেন একটা টানাপোড়েন চলছে চারপাশে। হয়তো এটা এ—বাড়িতে, হয়তো সেটা বাইরের জগতে কোথাও। সংসারে কি খুব অভাব চলছে! কে জানে। বাইরে কোথাও কি হচ্ছে কোনো গণ্ডগোল? কে জানে! আমি শুধু জানি, আজ চায়ে, চিনি কম হয়েছিল।

সকালের দিকে কে একজন ঘরে এসেছিল। আমার মুখের ঢাকা সরিয়ে তাকাল। চোখে চোখ। মনে হল তার চোখে বড়ো আক্রোশ। হয়তো মারবে। কিন্তু মারল না। আবার আমার মুখ ঢেকে দিল। যখন চলে যাচ্ছে লোকটা, তখন পিছন থেকে দেখে চিনতে পারলাম না। বতু। আমার ভাই ব্রতীন। ঘরে পোড়া সিগারেটের গন্ধ। বতু কি সিগারেট খায়? আগে তো খেত না। কেমন যেন দেখলাম ওর মুখ চোখ! ইচ্ছে হল ডেকে জিজ্ঞেস করি, 'তোর কিছু হয়নি তো বতু? ভালো আছিস তো?' কিন্তু কেমন লজ্জা করল।

একটু পরেই ঘরে এল মা। চিনতে পারলাম। দেখলাম মা মেঝে থেকে আমার সিগারেটের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে; চিঠির একটা কাগজ পড়ার চেষ্টা করল ভ্রূ কুঁচকে। কী যেন বিড়বিড় করল একটু। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, 'চোখে আজকাল কেমন দেখছ মা?'

মায়েরা হয়তো কিছু টের পায়। দরজায় দাঁড়িয়ে মা ফিরে তাকাল। যেন তক্ষুনি বলবে, 'মতু, তুই কি কিছু বলবি?' লজ্জা করল। চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

জানলার রোদ এসে লেগে আছে। জানালার কাছে এসে দাঁড়াই। খুবই স্বাভাবিক দেখি চারপাশ। রাস্তার তেমাথায় বকুল গাছ, চৌধুরীদের বাগানের ঘেরা পাঁচিলের ইট বেরিয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে একটা চৌখুপি জমি— বাড়ি উঠবে বলে ইট সাজানো হয়েছে, পাল্লাখোলা লরি থেকে বালি খালাস করছে কয়েকজন কুলি,

ইলেকট্রিকের তারে লটকে আছে পুরোনো ছেঁড়া সাদা একটি ঘুড়ি। চিন্তিত মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। উঁচুতে নীল ছাদের মতো আকাশ, কয়েকটা কাক চিল উড়ছে।

খুবই স্বাভাবিক আছে চারপাশ। তবে কেমন চায়ে চিনি কম হয়েছিল। দূরে কিংবা আছে কোথাও কি যুদ্ধ হচ্ছে খুব? সংসারে কি খুব অভাব চলছে? অতি তুচ্ছ ঘটনা। চায়ে চিনি কম। মাঝে মাঝেই তো এরকম ঘটে। ভুল হতে পারে। তবু দ্যাখো, সারাদিন বিস্বাদ চায়ের স্বাদ মুখে লেগে আছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি থেমে আছি। বড়ো বেশি থেমে। মৃত্যু এরকমই হয়। নিস্তব্ধতার মতো। অথচ দ্যাখো সারাদিন আমার চারদিকে চলছে কাজ। পরিশ্রমী পিঁপড়েদের, ধৈর্যশীল মাকড়সার, উইপোকার। সারা পৃথিবীময় জঘন্য জীবাণুরাও ঘুরছে কাজের সন্ধানে, কিংবা আশ্রয়ের। আমিই থেমে আছি কেবল। ইচ্ছে করে জাল ফেলে বসে থাকি, গর্ত খুঁড়ি, কিংবা চাষ করে ফসল নিয়ে আসি ঘরে। এরকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন আমার ভিত নড়ে যায়। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠি। প্রশ্ন করি, 'আমি এরকম হয়ে আছি কেন? কেন আর সব জীবন্ত প্রাণীর মতো আমারও নেই সুখ দুঃখ? আমি কি মরে গেছি? কিংবা, আমার জন্মই হয়নি? আমি কি সব পাওয়া পেয়ে গেছি? কিংবা কিছুই পাইনি।' আস্তে আস্তে কারণমুখী হতে চেষ্টা করি। অমনি জীবন বড়ো জটিল বলে বোধ হয়। আমি সারা ঘরময় বেড়াই, দেওয়ালে হাত চেপে ধরি, ঢকঢক করে মাথা ঠুকি। বেরিয়ে পড়ব বলে দরজার কাছে চলে যাই। তখনই মনে পড়ে— আমি অস্ত্রহীন। যথেষ্ট পোশাক নেই গায়ে। অবহেলা সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি নেই। যাওয়া হয় না। ফিরে আসি ঘরের ভিতরে। স্বপ্নের ভিতরে।

পাশের ঘরে কারা কথা বলছে! বিকেলে ঘুম থেকে উঠে শুনি খুব গণ্ডগোল। চিৎকার। আস্তে আস্তে উঠি, ঘরের মধ্যে বেড়াই। চিৎকার খুব বেড়ে যায়। বিরক্তি বোধ হয়। মাঝখানের দরজা বন্ধ। সেই বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে বলি— 'চুপ করো'। কেউ চুপ করে না। মাঝে মাঝেই ওই ঘরে কারা যেন আসে। গোপনে কথা বলে। হয়তো পরস্পরকে ভালোবাসার কথা। কিন্তু আজ বড়ো গণ্ডগোল। আমি আবার চিৎকার করে বলি— 'চুপ করো।' কেউ চুপ করে না; হতাশ লাগে বড়ো। শুনতে পাই মোটা ভাঙা বিশ্রী গলায় কে যেন চিৎকার করে বলছে— 'আমারও পাগল ভাই, বিধবা মা আছে, আমি স্বার্থত্যাগ করছি না?' কথাটা শুনে লোকটার জন্য আমার সামান্য দুঃখ হয়। আহা রে, লোকটা! পাগল ভাই আর বিধবা মা নিয়ে দুঃখে আছে বড়ো। ইচ্ছে করে ওকে এই ঘরে ডেকে আনি, একটি দুটি সান্ত্বনার কথা বলি। বলা হয় না। ওরা ভয়ংকরভাবে চিৎকার করে ওঠে। ইমপস্টার। সোয়াইন। তোমার জন্যই আমরা ডুবে যাচ্ছি।...বাঁচার জন্য...সংগ্রামের জন্য...। তুমি আমাদের খুন করছ, খুন...।...স্বার্থত্যাগ করতে শেখো...।

আমি ঘরের মাঝখানে যাই, কোণে চলে যাই, কিন্তু গণ্ডগোল সমানভাবে কানে আসতে থাকে। জানালার কাছে যাই, বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরিয়ে নিই। গণ্ডগোল, বড়ো বেশি গণ্ডগোল। হঠাৎ মনে পড়ে সকালে চায়ে চিনি কম হয়েছিল। বিকেলে চা দেওয়াই হয়নি। ইচ্ছে করে পাশের ঘরে গিয়ে ওদের ধমক দিয়ে বলি— 'আমি জানতে চাই আমাকে কেন চা দেওয়া হয়নি? কেন আমার চায়ে চিনি কম হবে?'

বোধ হয় অনেক দিন বৃষ্টি হয়নি। আখের চারাগাছগুলি অসময়ে মরে গেছে। আমাদের দেশে তাই চিনি তৈরি হল না এবার। আমি মনে মনে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে থাকি। বিস্বাদ চায়ের স্বাদ মুখে লেগে থাকে।

টের পাই মাথার চুলের ভিতরে বিলি কেটে দিচ্ছে একখানা হাত। বুঝি, মা। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, 'আমার চায়ে চিনি দাওনি কেন মা? কোথাও যুদ্ধ বেধেছে খুব? চিনি আজকাল পাওয়া যায় না!' কিন্তু সে প্রশ্ন করা হয় না। টের পাই পাশের ঘর থেকে দুড়দাড় লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। গালাগালি শুনতে পাচ্ছি। দাঁত ঘষার শব্দ। কোনো উত্তেজনা বোধ করি না। কেবল মাকে বলতে ইচ্ছে করে, 'চিন্তা কোরো না মা। দূরের যুদ্ধ থেকে গেলে আবার সব ঠিকমতো পাওয়া যাবে। আগের মতোই।' কিন্তু সে কথাও বলা হয় না। শুনি মা বিড়বিড় করে বলছে, 'তুই কেন এমন হয়ে রইলি মতু! তুই থাকলে সব ঠিক হয়ে

যেত।' অমনি আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যাই। চারপাশেই বড়ো গণ্ডগোল চলেছে। দুঃসময়। তাই বসে থাকি। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকি। চাল—ধোয়া হাতের গন্ধ পাই। অন্ধকারে ঘরে বসে টের পাই চারদিকে যোজন জুড়ে অনাবৃষ্টির নিষ্ফলা মাঠ পড়ে আছে। আখের চারাগুলি মরে গেল। দুঃসময়।

ভয় করে। চায়ে চিনি কম। পাশের ঘরে গণ্ডগোল। কোথাও যাওয়ার নেই। যেতে ইচ্ছে করে অথচ যথেষ্ট পোশাক নেই গায়ে। অবহেলা সহ্য করার মতো শক্তি নেই। অস্ত্রহীন যাওয়া যায় না তাই বসে থাকি। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকি।

পাশের ঘরে গণ্ডগোল থেমে গেল। লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। সবাই। নিস্তব্ধতা। শুনতে পাই মা কাঁদছে। অস্থির লাগে বড়ো। আমার মাথার ওপর একখানা হাত কাঁপে। বড়ো শান্ত ও সুন্দর বিশ্রামের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে শহর মিঠিপুর, জেলেদের গ্রাম, কিংবা সেই আশ্চর্য খনিগুলির বসতি। শান্ত ও সুন্দর বিশ্রামের রাত্রি আমার চারপাশে। তার মধ্যে মা—র কান্নার শব্দ হয়। খুব শব্দ হয়। বলে, 'বতুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল? কী করবে ওকে? বতু কেন গেল?' আমি চুপ করে থাকি। নিস্তব্ধতার মধ্যে মা কাঁদতে থাকে। বুঝতে পারি না। দূরে বোধ হয় খুব যুদ্ধ চলছে। আর অনাবৃষ্টি। দুঃসময়। অস্থির লাগে। সিগারেট ফেলে দিয়ে আবার ধরাই। কিছুই মেলাতে পারি না। শুধু দেখি হিংসাশূন্য স্থবির ও অক্ষম রত্নাকর বসে আছে গাছতলায়, পথিকের অপেক্ষায়। আবার দেখি পশ্চিমের প্রকাণ্ড খোলা বারান্দায় একটি শিশু একা একা হাঁটতে শিখছে। বতু না? হ্যাঁ, বতুই। আমার ছেলেবেলায় হারানো বল কোলে করে বসে আছে আল্লা বুড়ো দরজি, দেখতে পাই দুপুরের ঘুমে শুয়ে আছে মা, এলো চুলের ওপর প্রকাণ্ড খোলা মহাভারত উপুড় করে রাখা। শুনতে পাই কাছেই কোথাও যেন দিন রাত চলছে এক মাটি—মজুরের গর্ত খোঁড়ার কাজ। দেখি কুয়াশার মধ্যে তুমি দূরে চলে যাচ্ছ। মনে পড়ে চায়ে চিনি কম হয়েছিল। দূরে কোথাও খুব যুদ্ধ চলছে। আর অনাবৃষ্টি। কিছুই মেলাতে পারি না। বতুর নাম ধরে কাঁদছে না। ইচ্ছে করে বলি— 'ঈশ্বর প্রতিটি রাস্তাকেই নিরাপদ রাখছেন। কোনো ভয় নেই।' পরমুহূর্তেই বোধ করি, এই কথার পিছনে আমার বিশ্বাস বড়ো কম। মা কাঁদে। মেলাতে পারি না। কিছুতেই মেলাতে পারি না।

চোখে জল চলে আসে। আমি আস্তে আস্তে তোমার জন্য কাঁদতে থাকি।

হাওয়া বন্দুক

দিন যায়। থাকে কথা।

মণিকার দিন যায়। কিন্তু কীভাবে যায় কেউ কি তা জানে? তার সুখের ধারণাও খুব বড়ো নয় দুঃখের ধারণাও নয় বড়ো। ছোটো সুখ, ছোটো দুঃখে দিন তার কেটে যেত। বুকের মধ্যে প্রজাপতির মতো উড়ন্ত একটুখানি সুখ, বা ছোট্ট কাঁটার মতো একটু দুঃখ— এ তো থাকবেই। নইলে বেঁচে যে আছে তা বুঝবে কেমন করে মণিকা! কিন্তু সুখ—দুঃখের সেই ছোটো ধারণা ভেঙে, দুয়ার খুলে বিশাল পুরুষের মতো অচেনা দুঃখ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন লুটেরার মতো দাবি করে সর্বস্ব, তখন সেই দুঃখ আকাশ বা সমুদ্রের মতো ভুবন—ব্যাপ্ত বিশালতার ধারণা নিয়ে আসে। মণিকার দুর্বল মাথায় তা যেন ধরে না।

গড়ের মাঠে শীতের মেলায় তারা হেঁটেছিল দুজনে। তখন টুকুন ছিল না। সঞ্জয়ের সঙ্গে তখনও তার বিয়ে হয়নি। চুরি—করা দুর্লভ বিকেলে তারা ওইরকম বেরোতে পারত। সঞ্জয় অফিস থেকে বেরিয়ে আসত, মণিকা পালাত কলেজ থেকে। একদিন তেমনি তারা গিয়েছিল শীতের মেলায়। মেলায় ছিল রঙিন আলো, সজ্জিত মানুষের ভিড়— নাগরদোলা, লক্ষ্যভেদের দোকান। ছিল ধুলো, শীতের বাতাস আর ছিল রোমহর্ষ। বিষণ্ণতা কোথাও ছিল না।

লক্ষ্যভেদের দোকানে চক্রাকারে সাজানো বেলুন, ঝুলন্ত খেলনা, বল, দোকানি ডাকছে—

—প্রতি শট পাঁচ পয়সা, আসুন, হাতের টিপ দেখে নিন।

সঞ্জয় দাঁড়ায়।

—মণিকা, হাতের টিপ দেখি?

মণিকা— কী হবে ছাই! হাতের টিপ দেখে!

—দেখিই না, যদি অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করতে পারি।

—তাহলে কী হবে?

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে কী যেন পেয়েছিল!

—দ্রৌপদী।

—আমিও পাব মণিকাকে।

—পেয়ে তো গেছই। সবাই জানে আমাদের বিয়ে হবে।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, মণিকা তোমাকে বড়ো সহজে পেয়ে গেছি আমি। ঠিক। ডুয়েল লড়তে হয়নি, যুদ্ধ করতে হয়নি, মা—বাবা বাধা দেয়নি। কিন্তু এত সহজে কিছু কি পাওয়া ভালো? মণিকা ভ্রূ

কুঁচকে বলে, ভালো নয়, তবে তুমি কি চাও তোমার—আমার মধ্যে বাধাবিঘ্ন আসুক?

—না—না, তা নয়।

—তবে কি তুমি আমাকে মোটেই চাও না আমি সহজলভ্যা বলে?

—তাও নয়। তোমাকে চাই। কিছু এত সহজে নয়। সহজে কিছু পেলে মনে হয় পাওয়াটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। জয়ের আনন্দই আলাদা।

মণিকা হাসল। বলল— তবে বরং আমি কিছুদিনের জন্য অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে যাই! কিংবা চলে যাই দু—বছরের জন্য দিল্লির মাসির বাড়িতে, বি এ পরীক্ষাটা নাহয় ওখানেই দেব। নইলে চলো, ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি। তুমি অনেক ঝামেলা—টামেলা করে আমাকে ফের বাঁচিয়ে তোলো। তাতে বেশ দুর্লভ হয়ে উঠি আমি।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলে— না, না, অতটা করার কিছু নেই। বরং ওই টারগেটের দোকানে চলো। একটা বেলুন দেখিয়ে দাও। আমি ফাটাব।

—ফাটালে কী হবে?

—তোমাকে জয় করা হবে।

—না পারলে?

—জয় করা হবে না।

—তাহলে আমাদের বিয়েও হবে না?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল— না।

—বাবা, তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সবকিছু সহজে পেতে ভালোবাসি।

সঞ্জয় তার হাতখানা ধরল। বলল— মণিকা।

—উঁ।

—ওই যে মাঝখানের হলুদ রঙের বেলুনটা, ওটাকে ফাটাব। তিন চান্সে।

—যদি না পারো?

—না পারলে—

কথা শেষ করে না সঞ্জয়?

—না পারলে?

—বিয়ে হবে না।

মণিকা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, শোনো।

—কী?

—তুমি ইয়ার্কি করছ?

—না।

—সিরিয়াস।

—ভীষণ!

মণিকা শ্বাস ছেড়ে বলে,— তুমি ভীষণ জেদি। পুরুষমানুষের জেদ থাকা ভালো, কিন্তু যার ওপর আমাদের মরণ—বাঁচন তা নিয়ে তোমার খেলা কেন?

সঞ্জয় কাতর স্বরে বলে,— মণিকা, আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন থেকেই তোমার—আমার ভাব। পাশাপাশি বাড়িতে বড়ো হয়েছি। বড়ো হতে—হতেই জেনে গেছি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কত সহজ ব্যাপারটা বলো তো! কোনো রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই; প্রতিযোগিতা নেই। এ কেমন পাওয়া। আজকের দিনটাই একটু ক্ষণের জন্য এসো একটু দুর্লভ হই। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তা খেলা করুক আমাদের সম্পর্কের মধ্যে।

মণিকার বড়ো অভিমান হয়েছিল মনে মনে। সে কি বাজিকরের দোকানের জিনিসের মতো হয়ে গেছে? সে কি লটারির পুরস্কার? তাদের এতদিনকার সম্পর্ক একটা হলুদ বেলুনের আয়ুর ওপর নির্ভর করবে অবশেষে? ছোট্ট একটু দুঃখ কাঁটার মতো ফুটল বুকে। ছোট্ট কাঁটা, কিন্তু তার মুখে বড়ো বিষ, বড়ো জ্বালা। মণিকার চোখভরে জলও কি আসেনি? এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে সে সেই জলটুকু মুছে ছিল গোপনে। বলল— শোনো, আমি লটারির প্রাইজ নই। আমি তোমাকে পেতে চেয়েছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তোমাকে যে ভালোবাসি সে আমার পুজো। আমি কেন নিজেকে অত হালকা হতে দেব? তুমি চলো, ওই দোকানে যেয়ো না। ও খেলা ভালো নয়।

কিন্তু সঞ্জয় বড়ো জেদি, ওই জেদই তাকে পুরুষ করেছে! ও জেদই মণিকাকে মুগ্ধ করেছে কত বার। সঞ্জয় মাথা নাড়াল। মুখে হাসি নিয়ে বলল— শোনো মণিকা, বেলুনটা আমি ঠিক ফাটাব।

—এসব নিয়ে খেলা কোরো না। চলে এসো।

—না, প্লিজ, তিনটে চান্স দাও।

মণিকা একটা শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে করে বলল, কিন্তু মনে রেখো, যদি না পারো এ—বিয়ে হবে না।

—আমিও তো তাই বলছি!

মণিকার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। গলা ধরে যায় আবেগে। সঞ্জয়ের কাছে তার অস্তিত্ব কী এতই পলকা। যদি ও না পারে তবে সে ওর কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে! এই সামান্য খেলায় সারা জীবনের এতবড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে তারা? মণিকা ইচ্ছে করলে সঞ্জয়কে টেনে আনতে পারত জোর করে, কিংবা কেঁদে—কেটে বায়না করে নিবৃত্ত করতে পারত, যেমন সে অন্য সময় করে। কিন্তু ওই সর্বনাশা মুহূর্তে হঠাৎ এক অহংকার—অভিমান—জেদ চেপে ধরল মণিকাকেও। তার জলভরা চোখ থেকে বিদ্যুৎ বর্ষিত হল। কান্নাটা চেপে রেখে সে বলল— বেশ।

দোকানি বন্দুক ভরে এগিয়ে দিল। সঞ্জয় বন্দুক তুলে একবার মণিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল— মাঝখানের ওই হলুদ বেলুনটা। বুঝলে লক্ষ করো।

—করছি। গম্ভীরভাবে বলে মণিকা।

সঞ্জয় কাঁধ পর্যন্ত বন্দুক তোলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ স্থির করতে থাকে। মণিকার একবার ইচ্ছে হয়, বন্দুকটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। সে তৃষিত চোখে চেয়ে দেখছিল, সঞ্জয়ের দীর্ঘকায়, সুন্দর দেহটি। ধারালো মুখ। অবিন্যস্ত চুল নেমে এসেছে কপালে। ওই পুরুষ, আবাল্য পরিচিত মানুষটি একটু ভুলের জন্য চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে জীবন থেকে! এ কী ছেলেমানুষি!

ট্রিগার টিপল সঞ্জয়। শব্দটা ছড়াক করে মণিকার বুকে এসে ধাক্কা মারল। নড়িয়ে দিল তার দুর্বল হৃৎপিণ্ড। দেওয়াল ঘড়ির দোলকের মতো বুকে দুলতে থাকে। সঞ্জয় পারেনি। হ্যাঁ এবং না— এর ভিতরে, আলো আর অন্ধকারের ভিতরে, সুখ ও দুঃখের ভিতরে টিক—টিক—টিক—টিক করে যাওয়া—আসা করে তার বুকের দেওয়াল ঘড়ির পেন্ডুলাম। সে শুধু ফিসফিস করে বলে— আর মাত্র দুটো চান্স। দেখো, সাবধান।

সঞ্জয়ের মুখের হাসি মুছে গেছে। ভ্রূ কোঁচকানো। সে আবার বন্দুক নেয় দোকানির কাছ থেকে। তোলে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ স্থির করে। কিন্তু মণিকা লক্ষ করে, ওর হাত কাঁপছে! বড়ো মায়া হয় মণিকার। সে বুঝল, এবারেও সঞ্জয় পারবে না, দু—চোখ ভরে আবার জল এল তার। ভাঙা কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন অদ্ভুত দেখায় চারধারকে, তেমনি চোখের জলের ভিতর দিয়ে সে দেখতে পেল, রঙিন আলোর সুন্দর মেলাটি যেন ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রতিবিম্বই বলে দিচ্ছে, এ—পৃথিবীর সুখ ভঙ্গুর, জীবন কত অনিশ্চিত।

সঞ্জয়ের হাওয়া—বন্দুকের শব্দ এবারও কাঁপিয়ে দিল মণিকাকে। সেইসঙ্গে যেন কেঁপে উঠল পৃথিবী, ভেঙে পড়ার আগে আর্তনাদ করে উঠল সমস্ত ভুবন। দ্রুত দোল খেতে লাগল বুকের দোলকটি, যেন বা

খসে পড়ার আগে সে তার শেষ দোলায় দুলছে। এবারও লাগেনি।

সঞ্জয়ের মুখে রক্ত এসে জমা হয়েছে। ফেটে পড়ছে ভয়ংকর মুখখানা। দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে উত্তেজনায়। তার ঠোঁট সাদা। দোকানি আবার বন্দুক ভরে এগিয়ে দেয়। নির্লিপ্ত গলায় বলে— এবার মারুন। ঠিক লাগবে।

—লাগবে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

দোকানদার তো ভেতরের কথা কিছু জানে না। সে তাই ভালো মানুষের মতো বলে— আসলে মনটা স্থির করাই হচ্ছে সত্যিকারের টিপ। চোখ আর হাত তো মনের গোলাম। মনটাকে স্থির করুন, ঠিক লাগবে।

সঞ্জয় বন্দুকটা শেষবারের মতো হাতে নিল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে চাপা গলায় ডাকল, মণিকা।

—উঁ!

—যদি না লাগে, তবে?

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো জানোই।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলে— জানি, ঠিক। তাই একটা কথা বলেনি যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক কবে থেকে শেষ হবে।

মণিকা ধীর গলায় বলল, আজ। এখন থেকে।

—আমরা একসঙ্গে ফিরব না?

—না।

—তুমি একা ফিরবে?

—হুঁ।

—আজ থেকে অন্য মানুষ হয়ে যাবে? আমার মণিকা আর থাকবে না তুমি?

—তুমিই তো ঠিক করেছ সেটা।

সঞ্জয় ম্লান একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল— মণিকা, এবারও যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে যাবে। তবু তোমাকে বলিনি, আমি তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালোবাসতাম। আর কখনো কাউকে এত ভালোবাসতে পারব না।

মণিকা রুমাল তুলে দাঁতে কামড়ে ধরল, তবু কি পারে দমকা কান্নাটাকে আটকাতে। কোনোক্রমে কেবল অসহায় একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শোনো।

—কী?

—শেষ চান্সটা থাক। মেরো না।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—আমিও।

—তবে ওটা থাক। সারাজীবনের জন্য বাকি থাক।

—হেরে যাব মণিকা? পালাব?

—তাতে কী? কেউ তো জানবে না।

সঞ্জয় দ্বিধায় পড়ল কি? বন্দুক রাখল, একটা সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কোঁচকালো, চোয়ালের পেশি দ্রুত ওঠানামা করল। সিগারেটটা গম্ভীরভাবে টানল সে। ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মণিকার অস্পষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, কেউ জানবে না? কিন্তু তুমি তো জানবে?

—কী জানব?

—আমি যে পালালাম।

—আমি ভুলে যাব।

সঞ্জয় মৃদু হাসে। মাথা নাড়ে। —তা হয় না। আমাকে বুকের মধ্যে নিয়েও তুমি মনে মনে ঠিকই জানবে যে এ—লোকটা কাপুরুষ। এ—লোকটা শেষবার বন্দুক চালাতে ভয় পেয়েছিল। মণিকার চোখের জল গড়িয়ে নামল। দোকানদার অবাক হয়ে দেখছিল তাকে। সামান্য বেলুন—ফাটানো টারগেটের খেলায় কান্নাকাটির কী আছে তা তো তার জানা ছিল না। রঙিন আলোর মেলায় আনন্দিত মানুষজন কেউই জানত না, মেলার মাঝখানে কী এক সর্বনাশা ঘটনা কত নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে! সঞ্জয় ধীরে বন্দুকটা তুলে নেয়। মণিকা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাওয়া বন্দুকটা ধীরে ধীরে কাঁধের কাছে তুলে নিচ্ছিল সঞ্জয়। দিন যায়, কথা থাকে। দোকানদার বলেছিল — হাত আর চোখ হচ্ছে মনের গোলাম। মন স্থির থাকলে লক্ষ্যভেদ হয়।

মণিকা ভাবে— তবে কি মনই স্থির ছিল না সঞ্জয়ের? মণিকার প্রতি তবে কি স্থির ছিল না সঞ্জয়ের মন। তাহলে কেন বন্দুকের খেলায় ওই হেলাফেলা উদাসীনতা? মণিকা দাঁতে রুমাল ছিঁড়ে ফেলল টানে। দু—হাত প্রাণপণে মুঠো করে তার চারধারে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের পৃথিবীকে দেখে নিল। নিষ্ঠুর, এবার চালাও ওই খেলনা—বন্দুক। ভেঙে পড়ুক মণিকার জগৎ—সংসার। সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে আজ একা ঘরে ফিরে যাবে মণিকা।

চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুন। ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটা। ফাটবে, না কি ফাটবে না? সঞ্জয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করে। নলের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকে বেলুনটার দিকে। পৃথিবী সুতোয় দুলছে। ছিঁড়বে। এক্ষুনি ছিঁড়বে।

হাওয়া—বন্দুকের শব্দ শেষবারের মতো বেজে উঠল। সঞ্জয়ের স্খলিত হাত থেকে বন্দুকটা খসে যায়। মণিকা শিউরে ওঠে। ফিরে তাকায়।

চক্রের মাঝখানে হলুদ বেলুনটা নেই। ফেটে গেছে। নরম রবার ঝুলে আছে ন্যাকড়ার মতো। দোকানদার বলল, বাঃ, এই তো পেরেছেন!

তারা দু—জনে কেউই বিশ্বাস করেনি প্রথমে যে বেলুনটা সত্যিই ফেটেছে। বুঝতে সময় লাগে।

বিহ্বল গলায় সঞ্জয় ডাকে— মণিকা।

—উঁ!

—লেগেছে।

—যাঃ।

—সত্যিই। দ্যাখো।

মণিকা কাঁদে। তারপর চোখের জল মুছে হাসে। মেলাটা কেমন রঙিন আলোয় ভরা। সজ্জিত মানুষেরা কেমন হেঁটে যাচ্ছে চারদিক। অবিরল ঘুরে যাচ্ছে নাগরদোলা। বেলুনটা ফেটেছে— সেই আনন্দ সংবাদ নিয়ে শীতের বাতাস চলে যায় দিগবিদিকে। চারধারকে ডেকে যেন সেই বাতাস বলতে থাকে— আনন্দিত হও, সুন্দর হও, সব ঠিক আছে।

তবু দিন যায়। কথা থাকে। বিয়ের পর চার বছর কেটে গেছে। তারা দু—জন এখন তিনজন হয়েছে। টুকুন তিন বছরে পা দিল। সেই মেলায় পা দিল। সেই মেলায় হাওয়া—বন্দুকের খেলা তাদের কি মনে পড়ে? পড়ে হয়তো, কিন্তু কেউ মুখে বলে না। সঞ্জয় সিগারেট খেত খুব। মণিকা কোনোদিন আটকাতে পারেনি। রাতবিরেতে উঠে কাশত। মণিকা ঘুম ভেঙে উঠে উদবেগের গলায় বলত— ইস। কী কাশি হয়েছে তোমার। মাগো!

সঞ্জয় কাশতে কাশতে বলে— স্মোকারস কাফ। ও কিছু নয়, বলেই আবার সিগারেট ধরাত।

—আবার সিগারেট ধরালে?

—সিগারেটের ধোঁয়া না লাগলে এ—কাশি কমবে না। সিগারেট থেকেই এই কাশি হয়। সিগারেট খেলেই আবার কমে যায়।

—বিছানায় বসে খাচ্ছ, ঠিক একদিন মশারিতে আগুন লাগবে।

সঞ্জয় উদাস স্বরে বলে— লাগুক না।

—লাগুক না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। শিগগির সিগারেট নেভাও।

সঞ্জয় হাসতে থাকে, সিগারেট সরিয়ে নিয়ে বলে— আগুন লাগলে কী হবে মণিকা! সংসারটা পুড়ে যাবে। এই তো? পৃথিবীতে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাক না পুড়ে।

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে— তুমি বড়ো পাষাণ, বুঝলে! বড়ো পাষাণ!

সঞ্জয় উত্তর দেয়— তুমি তো জানোই।

মুখে যাই বলুক মণিকা, মনে মনে জানে, একটুও নিষ্ঠুর নয় সঞ্জয়, একটু পাষাণ নয়। বরং বেশি মায়ায় ভরা সঞ্জয়ের মন। তবু তারা সুখীই ছিল। সংসারে নানা সুখ—দুঃখ ছায়া ফেলে যায়। ছোটো ছোটো দুঃখ। সে সুখ—দুঃখ কোনো সংসারে নেই। সঞ্জয় মোটামুটি ভালো একটা চাকরি করে। তিন বছরের টুকুন সকাল আটটায় তার নার্সারি স্কুলে যায়। সারাদিন সংসারের গোছগাছ নিয়ে থাকে মণিকা। সে জানে তার স্বামী সঞ্জয় একটু উদাসীন তা হোক, তবু স্ত্রৈণ পুরুষের চেয়ে অনেক ভালো।

সংসারের হাজার কাজের মধ্যে যখন অবসর পায় মণিকা, তখন দক্ষিণের জানালার ধারে আলোয় এসে বসে। টুকুনের জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে। বাপের বাড়িতে চিঠি লিখে, রেডিয়ো বাজিয়ে কখনো বা নিজেই গান গায় গুনগুন করে। সেইসব অন্যমনস্কতার সময়ে কখনো কখনো হঠাৎ মনে পড়ে দৃশ্যটা। চারধারে সেই রঙিন ভয়ংকর খেলাটা বেশ জেগে ওঠে। দূরাগত চিৎকার শুনতে পায়, এক দোকানদার ডেকে বলছে প্রতি শট পাঁচ পয়সা, আসুন হাতের টিপ দেখুন।

আর তখন, মণিকা যেন সত্যিই দেখতে পায়, সামনে চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুনের ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটি। সঞ্জয় হাওয়া—বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে মুমূর্ষু পৃথিবী ভেঙে পড়ার আগে কেঁপে উঠছে, মণিকার বুকে দেওয়াল ঘড়ির দোলক ধাক্কা দেয়, পড়তে থাকে।

রাতে আজকাল সঞ্জয় বড়ো বেশি কাশে। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে তার। মণিকা ওঠে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে— জল খাও তো!

—দাও।

—কাল তুমি ডাক্তারের কাছে যেয়ো।

—দুর—দুর! ডাক্তাররা একটা—না—একটা রোগ বের করেই, রোগ না থাকলেও। এ—কাশি কিছু না। সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে।

—খেয়ো না, পায়ে পড়ি।

—আঃ, দাও না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কমবে না।

—রোজ তোমার এক কথা। তুমি আগে ডাক্তার দেখাও তো!

—ডাক্তাররা কিছু জানে না।

—তুমি খুব জানো।

—আমি ঠিক জানি। বরং একটা ওষুধ কিনে আনব।

মণিকা বিছানায় বসে সঞ্জয়ের চওড়া রোমশ বুকের ওপর হাত রাখে স্নেহে, এই পুরুষটিকে সে খুব চিনে গেছে। ভারি একগুঁয়ে, জেদি। তবু ভেতরে ভেতরে মেয়েদের মতোই নরম।

বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মণিকা বলে— নিজের ওপর তোমার একটুও নজর নেই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ওপরে আছ। এ তো ভালো নয়, বুঝলে? কাল থেকে সকালে আর দু—কাপ চা দেব না, দ্বিতীয় বারে, চায়ের বদলে দুধ দেব।

—ধুস।

ওসব বললে চলবে না। খেতে হবে, আর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে। সারাটা দিন তো বাসাতেই থাকো না। ঠিক যেন পেয়িং গেস্ট।

—সারাক্ষণ ঘরে থাকা যায়?

—তাহলে আমি কী করে থাকি?

—মেয়েরা পারে, সংসারে তাদের জান পোঁতা হয়ে থাকে।

—তাই নাকি! আর, তোমার জান কোথায় পোঁতা আছে শুনি। নতুন করে কারও প্রেমে পড়োনি তো?

সঞ্জয় হাসে, ইচ্ছে তো করে একটা হারেম বানিয়ে ফেলি কিন্তু এ—বয়সে কে আর ফিরে তাকাবে বলো।

ফিরে তাকাবার লোকের অভাব নেই। সেদিন মনুর বিয়েতে ওর যে একদল কলেজের বন্ধু এসেছিল তাদের মধ্যে একজন শ্যামলা মতো মেয়ে হাঁ করে তোমাকে খুব দেখছিল।

—যাঃ! তোমার যত বানানো কথা।

—সত্যি বলছি, মাইরি।

—আমার গা ছুঁয়ে বলছ তো।

—ও বাবা! বলে মণিকা হাত টেনে নেয়।

—কী হল! হাতটা সরিয়ে নিলে কেন?

—তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম যে।

সঞ্জয় হাসে, গা ছুঁয়ে বলতে সাহস হচ্ছে না, তার মানে মিথ্যে কথা বলছ।

—না গো, সত্যিই মেয়েটা দেখছিল।

—তবে গা ছুঁয়ে বলো।

—না—না। তোমাকে ছুঁয়ে আমি কখনো দিব্যি গালি না।

সঞ্জয় বলল— তাহলে বলি, তুমি যে বড়ো দর্জির দোকানে ব্লাউজ বানাতে দাও, সেখানকার সুন্দর মতো সেলসম্যানটি তোমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে—

—যাঃ, বলবে না, নোংরা কথা। বলে মণিকা।

আর সেদিন পাড়ার ছেলেরা যে চাঁদা চাইতে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন কেন তোমার কাছে জল খেয়ে গেল জানো?

—এই, এই, এমন মারব না; কেবল বানাচ্ছে, চুপ করো। এসব শুনলেও পাপ।

তারা দু—জনেই খুব হাসতে থাকে। কারণ তারা জানে ওসব কথা সত্যি নয়, কিংবা হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ভালোবাসা গভীর, গভীর।

সকালে টুকুন দুলে দুলে পড়ছে— ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্রি ব্যাগস ফুল।

মণিকা রান্নাঘরে ঝিকে বকছে— রোজ তোমার আসতে বেলা হয়ে যায়। এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে, ঝাঁটপাট হয়নি, সাতটা বেজে গেল, টুকুনের স্কুলের বাস আসবে এক্ষুনি, কখন কী হবে বলো তো?

ঝি উত্তর দেয়, কী করব বউদি, বড়ো বাড়িতে বেশি মাইনে দেয়, তারা সহজে ছাড়তে চায় না। কেবল এটা করে যাও, ওটা করে যাও। তোমার বাড়ি সেরে আবার এক্ষুনি ও—বাড়ি দৌড়তে হবে।

—বেশি মাইনে যখন, তখন ও—বাড়ির কাজই ধরে রাখো, আমারটা ছেড়ে দাও। আমি অন্য লোক দেখে নিই, পইপই করে বলি আমার ছেলের সকালে ইস্কুল, কর্তারও অফিস ন—টায় একটু তাড়াতাড়ি এসো। তুমি কেবল বড়োলোকের বাড়ির বেশি মাইনের কাজ দেখাও। .

[বাথরুম থেকে ক্রমান্বয়ে কাশির শব্দ আসে]

টুকুন একনাগাড়ে ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ পড়ে যাচ্ছে। মণিকা ডাক দিয়ে বলে, টুকুন কেবল ওই কবিতাটা পড়লেই হবে। একটু অঙ্ক বইটা দেখে নাও। কাল অঙ্কে ব্যাড পেয়েছ।

মণিকা— বাথরুম থেকে ক্ষীণ গলায় সঞ্জয় ডাকে।
মণিকা উত্তর দেয়, কী বলছ?
—একটু শুনে যাও।
—দাঁড়াও, আমার হাত জোড়া, ডালে সম্বর দিচ্ছি।
—এসো না।
—উঃ, আমি যেতে পারব না। টুকুনের টিফিন বাক্স গোছানো হয়নি, জলের বোতলে জল ভরা হয়নি। এক্ষুনি বাস এসে পড়বে।
সঞ্জয় চুপ করে থাকে, তারপর আবার শোনা যায়, তার কাশির শব্দ। দম বন্ধকরা সেই কাশি; তারপরই ওয়াক তুলে বমি করার শব্দ হয়।
—ওমা! কী হল! বলে মণিকা উঠে বাথরুমের বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দেয়— এই কী হয়েছে? এই— ভিতর থেকে উত্তর আসে না, কেবল বেসিনে জল পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে থাকে।
দরজায় ধাক্কা দেয় মণিকা। এই, দরজাটা খোলো না। কী হয়েছে তোমার? বমি করছ কেন?
সঞ্জয় উত্তর দেয় না।
মণিকা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেয়— এই, কী হয়েছে? ওগো, দরজাটা খোলো না।
মণিকা চিৎকার করে ডাকে সুধা, এই সুধা—
সুধা দৌড়ে আসে— কী হল গো বউদি?
—দ্যাখো, তোমার দাদাবাবু দরজা খুলছে না। কী জানি কী হল, অজ্ঞান—টজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?
শরীর খারাপ ছিল?
—হ্যাঁ, তুমি শিগগির বাড়িওয়ালাকে খবর দাও।
কিন্তু খবর দেওয়ার দরকার হয় না। ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়, দরজা খুলে দেয় সঞ্জয়। তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বিমূঢ় হয়ে যায়। অতবড়ো মানুষটাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে। ঠোঁট সাদা, মুখে রক্তাভা, চোখের দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে। একটা হাত বাড়িয়ে সঞ্জয় বলে— ধরো আমাকে।
মণিকা দু—হাতে জড়িয়ে ধরে তার মানুষটাকে। কী মস্ত শরীর, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক স্বামীটি তার কী হল, কী হতে পারে মানুষটার?
—কী হয়েছে তোমার ওগো?
—কী জানি, কাশি এল খুব, কাশতে কাশতে বমি হয়ে গেল। আমাকে একটু শুইয়ে দাও।
...বাইরে বাসের হর্ন বাজে। টুকুন দৌড়ে আসে। মা, বাস এসে গেছে। টিফিন বাক্স আর জলের বোতল দাও।
—দিচ্ছি, দিচ্ছি বাবা।
টুকুন বাবাকে জিজ্ঞেস করে— কী হয়েছে বাবা?
—কিছু না।
—শুয়ে আছ কেন? আজ তোমার ছুটি?
সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে— ছুটি! না ছুটি নয়। তবে বোধহয় এবার ছুটি হয়ে যাবে।
—কেন বাবা?
—মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয়ে যায় বিনা কারণে। বলে সঞ্জয় হাসে। বলে, তোমাকে খ্যাপালাম। কিছু হয়নি। তুমি ইস্কুলে যাও।
—যাই বাবা, টাটা।
—টাটা!
বাইরে বাসের শব্দ হয়।

মণিকা গম্ভীরস্বরে ঘরে আসে। হাতে দুধের কাপ। চামচে দিয়ে ভাসন্ত পিঁপড়ে তুলছে। কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে— দুধটা খেয়ে নাও।

—খেতে ইচ্ছে করছে না। এখনও বমির ভাবটা আছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।

—আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, সিগারেটের প্যাকেটটা দাও।

—না, আর সিগারেট নয়।

—দাও না, মুখটা টক—টক লাগছে। সিগারেট খেলে বমির ভাবটা কমবে।

মণিকা বলল, না, এত বাড়াবাড়ি আমি করতে দেব না।

ওঃ, বলে সঞ্জয় হতাশভাবে চেয়ে থাকে।

—শোনো, তুমি টুকুনকে কী বলছিলে?

—কী বলব?

—কিছু বলনি? আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি।

সঞ্জয় একটু হাসে— কী শুনেছ?

—ওইটুকু ছেলেকে ওইসব কথা বলতে তোমার মায়া হল না?

—ওকি বুঝেছে নাকি?

—না—ই বা বুঝল? তুমি বললে কেন? ছুটি মানে কি তা কী আমি বুঝি না?

—কি মানে বলো তো?

—বলব না। তুমিও জানো, আমিও জানি।

—মণিকা সিগারেট দাও।

—না।

—তাহলে আবার কাশি শুরু হবে।

—হোক, সিগারেট কিছুতেই দেব না। আগে বলো কেন বলেছিলে ওই কথা।

—এমনিই।

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একটা দৃশ্য মনে পড়ে। মেলার দোকানে মণিকাকে বাজি রেখে হাওয়া—বন্দুক লক্ষ্যভেদের খেলা খেলছে সঞ্জয়। জীবনে মণিকা কোনোদিনই ঘটনাটা ভুলতে পারবে কি? পারবে না। মনে কেবলই সংশয় খোঁচা দেয়। যাকে ভালোবাসে মানুষ তাকে কী করে একমুহূর্তের খেয়ালখুশিতে হারজিতের খেলায় নামিয়ে আনতে পারে? তবে কি সঞ্জয় কোনোদিনই তেমন করে ভালোবাসেনি তাকে? সেইজন্যই কি এই সাজানো সুন্দর সুখের সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার বড়ো সাধ হয়েছে তার? ও টুকুনকে কেন বলল মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয় বিনা কারণে। ওই ছুটির জন্য বড়ো সাধ সঞ্জয়ের?

মণিকা বিছানার একধারে বসল। স্বামীর মাথাটা টেনে নিল বুকের ধার ঘেঁষে। চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল, অমন কথা বলতে নেই, কখন স্বস্তির মুখে কথা পড়ে যায়। আর কখনো বোলো না।

—আচ্ছা।

—আমাকে ছুঁয়ে বলো, বলবে না।

সঞ্জয় হাসল, বলল, সিগারেট দাও না মণিকা।

—না।

বাইরে বাড়িওয়ালার ছেলের ডাক শোনা যায়— বউদি।

মণিকা বলে— বোধহয় পল্টু ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল।

মণিকা বলল— আসছি পল্টু। মণিকা গিয়ে দরজা খোলে। ডাক্তারবাবু ঘরে আসেন।

—কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন।

সঞ্জয়ের কাশির দমকাটা আবার আসে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে— কিছু না। স্মোকারস কাফ।

—দেখি, আপনি ভালো করে শুন তো।

ডাক্তার সঞ্জয়কে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। মণিকাকে একটা টর্চ আনতে বলেন, টর্চ দিয়ে গলাটা দেখেন ভালো করে। গলার বাইরের দিকে কয়েকটা জায়গা একটু ফুলে আছে। সেগুলো হাত দিয়ে টিপেটিপে দেখে জিজ্ঞেস করেন— এগুলো কতদিন হল হয়েছে?

—কী জানি! সঞ্জয় উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবুর মুখটা ক্রমে গম্ভীর হয়ে আসে। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে ওঠেন। মণিকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে আসে।

—ডাক্তারবাবু।

—বলুন।

—কীরকম দেখলেন?

—তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। ওষুধগুলো দিন। দেখা যাক।

হঠাৎ এক অনিশ্চয়তা, এক ভয় চেপে ধরে মণিকার বুক। ভগবান, ডাক্তার কেন বুঝতে পারছে না?

কয়েকদিন কেটে যায়। ওষুধে তেমন কোনো কাজ হয় না। কাশিটা যেমনকে তেমন থেকে যায় সঞ্জয়ের। কিছু খেতে পারে না, ওয়াক তুলে বমি করে ফেলে। শরীরটা জীর্ণ দেখায়। মস্ত চুল ভরতি মাথাটা বালিশে ফেলে রেখে পায়ের দিকের জানালাটা দিয়ে উদাসভাবে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কেবল চেয়ে থাকে।

মণিকা ডাকে— শুনছ?

—উঁ।

—একটু হাঁটাচলা করো। শুয়ে থাকো বলেই তোমার খিদে পায় না।

—একটা সিগারেট দেবে মণিকা?

—না।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ!

মণিকার চোখে জল আসে, বলে— কোনোদিন তো বারণ করিনি জোর করে। অসুখ হল কেন বলো। ভালো হও তারপর খেয়ো।

—যদি ভালো না হই?

—ফের ওই কথা? তুমি বলেছিলে না যে আর বলবে না।

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে, চুপ করে থাকে। ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যায়। একদিন চিন্তিতমুখে ডাক্তার মণিকাকে আড়ালে ডেকে বলে— গলার ঘা—টা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। বরং ডাক্তার বসুকে একবার দেখান।

—আপনার কী মনে হয়।

—কিছু বলা মুশকিল। দীর্ঘস্থায়ী কোনো ঘা দেখলে অন্যরকম একটা সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হয়তো তেমন কিছুই নয়। তবু দেখালে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে মণিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তারের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে তার দেরি হয় না। ডাক্তাররা সহজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে না, সুতরাং—

সুতরাং মণিকা বুঝতে পারে, এতকাল ছোটো সুখ, ছোটো দুঃখের সঙ্গেই ছিল তার ভাব—ভালোবাসা। এখন হঠাৎ সদর দুয়ার গেছে যে খুলে, অচেনা, বিশাল পুরুষের মতো এক বড়ো দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। লুবিয়ার মতো, মণিকার ছোটো মাথা তা বইতে পারে না। এ যে আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ যেন সমুদ্রের মতো সীমাহীন, এ দুঃখ দাবি করে সর্বস্ব। সমগ্র ভুবন কেড়ে নেয়।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে টুকুন। ভাত খেয়ে আলাদা বিছানায় ঘুমুচ্ছে। বড়ো ঘাম হয় ছেলেটার। একটা মাত্র পাতলা জামা গায়ে, তবু জলধারায় ভেসে যাচ্ছে গলা বুক। কপালে মুক্তবিন্দু, মণিকা নীচু হয়ে টুকুনের মুখ দেখে। সবাই বলে ওর শরীরের গঠন আর চোখ দু—খানা সঞ্জয়ের মতো। নিবিড় পিপাসায় দেখে মুখখানি, মণিকা ফিসফিস করে ডাকে।

—টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওঠ টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওরে টুকুন বেলা গেল। ওঠ।

টুকুনের উত্তর নেই। নিঃসাড়ে ঘুমোয় সে। নিশ্চিন্তে।

টুকুন ওঠ রে, আয় দু—জনে মিলে একটু কাঁদি। ডাক্তার বাসুর চেম্বারে ফোন করল মণিকা, পোস্ট অফিসে গিয়ে।

—ডক্টর বাসুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—উনি দিল্লিতে আছেন।

—কবে ফিরবেন?

—কনফারেন্সে গেছেন। কাল কী পরশু ফেরার কথা।

—আমার যে ভীষণ দরকার।

—কী দরকার বলুন।

—দয়া করে বলবেন, ডাক্তারবাবু কীসের স্পেশালিস্ট।

ও—পাশে লোকটা বোধহয় একটু হাসল, বলল : ক্যানসার।

—আমি কাল আবার ফোন করব। কোন সময়ে আসার কথা?

—সকালের ফ্লাইটে। তবে কিছু বলা যায় না, হয়তো আটকেও যেতে পারেন।

মণিকা সন্তর্পণে ফোনটি রেখে দেয়। বাসায় ফিরে দেখে সঞ্জয় শুয়ে আছে। উত্তর শিয়রে মাথা, পায়ের কাছে দক্ষিণের জানালা। শেষবেলার একটু রাঙা আলো এসে পড়ে আছে পাশে। সঞ্জয় চেয়ে আছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে। অবিরল চেয়ে থাকে আজকাল। কথা বড়ো একটা বলে না। টুকুনকে আদর করে না, মণিকাকেও না।

শেষ চান্স—এ হলুদ বেলুনটা না ফাটলে কোথায় থাকত মণিকা আর কোথায়ই বা সঞ্জয়। মণিকা সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। পিপাসায় তার ঠোঁট নড়ে, তার দু—চোখ জলে ভেসে যায়। অচেনা পুরুষের মতো বড়ো দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ার খুলে। হাতে তার হাওয়া বন্দুক, হলুদ বেলুনের মতো ঝুলে আছে। মণিকার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবে, ভেঙে যাবে বুক।

মণিকা শব্দ করে কেঁদে উঠে। অবাক হয়ে সঞ্জয় চোখ ঘোরায়।

—কী হয়েছে?

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

সঞ্জয় বুঝতে পেরে মাথা নাড়ে, শ্বাস ফেলে বলে— কেঁদো না, আমাকে বরং এখন থেকে একটা করে সিগারেট দিয়ো রোজ।

মণিকা হঠাৎ মুখ তুলে বলে— সিগারেট আর সিগারেট। সংসারে সিগারেট ছাড়া তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই?

না— মাথা নাড়ল সঞ্জয়।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

মণিকা কাঁদে, সঞ্জয় চুপ করে দক্ষিণের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে, টুকুন পাশের ঘরে ঘুমোয়।

অনেক কষ্টে ডাক্তার বাসুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারে মণিকা। সঞ্জয়কে নিয়ে একদিন হাজির হয় ছায়াচ্ছন্ন চেম্বারটায়। বাসু প্রবীণ ডাক্তার, বিচক্ষণ অভিজ্ঞ দুটি চোখ তুলে বললেন— কী হয়েছে? দেখি! বলে সঞ্জয়কে চেয়ারে বসালেন। আলো জ্বালালেন কয়েকটা, ঝুঁকে ওর মুখ দেখতে লাগলেন, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, হাওয়া—বন্দুক তুলেছে এক পাষাণ, দেওয়াল ঘড়ি পেন্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে, বুকের ভিতরটা এক হলুদ বেলুন দাঁতে চিবিয়ে আজও রুমাল ছিঁড়ল মণিকা।

ডাক্তার বাসু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন— কিছু হয়নি।

—মানে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

—যা সন্দেহ করে এসেছেন আমার কাছে, তা নয়। আজকাল সকলেরই এক ক্যানসারের বাতিক, স্মোক করেন?

—করতাম।

—টনসিলটা পাকা। ফ্যারিঞ্জাইটিস আছে, সব মিলিয়ে একটা আলসার তৈরি হয়েছে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি। সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন।

সেরেও গেল সঞ্জয়।

একদিন বলল, শোনো মণিকা।

—কী?

মনে আছে একবার মেলায় তোমাকে বাজি রেখে হাওয়া—বন্দুকের খেলা খেলেছিলাম?

—মনে আছে।

—সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করো।

মণিকা হাসে— তুমি কী ভাবো, শেষ চান্সে বেলুনটা না ফাটালে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম?

—যেতে না?

—পাগল।

—কী করতে?

—আমি বন্দুকটা নিয়ে বেলুনটা ফাটাতাম। না পারলে সেফটিপিন ফুটিয়ে আসতাম বেলুনটায়!

—তুমি ডাকাত, বলে সঞ্জয় হাসে।

অলক্ষ্যে হাওয়া—বন্দুক নামিয়ে পরাজিত এক অচেনা পুরুষ ফিরে যায়। তার লক্ষ্যভেদ হল না। বিদীর্ণ হয়নি মণিকার হৃদয়। সব ঠিক আছে। কোনোদিন আবার সেই বন্দুকবাজ ফিরে আসবে। লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবে বারবার, একদিন লক্ষ্যভেদ করবেও সে। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই রঙিন মেলায় আনন্দিত বাতাস বহে যাক এই কথা বলে— ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ। মাথার নীচে হাত, হাতের নীচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভালো নেই ক—দিন। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভালো লাগছিল না। কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়ে ছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন, কখনো স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বউ অঞ্জলিকে। খুব ভিড়ের একটা ডবল—ডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি। অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা—জড়ানো আঁতুড়ের বাচ্চচা। নীচের মানুষরা অঞ্জলিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে, পিছনের মানুষরা নামবার জন্য অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে, চারিদিকের লোকেরা অঞ্জলিকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো—কাঁদো, কোলের বাচ্চচাটা ট্যাঁট্যাঁ করে কাঁদছে, কোনো দিকেই যেতে পারছে না সে। নামতেও না, উঠতেও না, বাচ্চচাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি করে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাপ করছে। চারিদিকে রাগি, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেঁচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চচাসুদ্ধু অঞ্জলি জাহান্নামে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভিড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুলভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোকই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল— আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে—এ। নামো, শিগগির নামো, বাস ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে ফিসফিসের মতো শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কন্ডাক্টর ডবল ঘণ্টি বাজিয়ে দিচ্ছে... অঞ্জলির কী যে হবে!

দুঃস্বপ্ন। চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুরন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বউ নয়। মাসছয়েক আগে মন্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপসের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে। অঞ্জলি যখন চলে যায় তখন তার পেটে মাসদুয়েকের বাচ্চচা। এতদিনে বোধহয় বাচ্চচা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখেনি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয়নি। কারণ, বাচ্চচাটা তার নয়।

বিয়ের সাতদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মন্দার। তখনই মাসদুয়েকের বাচ্চচা পেটে অঞ্জলির। তা ছাড়া, অঞ্জলির ব্যবহারটাও ছিল খাপছাড়া। কথার উত্তর দিতে চাইত না, ভালোবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিনসাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালোবেসেছিল মন্দার। মেয়েদের সংস্পর্শহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিনসাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোটোবোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। অঞ্জলি অস্বীকার করেনি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটিও কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন— ওঁর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরত দেবে জানতাম। যদি একটি

কথা রাখো, ওর ছোটোবোনের বিয়ে আর দু—মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই ক—টা দিন কথাটা প্রকাশ কোরো না। মামলা তারপর দায়ের কোরো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়ব না।

অঞ্জলি ফেরত গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু—মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি লড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিয়ের পর আট মাস কী ন—মাস কেটে গেছে। মন্দার এখনও কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায়, বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সেদিকে চেয়ে থেকে সে স্বপ্নটা কেন দেখল তা মনে মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে অঞ্জলির কথা সে এখনও ভুলে যায়নি। এসব কি ভোলা যায়?

আজ মঙ্গলবার। আজই তার দুটো ক্লাস। একটা সেকেন্ড পিরিয়ডে নিয়েছে, আর একটা ফিফথ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ সময়টায় কলেজে ক্লাশ বেশি থাকে না। পি.ইউ—তে এখনও ছেলে ভরতি হয়নি, পার্ট টু বেরিয়ে গেছে। সপ্তাহে দু—দিন ছুটি থাকে তার, অন্য দিন একটা দুটো ক্লাস নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে, তার মন ভালো না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এসব ক্ষেত্রে একটু—আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ওই ঘটনার পর কয়েকটা দিন খুবই অস্বাভাবিক বোধ করছিল ঠিকই। বোধ হয় তার সাময়িক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। সময়, সময়ের মতো এমন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ ওই দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফথ পিরিয়ডের ক্লাসটা আজ সে করবে না। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরে একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এতদিনে তার একটা বাচ্চচা হতে পারত। আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত হয়তো বা সেই শিশু শরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিতে।

এতবড়ো জোচ্চুরি যে টেঁকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না? তার বাবাও কি জানত না? তবে তারা খামোখা কেন ওই কাণ্ড করল? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারাজীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে? কীরকম বোকামি এটা? দু—মাসের বাচ্চচা পেটে লুকিয়ে রেখে বিয়ে— ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্মলাভ করেছিল তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভিতরটা হঠাৎ আক্রোশে রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে বাসে অচল আধুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। কিছু করার থাকে না। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পরে কি না কে জানে।

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিটায় বসে ঘাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভিড়ের ভিতর একটা ডবল—ডেকার থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চচাটা তার সারা শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের আভ্যন্তরীণ ময়লায়, ক্বাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে, গাল এবং অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো মানে হয় না। অঞ্জলির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি আর প্রেমিকের ঘর করছে? কে জানে! স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভিড় থেকে, অপমান লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জাগ্রত মন্দার কোনোদিনই সেই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচায়। কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে— কোথায় যাবেন?

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে— সোজা চলুন, বলে দেব।

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার। তার চেনা মানুষের সংখ্যাও কত কম। এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারও কথাই তার মনে পড়ে না যার কাছে যাওয়া যায়। কোনো জায়গাও ভেবে পায় না সে যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনো অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড্ড রসকষহীন। গত কয়েকমাস সেই বই প্রায় ছোঁয়নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘরে ঢোকে না ভয়ে।

ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছেমতো এদিক—ওদিক ঘোরাল সে। তারপর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিতভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই! ঘুরেফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধ হয় ভালোই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গির কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নিঃঝুম। কয়েকটা দামি বিদেশি গাড়ি এধারে—ওধারে পড়ে আছে। মন্দার চমকি রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভালো লাগে না, কেন ভালো লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লাগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। মন জিনিসটা বড়ো ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। গত ছ—মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ? তাকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালোবেসেছিল বলে বিবমিষা? উত্তরটা অঞ্জলির কাছে আর একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবল—ডেকারের পাদানির ভিড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্নে দেখার কোনো মানে না থাক, গত ছ—মাস মন্দার যে সুখী নয় এটা সত্য। ভয়ংকর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়েছে মনে, ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে সে, এবং এইভাবেই একদিন হয়তো বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে সে খুবই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে তুলে আনবে। কিন্তু তবু অসুখীই থেকে যাবে। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলিকে দেখতে ভালো, অন্যদিকে খুবই সাধারণ। বি—এ পড়তে—পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত। রং চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাউনি ছিল। আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাতদিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিজ্ঞেস করেছিল— তুমি প্রেগন্যান্ট?

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল— আমার বাবা এই বিয়ে জোর করে দিয়েছেন, আমি চাইনি—

—তুমি প্রেগন্যান্ট কি না বলো।

—হ্যাঁ।

—মাই গুডনেস।

অঞ্জলি তবু কাঁদেনি, কেবল ভয় পেয়েছিল। কী হবে তা অঞ্জলি বোধহয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বরাবর এই সরে যাওয়াটা বিশ্বাস করে।

ক্লান্ত মন্দার আবার একটি ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়। গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর অন্যমনে বসে ভাঁড়টা শেষ করে। অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা ভারি বিশ্রী হবে। ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে দেয় সে। অঞ্জলিদের বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড়ো দরকার মন্দারের। কী যে দরকার তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না। ক্লাস ছিল না বলে কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে দিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে, তবু দেখ তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে!

—আপনি?

—আমি মন্দার...

—জানি তো!

—একটু দরকারে এলাম, ক—টা কথা বলতে।

—কী কথা?

—আমার প্রথমা স্ত্রীর সম্পর্কে।

—সেও তো জানি।

—ওঃ।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে আমাদের বাসা থেকে কিছু জানানো হয়নি।

—আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো জলুস নেই। রং ফরসা, লম্বাটে মুখ, ছোটো নাক। আলগা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল— কিছু মনে করলে না তো?

নন্দিনী হাসে— এই কথা বলার জন্য আসার কোনো দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

—ট্যাক্সিতে এসেছি।

—অযথা খরচ।

—আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নীচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এতদূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল— আমার এখন অফ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাসটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের — ওটা তো না করলেও চলবে।

—না করলেও চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে— পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।

মন্দারও একটু হাসে। বলে— তাহলে তো তোমার ছুটিই এখন?

মনে করলেই ছুটি।

কোথায় যাবে?

—আমি কী জানি। যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বউ। এত চালু মন্দার ভাবেনি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে, সাধারণ লজ্জাসংকোচ ওর নেই। পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ করেনি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্যরকম হয়েছিল।

একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ পাশে বসে থাকবে, এমন একজন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শকাতরতা খুব প্রখর। যে কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে— বলল— আমার চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ থাক। কোনো দিন আসব।

একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে— আসার তো দরকার ছিল না।

—ছিল। সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝব না কেন?

আমি নিজেই বুঝি না।

বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা চারেক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিকদূর হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণ দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বোজে সে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবল—ডেকারের পা—দানি, ভিড়, টালমাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলিদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল সব দিয়েও পনেরো পয়সা কম হল। ট্যাক্সিওয়ালা হেসে সেটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারি অবাক হলেন।

—বাবাজীবন, তুমি?

—আমিই।

—এসো—এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা বউ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছালো।

—বসবে না? বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

মন্দার বসে। জিজ্ঞেস করে— কী খবর?

—খবর আর কী? কোনোরকম। বুড়ো গলাখাঁকারি দেয়।

—আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়। বলে— সে ভিতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ করে থাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করেন— কী চাও মন্দার? ওকে কিছু বলবে?

—হুঁ।

—যাও না, নিজেই চলে যাও ভিতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ—বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিলেন তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলে— ভিতরে বাঁদিকের ঘরে আছে।

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চচা তুলতুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কি না কে জানে! অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনো প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চচাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিজ্ঞেস করে— কবে হল?

—আজ আট দিন।

—ভালো আছ?

—না। খুব কষ্ট গেছে।

—আমার শরীরে রক্ত ছিল না। বসে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি— খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ওই চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে?

—বলব।

—কী?

—আমি ভীষণ অসুখী।

—হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও?

—কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব।

—করো।

—তোমার প্রেমিকটি কে?

বিস্ময়ে চোখ বড়ো করে অঞ্জলি বলে— প্রেমিক?

—ওই বাচ্চচাটার বাবার কথা বলছি।

—সে আমার প্রেমিক হবে কেন? তাকে তো আমি ভালোবাসতাম না, সেও আমাকে বাসত না।

—তাহলে এটা কী করে হল?

—হয়ে গেল। কত কিছু এমনিই হয়ে যায় যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসেনি? তবে কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?

সে বলল— তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না?

—বিয়ে! ভারি অবাক হয় অঞ্জলি, বলে— তা কি সম্ভব? সে কোথায় চলে গেছে! তা ছাড়া আমি তা করতে যাব কেন? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

এও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন করে— তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?

—না। তুমি অনেক দিয়েছ।

—কী দিয়েছি?

—এই বাচ্চচাটার একটা পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে— ও কি আমার বাচ্চচা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি?

—যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে বলে— থাকুক।

অঞ্জলি খুশি হল। বলল— আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।

আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

—জানি। করাই উচিত।

তবু সঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এসব কথা নয়। এর চেয়ে জরুরি কী একটা বলবার আছে তার। বুঝতে পারছে না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

—তোমার শরীরে রক্ত নেই?

—না। কিছু খেতে পারতুম না গত কয়েকমাস। বাচ্চচাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর দোষ নেই। বাঁচতে তো ওকেও হবে। শরীরটা তাই গেছে।

—তোমার অসুখটা কেমন?

—বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

—তুমি শুয়ে থাকো বরং। শুয়ে শুয়ে কথা বলো।

—তাই কী হয়! বলে বসে বসে অঞ্জলি একটু কাঁদে, বলে শ্বশুরবাড়িতে এসেছ, তোমাকে কেউ আদরযত্ন করার নেই। দ্যাখো তো কী কাণ্ডটা!

মন্দার চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি তক্ষুনি নিজের ভুল সংশোধন করে বলে— অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমারই ভুল।

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা—ফোলা, শরীরও তাই। বোধহয় শরীরে জল এসে গেছে ওর।

মন্দার জিজ্ঞেস করে— তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে?

—ভালো আর কী। আমার শরীর থেকেই তো ওর শরীর। একটা খারাপ হলে আর একটা ভালো হবে কী করে?

কিন্তু কী কথা বলতে এসেছে মন্দার? মনে পড়ছে না, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এসব সাধারণ কথা নয়; এ ছাড়া আর—একটা কী কথা যেন! মন্দার চুপ করে বসে থাকে। ভাবে। অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সেই ভিতু ভাব। বোধহয় সবসময়ে নিজের অপরাধের কথা ভাবে ও, আর সবসময়ে ভয় পায় তার অপরাধের প্রতিফল কোনো—না—কোনো দিক থেকে আসবেই।

মন্দার জিজ্ঞেস করল— এসব জানাজানির পর তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ?

অঞ্জলি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল— তা জেনে কী হবে?

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল মাত্র।

সেই শ্বাসের শব্দে অঞ্জলি তার দিকে তাকাল, জলভরা চোখ। বলল— আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।

—জানি।

—তুমি ভীষণ দয়ালু। তোমার তুলনা নেই। তুমি আমার ওপর রাগ করতে চাইছ, কিন্তু পারছ না।

মন্দার একটু চমকায়। কথাটা সত্য। সে অঞ্জলির ওপর রাগ ঘৃণা সবই প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছুতেই রাগের সেই ঝড়টা ওঠে না। উঠলে ভালো হত বোধহয়। মন্দার আবার একটা শ্বাস ফেলে।

বাইরে থেকে অঞ্জলির বাবার গলা পাওয়া যায়— মন্দার!

মন্দার মুখ ফিরিয়ে ভারি অবাক হয়। সুন্দর বৃদ্ধটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। মন্দারের চোখে চোখ পড়তেই লাজুক মুখে বলে— বাড়িতে কাজের লোক নেই তাই...

মন্দার বিস্মিতভাবে বলে— নিজেই করলেন?

—আমার অভ্যাস আছে। আঁতুড় ঘরে বসে খেতে ঘেন্না করে না তো বাবা! তুমি না হয় বাইরের ঘরে এসো।

—আমি কিছু খাব না।

—খাবে না? বলে বুড়োমানুষ ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সাধাসাধি করতে বোধহয় তারা ভয় পায়। মন্দারকে তাদের ভীষণ ভয়।

যেন বা বুড়ো জানত যে মন্দার এ—বাড়ির খাবার খাবে না, তাই মাথা নীচু করে বলে— আচ্ছা, তাহলে বরং থাক।

অঞ্জলি অবাক হয়ে তার বাবার দিকে চেয়ে ছিল। মন্দারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে— কলেজ থেকে এলে তো?

—হুঁ!

—খিদে পায়নি?

অঞ্জলি চুপ করে থাকে। কিছু বলার নেই। তারা অপরাধীর মতো মন্দারের দিকে চেয়ে আছে। জোর করে খাওয়াবে এমন সম্পর্ক নয়।

অসহ্য। মন্দার উঠে গিয়ে বুড়োর হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিয়ে বলে— ঠিক আছে। খাচ্ছি।

বাপ—বেটিতে খুব অবাক হয়! তারা একটুও আশা করেনি এটা।

বুড়ো চলে গেল। মন্দার অঞ্জলিকে বলে— এসব ফর্মালিটির দরকার ছিল না। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে— ডিভোর্স জিনিসটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনও তুমি জামাই, বরাবর তাই থাকবে। ওঁদের মন থেকে এসব সংস্কার তুলে ফেলা ভারি মুশকিল।

মন্দার উত্তরে দেয় না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে— বাবার আর দোষ কী? আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পারিনি। স্বামী জিনিসটা যে মেয়েদের কাছে কী!

—ওসব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে— থাকবে কেন! এখন তো আর আমার ভয় নেই। এইবেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—কী বলতে চাও?

সংস্কারের কথা। মেয়েলি সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ— এসব কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয় ...অঞ্জলি চুপ করে থাকে। একটু কাঁদে বুঝি!

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে— অঞ্জলি, তোমাকে আমি কী একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুব জরুরি।

—বলো।

—বললাম তো, মনে পড়ছে না।

—একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে খাবারটা খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বুঝবার চেষ্টা করে।

মন্দার একটু—আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়। মনে পড়ে না।

—তুমি কি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাব? অঞ্জলি আচমকা জিজ্ঞেস করে।

—ভাবি।

—কেন ভাবো?

—তুমি আমার ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

—সে তো ঠিকই।

—তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালোবাসার কথা সহজে ভোলে; প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পারে না।

—আমি এত অসহায় যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার! আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

—কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয়নি!

—কী শোধ নেবে বলো!

—কী জানি ভেবেই তো পাচ্ছি না।

—হায় গো, কী কষ্ট!

—খুব কষ্ট। দুপুরে কলেজে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি।

—কীরকম দুঃস্বপ্ন?

—ভীষণ খারাপ। বলে মন্দার চুপ করে স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে মনে দেখে। ডবল—ডেকারে পা—দানিতে অঞ্জলি, কোলে বাচ্চা, চারিদিকে আক্রমণকারী মানুষ। কিছুতেই অঞ্জলির কাছে পৌঁছতে পারছে না মন্দার।

—বলবে না? অঞ্জলি বলে।

মন্দার শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল— অঞ্জলি, আমি হয়তো শ্রাবণে বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। তাতে কি তুমি দুঃখ পাবে?

—পাব। তবে এটা আশা করছিলাম বলে সয়ে নেওয়া যাবে।

—শোনো, আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব, এরকম বসে থাকব একটু দূরে, কথা বলব। কিছু মনে করবে না তো?

—মনে করব! কী যে বলো! তুমি আসবে ভাবতেই কী ভীষণ ভালো লাগছে!

—আসব! কী তোমাকে বলতে চাই তা যতদিন না মনে পড়ছে ততদিন আসতেই হবে।

—এসো। যখন খুশি।

—আসব। অঞ্জলি, ততদিন তুমি ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।

অঞ্জলি চুপ করে থাকে।

—চারিদিকে বিশ্রী মানুষজন, তারা তোমাকে ঠেলবে, ধাক্কাবে, ফেলে দেবে, চারিদিকে বিপদ।

বুদ্ধিরাম

বুদ্ধিরাম শিশিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। লেবেলে ছাপা অক্ষর সবই খুব তেজালো। 'ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ক্রিমিনাশ, অম্ল পিত্ত ও অজীর্ণতা রোগের নিবারণ অবশ্যম্ভাবী। অতিশয় বলকারক টনিক বিশেষ। স্নায়বিক দুর্বলতা, ধাতুদৌর্বল্য ও অনিদ্রা রোগেরও পরম ঔষধ। বড়ো বড়ো ডাক্তার ও কবিরাজেরা ইহার উচ্চচ প্রশংসা করিয়াছেন।...' ছাপা অক্ষরের প্রতি বুদ্ধিরামের খুব দুর্বলতা। ছাপা অক্ষরে যা বেরোয় তার সবটাই তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আদুরি অবশ্য অন্য ধাতের। বুদ্ধিরামের সঙ্গে তার মেলে না। বুদ্ধিরাম যা ভাবে, বুদ্ধিরামের যা ইচ্ছে যায় আদুরির ঠিক তার উলটো হয়। বুদ্ধিরাম যদি নরম সরম মানুষ,তো আদুরি হল রণচণ্ডী। বুদ্ধিরাম যদি নাস্তিক, তো আদুরি হল ঘোর আস্তিক। বুদ্ধিরামকে যদি কালো বলতে হয়, তো আদুরিকে ফরসা হতেই হবে। বিধাতা (যদি কেউ থেকে থাকে) দু—জনকে এমন আলাদা মালমশলা দিয়ে গড়েছেন যে আর কহতব্য নয়।

আর সেজন্যই এ জন্মে দু—জনের আর মিল হল না। বলা ভালো, হতে হতেও হল না। এখন যদি বুদ্ধিরামের বত্রিশ তেত্রিশ তো আদুরির কোনো না সাতাশ আঠাশ চলছে। দু—জনের কথাবার্তা নেই, দেখাশোনাও একরকম কালেভদ্রে, মুখোমুশি যদি বা হয় চোখাচোখি হওয়ার জো নেই। আদুরি আজকাল বুদ্ধিরামের দিকে তাকায়ও না।

কিন্তু বুদ্ধিরাম লোক ভালো। লোকে জানে, সে নিজেও জানে। বুদ্ধিরাম আগাপাশতলা নিজেকে নিরিখ করে দেখেছে। হ্যাঁ, সে লোক খারাপ নয়। মাঝে মাঝে বুদ্ধির দোষে দু—একটা উলটোপালটা করে ফেললেও তাকে খারাপ লোক মোটেই বলা যাবে না।

খারাপই যদি হবে তবে সাত মাইল পথ সাইকেলে ঠেঙিয়ে চকবেড়ের হাটে কখনো আসে মন্মথ সেনশর্মার পিওর আয়ুর্বেদিক টনিক 'হারবল' কিনতে? মাত্র মাস চারেক আগে প্লুরিসিতে ভুগে উঠল বুদ্ধিরাম। এখনও শরীর তেমন জুতের নয়। কাকের মুখে কথাটা শোনা গিয়েছিল, আদুরির নাকি আজকাল খুব অম্বল হয়। তা এরকম কত মেয়েরই হয়। কার তাতে মাথাব্যথা? বুদ্ধিরাম মানুষ ভালো বলেই না খোঁজখবর করতে লাগল।

তেজেনের কাছে শুনল, হারবল খেয়ে তার পিসির অম্বলের ব্যথা সেরে গেছে। কথাটা মানিক মণ্ডলের কাছেও শোনা, হ্যাঁ, হারবল জব্বর ওষুধ বটে, তিন শিশি খেতে—না—খেতে তার বউ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

আর একদিন পরিতোষও কথায় কথায় বলেছিল, হারবল একেবারে অম্বলের যম। তবে পাওয়া শক্ত। মন্মথ কবিরাজ সেই শিবপুরের লোক, আশির ওপর বয়স। বেশি পারেও না তৈরি করতে। কয়েক বোতল করে ছাড়ে। দারুণ চাহিদা। চকবেড়ের হাটে একজন লোক নিয়ে আসে বেচতে।

খবর পেয়েই আজ মঙ্গলবারে স্কুলের শেষ দুটো ক্লাস অন্যের ঘাড়ে গছিয়ে সাইকেল মেরে ছুটে এসেছে এত দূর। অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় আধবুড়ো খিটখিটে চেহারার একটা লোক। ময়লা চাদর পেতে কয়েকটা বিবর্ণ ধুলোটে শিশি সাজিয়ে বসেছিল। ভারি বিরস মুখ।

বুদ্ধিরাম জিজ্ঞেস করল, হারবল আছে?

লোকটা মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলল, আছে। সতেরো টাকা।

সতেরো টাকা শুনে বুদ্ধিরাম একটু বিচলিত হয়েছিল। দু—শিশি কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কুড়িয়ে বাড়িয়েও পকেট থেকে আঠাশ টাকার বেশি বেরলো না।

আচ্ছা, দু—শিশি নিলে কনসেশন হয় না?

লোকটা এমন তুচ্ছ—তাচ্ছিল্যের চোখে তাকাল যেন মরা ইঁদুর দেখছে। মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, পাচ্ছেন যে সেই ঢের। মন্মথ কবরেজের আয়ু ফুরলো বলে। তারপর হারবলও হাওয়া। মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যাবে না।

একটা শিশি কিনে বুদ্ধিরাম বলল, সামনের মঙ্গলবার আবার যদি আসি পাব তো!

বলা যাচ্ছে না।

কথাটা যা—ই হোক সেটা বলার একটা রংঢং আছে তো। লোকটা এমনভাবে 'বলা যাচ্ছে না' বলল যা আঁতে লাগে। মানুষকে তুচ্ছ—তাচ্ছিল্য করাটাই যেন বাহাদুরি। বেচিস তো বাপু কবরেজি ওষুধ, তাও গাছতলায় বসে, অত দেমাক কিসের!

শিশিটা নিয়ে বুদ্ধিরাম হাটে একটু ঘুরে বেড়াল। চকবেড়ের হাট বেশ বড়ো। বেশ গিজগিজে ভিড়ও হয়েছে। চেনা মুখ নজরে পড়বেই। আশপাশের পাঁচ—সাত গাঁয়ের লোকই তো আসে। বুদ্ধিরামের এখন চেনা কোনো লোকের সঙ্গে জুটতে ভালো লাগছে না। মাঝে মাঝে তার একটু একাবোকা থাকতে বড়ো ভালো লাগে।

জিলিপি ভাজার মিঠে মাতলা গন্ধ আসছে। ভজার দোকানের জিলিপি বিখ্যাত। শুধু জিলিপি বেচেই ভজা সাতপুকুরে ত্রিশ বিঘে ধানজমি, পাকা বাড়ি করে ফেলেছে। কিনেছে তিনটে পাঞ্জাবি গাই। ডিজেল পাম্প সেট আর ট্র্যাক্টরও। ছেঁড়া গেঞ্জি আর হেঁটো ধুতি পরে এমন ভাবখানা করে থাকে যেন তার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আজও ভজার সেই বেশ। নারকোলের মালার ফুটো দিয়ে পাকা হাতে খামি ফেলছে ফুটন্ত তেলে। চারটে ছোকরা রসের গামলা থেকে টাটকা জিলিপি শালপাতার ঠোঙায় বেচতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মানুষ মাছির মতো ভনভন করছে দোকানের সামনে।

বুদ্ধিরাম কাণ্ডটা দেখল খানিক দাঁড়িয়ে। ডান হাতে বাঁ হাতে পয়সা আসছে জোর। ক্যাশবাক্সটা বন্ধ করার সময় নেই। আর তার ভিতরে টাকাপয়সা এমন গিজগিজ করছে যে, চোখ কচকচ করে। টাকাপয়সার ভাবনা বুদ্ধিরাম বিশেষ ভাবে না বটে, কিন্তু একসঙ্গে অতগুলো টাকা দেখলে বুকের ভিতরটায় যেন কেমন করে।

বুদ্ধিরাম বেঞ্চে একটু জায়গা খুঁজল। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি লোক। সকলেই জিলিপিতে মজে অছে। এমন খাচ্ছে যেন এই শেষ খাওয়া। ভোমা ভোমা নীল মাছি ওড়াওড়ি করছে বিস্তর। ভিতরবাগে তিনখানা বেঞ্চে একটা থেকে দু—জন উঠে যেতেই বুদ্ধিরাম গিয়ে বসে পড়ল। এখনও আশ্বিনের শেষে তেমন শীতভাব নেই। দুপুরবেলাটায় গরম হয়। উনুনের তাপ আর কাঠের ধোঁয়ায় চালাঘরের ভিতরটা রীতিমতো তেতে আছে। বুদ্ধিরাম বসেই ঘামতে লাগল।

পাশের লোকটা এখনও জিলিপি পায়নি। বৃথা হাঁকডাক করছে, বলি ও ভজাদা,আধঘণ্টা হয়ে গেল হাঁ করে বসে আছি। দেবে তো!

দিচ্ছি বাপু, দিচ্ছি। দশখানা তো হাত নয়।

আর আমাদেরই বুঝি মেলা ফালতু সময় আছে হাতে?

এই কড়াটা হলেই দিচ্ছি গো।

লোকটা ফস করে বুদ্ধিরামের হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে দেখল। তারপর মাতব্বরের মতো বলল, হারবল? মন্মথ কবরেজের ওষুধ! দুর, দুর, কোনো কাজের নয়। তিন শিশি খেয়েছি।

বুদ্ধিরাম তার হাত থেকে বোতলটা ফের নিয়ে বলল, তা বেশ। কাজ হয় না তো হয় না।

লোকটা ভারি কড়া চোখে বুদ্ধিরামকে একটু চেয়ে দেখল। জিলিপি এসে পড়ায় আর কিছু বলতে পারল না। মুখ তো মাত্র একটা, একসঙ্গে দু—কাজ তো করা যায় না। তার ওপর ভজার জিলিপি মুখকে ভারি রসস্থ করে দেয়। কথা বলাই যায় না।

বুদ্ধিরামকে লোকে বলে ভাবের লোক। কথাটা মিথ্যেও নয়। বুদ্ধিরাম বড়ো ভাবতে ভালোবাসে। ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা যে তাকে কাঁহা কাঁহা মুলুক নিয়ে যায়, কত আজগুবি জিনিস দেখায় তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। বুদ্ধিরাম ভজার জিলিপির দোকানে বসে বসে ভাবতে লাগল, এই যে ভজা বাঁ হাতে ডান হাতে হরির লুটের মতো পয়সা কামাচ্ছে এতে হচ্ছেটা কী?

এত জমিজিরেত, ঘরবাড়ি, বিষয়—সম্পত্তি, এসব ছেড়ে একদিন ফুটুস করে চোখ ওলটাতে হবে। তখন ভজার ছেলেরা কেউ জিলিপির প্যাঁচ কষতে আসবে না। ভাগ—বাঁটোয়ারা নিয়ে লাঠালাঠি মারামারি করে ভাগ ভিন্ন হবে। ভজা কি আর তা জানে না। তবু খেয়ে—না—খেয়ে মেলায় মেলায় রোদ জল মাথায় করে গিয়ে চালা বেঁধে কেবল জিলিপি খেলিয়ে যাচ্ছে। টাকার নেশায় পেয়েছে লোকটাকে।

বসে থাকতে থাকতে বুদ্ধিরামের পালা এসে গেল অবশেষে। ঠোঙায় আটখানা রসে মাখামাখি গরম জিলিপি। আহা, এইরকম এক ঠোঙা যদি আদুরির হাতেও গরমাগরম পৌঁছে দেওয়া যেত!

প্রথম জিলিপিটা দাঁতে কাটতে গিয়েই টপ টপ করে অসাবধানে দু—ফোঁটা রস পড়ে গেল টেরিকটনের পাঞ্জাবিতে। বড়ো সাধের পাঞ্জাবি। ঘি রঙের, গলায় আর পুটে চিকনের কাজ করা। বুদ্ধিরাম রুমালে মুছে নিল রসটা। মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। এক্কেবারে নতুন পাঞ্জাবি। কাঁচি ধুতির ওপর ওটা পরে আদুরির বাড়ির সামনে খুব কয়েকটা চক্কর দিয়েছিল সাইকেলে। আদুরি অবশ্য বেরোয়নি। কিন্তু বুদ্ধিরামের ধারণা যে, আদুরি তাকে আড়াল থেকে ঠিকই দেখে।

জিলিপির দাম দিয়ে বুদ্ধিরাম উঠে পড়ল। সামনেই পানের দোকান। সে পান সিগারেট খায় না। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তেড়াবেঁকা আয়নায় নিজেকে একটু দেখে নিল। না, বুদ্ধিরাম দেখতে খারাপ নয়। রংটা যা একটু ময়লা। কিন্তু মুখ—চোখ বেশ কাটা কাটা। নিজেকে দেখে সে একটু খুশিই হল। রুমাল দিয়ে মুখের ঘামটা মুছে নিল।

একটা দোকানে পঞ্চাশ পয়সার কড়ারে সাইকেল জমা রেখেছিল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চারদিকে উধাও মাঠ ঘাট, ধানখেত। আকাশটা কী বিশাল! বাঁশবনের পেছনে সূর্য একটু ঢলে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া।

বুদ্ধিরাম ধানখেতে নেমে পড়ল। চওড়া আল। খানিক দূর গিয়ে রাস্তা।

ধানখেতের ভিতরে নেমে বুদ্ধিরামের মনটা আবার কেমন যেন হয়ে গেল। আদুরি কি ওষুধটা খাবে? এমনিতেই মেয়েরা ওষুধ খেতে চায় না, তার ওপর বুদ্ধিরামের পাঠানো ওষুধ। আদুরি বোধহয় ছোঁবেও না। এত পরিশ্রম বৃথাই যাবে। তা যাক। বুদ্ধিরামের কাজ বুদ্ধিরাম করেই যাবে।

পুজোয় একটা শাড়ি পাঠিয়েছিল বুদ্ধিরাম। বুদ্ধিরামের বোন রসকলি গিয়ে দিয়ে এসেছিল। হাত বাড়িয়ে নেয়ওনি। বিরস মুখে নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, কে পাঠিয়েছে রে?

রসকলি বোকা গোছের মেয়ে। ভয়ে ভয়ে শেখানো কথা বলেছিল, মা পাঠাল।

তোর মা আমাকে শাড়ি পাঠাবে কেন?

তা জানি না। এটা পরে অষ্টমী পুজোয় অঞ্জলি দিয়ো।

শাড়িটা ভালোই। কালু তাঁতির ঘর থেকে কেনা। লাল জমির ওপর ঢাকাই বুটি।

শাড়িটার দিকে তাকায়ওনি আদুরি। শুধু দয়া করে বলেছিল, ওখানে কোথাও রেখে যা। সেই শাড়ি আজ অবধি পড়েনি আদুরি। নজর রেখে দেখেছে বুদ্ধিরাম। খোঁজখবরও নিয়েছে। শাড়িটা পড়েনি। তবে নিয়েছে ফিরিয়ে দেয়নি, এটাই যা লাভ হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তারপর একদিন হঠাৎই নজরে পড়ল, সেই শাড়িটা পরে রসকলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাড়িটা কোথায় পেলি?

ভয়ে ভয়ে রসকলি বলল, আদুরিদিদি দিল।

দিল বলেই নিলি?

তা কী করব?

বুদ্ধিরাম আর কিছু বলেনি। রাগটা গিলে ফেলেছিল। মনটা বড্ড উচাটন ছিল কয়েকদিন অপমানে।

দোষঘাট মানুষের কি হয় না?

তখন বুদ্ধিরাম তো আর এই বুদ্ধিরাম ছিল না। আজকের এক গেঁয়ো স্কুলের মাস্টার বুদ্ধিরামকে দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, ইস্কুলে সে ছিল ফার্স্ট বয়! পাশটাও করেছিল জব্বর, দু—দুটো লেটার নিয়ে। বিয়ের কথাটা তখনই ওঠে। বুদ্ধিরাম যখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেওকেটা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

বুড়ি ঠাকুমা তখন এতটা বুড়ো হয়নি। একদিন আদুরিকে একেবারে কনে—সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসে বলল, দ্যাখ তো ভাই, পছন্দ হয়? হলে দেগে রাখি। পাশ টাশ করে থিতু হলে মালা—বদল করিয়ে দেব।

আদুরি অপছন্দের মেয়ে নয়। ফরসা তো বটেই, মুখচোখ রীতিমতো ভালো।

কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে, নিত্যি দেখাশোনা হয়। যাকে বলে ঘর কা মুরগি তাই বুদ্ধিরাম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, ফুঃ, এর চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো।

কেন রে, মেয়েটা কি খারাপ? দ্যাখ তো কেমন মুখচোখ। কেমন ফরসা।

সাতজন্ম বিয়ে না করে থাকলেও ও মেয়ে আমার চলবে না। যাও তো ঠাকুমা, সং বন্ধ করো।

একেবারে মুখের ওপর থাবড়া মারা যাকে বলে। আদুরির খুব অপমান হয়েছিল। তার তখন বছর বারো বয়স। এক ছুটে পালিয়ে গেল। আর কোনোদিন এল না। খুব নাকি গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছিল মেয়েটা। দিন তিনেক ভালো করে খায়দায়নি।

বুদ্ধিরামের তখন এসব দিকে মাথা দেওয়ার সময় নেই। চোদ্দো মাইল দূরের মহকুমা শহরে কলেজে যেতে হয়। নতুন বন্ধুবান্ধব, নতুন রকমের জীবন। সেখানে কে একটা গেঁয়ো মেয়েকে নিয়ে ভাববার মতো মেজাজটাই তার নেই।

আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। বুদ্ধিরামের সঙ্গে মেলা মেয়েও পড়ত। তাদের একজন ছিল হেনা। দেখতে শুনতে ভালো তো বটেই, তার কথাবার্তা চাউনি টাউনিও ছিল ভারি ভালো। কথাবার্তা বলত টকাস টকাস।

বুদ্ধিরাম ছাত্র ভালো। সুতরাং হেনা তার দিকে একটু ঢলল। বছর দেড়েক হেনার সঙ্গে বেশ মাখামাখি হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তবে সেটাকে ভাব—ভালোবাসা বলা যাবে কিনা তা নিয়ে বুদ্ধিরামের আজও সংশয় আছে।

তবে হেনা আর যা—ই করুক—না—করুক বুদ্ধিরামের লেখাপড়ার বারোটা বাজাল। কলেজের প্রথম ধাপটা ডিঙোতেই দম বেরিয়ে গেল বুদ্ধিরামের। ডিঙোলো খোঁড়া ঘোড়ার মতো। কিন্তু হেনা দিব্যি ভালো পাশটাশ করে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে চলে গেল।

বুদ্ধিরামের পতনের সেই শুরু। বি এসসি পাশ করল অনার্স ছাড়া। বাবা ডেকে বলল, পড়াশুনোর তো দেখছি তেমন উন্নতি হল না। তা গেঁয়ো ছেলের আর এর বেশি কীই বা হওয়ার কথা!

বুদ্ধিরাম সে—ই গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এল। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর হল না। পাশের গাঁ বিষ্টুপুরের মস্ত ইস্কুলে তখন সায়েন্সের মাস্টার খোঁজা হচ্ছে। বুদ্ধিরামকে তারা লুফে নিল।

বুদ্ধিরামের মনের অবস্থা তখন সাংঘাতিক। রাগে দুঃখে দিনরাত সে ভিতরে ভিতরে জ্বলে আর পোড়ে। লেখাপড়ায় একটা মারকাটারি কিছু করে বিজয়গর্বে গাঁয়ে ফিরে আসবে, এই না সে জানত। আর সে জায়গায় টিকিয়ে টিকিয়ে মোটে বি এসসি! বুদ্ধিরাম কিছুদিন আপনমনে বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়াত পাগলের মতো, দাড়ি রাখত, পোশাক—আশাকের ঠিক ছিল না। আত্মহত্যা করতে রেল রাস্তায় গিয়েছিল তিনবার। ঠিক শেষ সময়টায় কেমন যেন সাহসে কুলোয়নি।

তারপরই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। এমনি দেখতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু তার মধ্যেই বুদ্ধিরামের জীবনটা একটা মোড় ঘুরল। আমবাগানের ভিতর দিয়ে বিশু আর বুদ্ধি জিতেন পাড়ুইয়ের বাড়ি যাচ্ছিল মিটিং করতে। জিতেন সেবার ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশনে নেমেছে। জিতেনকে জেতানোর খুব তোড়জোড় চলছে। বুদ্ধিরাম তখন যা হোক একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকার জন্য ব্যস্ত। জীবনের হাহাকার আর ব্যর্থতা ভুলতে মাথাটাকে কোনো একটা ভূতের জিম্মায় না দিলেই নয়। নইলে জিতেনের ইলেকশন নিয়ে কেনইবা বুদ্ধিরামের মাথাব্যথা হবে!

আমবাগানে শরৎকালের একটা সোনালি রুপালি রোদের চিকরিকাটা আলো—ছায়া। সকালবেলাটায় ভারি পরিষ্কার বাতাস ছিল সেদিন। ঘাসের শিশির সবটা তখনও শুকোয়নি।

উলটো দিক থেকে একটা ছিপছিপে মেয়ে হেঁটে আসছিল। একা, নতমুখী। তার চুল কিছু অগোছালো এলো খোপায় বাঁধা। আঁচলটা ঘুরিয়ে শরীর ঢেকেছে। দেখে কেমন যেন মনটা ভিজে গেল বুদ্ধিরামের।

কে রে মেয়েটা?

দুর শালা! চিনিস না? ও তো আদুরি।

আদুরি! বুদ্ধিরাম এত অবাক হল যে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল হাঁ হয়ে। এক গাঁয়ে বাস হলেও আদুরির সঙ্গে তার দীর্ঘকাল দেখা হয়নি। কারও দিকে তাকায়ও না বুদ্ধিরাম। সেই আদুরি কি এই আদুরি?

আদুরি মাথা নীচু করে রেখেই তাদের পেরিয়ে চলে গেল। ভ্রূক্ষেপও করল না।

আর সেই ঘটনাটা সারাদিন বুদ্ধিরামের মগজে নতুন একটা ভূত হয়ে ঢুকে গেল।

বাড়ি ফিরেই সে ঠাকুমাকে ধরল, শোনো ঠাকুমা, একটা কথা আছে।

কী কথা?

সেই যে আদুরি মনে আছে?

আদুরিকে মনে থাকবে না কেন?

ওকেই বিয়ে করব। বলে দাও।

ঠাকুমা তার মাথায় পিঠে হাতটাত বুলিয়ে বলল, বড্ড দেরি করে ফেললি ভাই, আদুরির তো শুনছি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। হরিপুরের চন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে পরেশের সঙ্গে।

বুদ্ধিরাম এমন তাজ্জব কথা যেন জীবনে শোনেনি। আদুরির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! তা হলে তো খুব মুশকিল হবে বুদ্ধিরামের।

সেই দিনই সে গোপনে তার দু—একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শে বসে গেল।

কেষ্ট বলল, বিয়েটা না ভাঙতে পারলে তোর আশা নেই। ভাঙতে হলে সবচেয়ে ভালো উপায় হল চন্দ্রনাথ মল্লিককে একখানা বেনামা চিঠি লেখা।

তো তাই হল। কেষ্ট নানা ছাঁদে লিখতে পারে। তার সাইনবোর্ডের দোকান আছে। চিঠিটা সেই লিখে দিল।

দিন সাতেক বাদে শোনা গেল, বিয়ে ভেঙে গেছে।

বুদ্ধিরাম ভেবেছিল, এবার জলের মতো কাজটা হয়ে যাবে। সে গিয়ে ফের ঠাকুমাকে ধরল, শুনছি আদুরির বিয়েটা ভেঙে গেছে। তা আমি রাজি আছি বিয়ে করতে।

ঠাকুমা গেল প্রস্তাব নিয়ে। বুদ্ধিরাম নিশ্চিন্তে ছিল। এরকম প্রস্তাব তো মেয়ের বাড়ির পক্ষে স্বপ্নের অগোচর।

কিন্তু সন্ধেবেলা ফিরে এসে ঠাকুমা বিরস মুখে বলল, মেয়েটার মাথায় ভূত আছে।

কেন গো ঠাকুমা?

মুখের ওপর বলল, ও ছেলেকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো।

বুদ্ধিরাম একথায় এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল যে বলার নয়। বলল? এত বুকের পাটা? সেই রাতে বুদ্ধিরাম ঘুমোতে পারল না। কেবল ঘরবার করল, দশবার জল খেল, ঘন ঘন পেচ্ছাব করল। মাথার চুল মুঠো করে ধরে বসে রইল। রাগে ক্ষোভে অপমানে তার মাথাটাই গেল ঘুলিয়ে।

ভোরের দিকে সে একটু ঝিমোলো। ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবল, বহোৎ আচ্ছা। এইরকম তেজি মেয়েই তো চাই। গেঁয়ো মেয়েগুলো যেন ভেজানো ন্যাতা। কারও ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। আদুরির আছে, এটা তো খুব ভালো খবর।

সকালবেলায় সে একখানা পেল্লায় সাত পৃষ্ঠার চিঠি লিখে ফেলল আদুরিকে। মেলা ভালো ভালো শব্দ লিখল তার মধ্যে। অন্তত গোটা পাঁচেক কোটেশন ছিল। সবশেষে লিখল... 'তোমাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা।'

রসকলির হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল তীব্র উত্তেজনায়। আজ অবধি সে কোনো মেয়েকে প্রেমপত্র লেখেনি। এই প্রথম।

রসকলি ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে বলল, ও দাদা, চিঠি যে না পড়েই ছিঁড়ে ফেলল গো।

চুপ। চেঁচাস না। কিছু বলল না?

কী বলবে? শুধু জিজ্ঞেস করল চিঠিটা কে দিয়েছে। তোমার কথা বলতেই খামসুদ্ধু চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

বোনের কাছে ভারি অপদস্থ হয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। তবে রসকলি হাবাগোবা বলে রক্ষে।

বুদ্ধিরাম বলল, কাউকে কিছু বলিস না। ভালো একটা জামা কিনে দেবোখন।

তখন অপমানে লাঞ্ছনায় বুদ্ধিরামের পায়ের তলায় মাটি নেই। সারা দিনটা তার কাটল এক ঘোরের মধ্যে। কিন্তু দু—দিন বাদে সে বুঝতে পারল, আদুরি যত কঠিনই হোক তাকে জয় করতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। তবে বুদ্ধিরাম আর বোকার মতো চিঠি চাপাটি চালাচালিতে গেল না। আদুরির ধাতটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

গাঁয়ের মেয়ে। সুতরাং তাদের বাড়ির সকলের সঙ্গেই আজন্ম চেনাজানা বুদ্ধিরামের। তবে সে দেমাকবশে কারও বাড়িতেই তেমন যেতটেত না। ঘটনার পর দিনকয়েক আদুরিদের বাড়িতে হানা দিতে লাগল সে। আদুরির কাকা জ্যাঠা মিলে মস্ত সংসার। বড়ো গেরস্ত তারা। তিন—চারখানা উঠোন, বিশ—পঁচিশটা ঘর। সারাদিন ক্যাচম্যাচ লেগেই আছে। বুদ্ধিরাম গিয়ে যে খুব সুবিধে করতে পারল তা নয়। বাইরের ঘরের দাওয়ায় বসে হয়তো কখনো আদুরির কেশো দাদুর সঙ্গে খানিক কথা কয়ে এল। নাহয় তো কোনোদিন আদুরির জ্যাঠা হারুবাবুর কিছু উপদেশ শুনে আসতে হল।

চা—বিস্কুটও যে জোটেনি তা নয়। সে গাঁয়ের ভালো ছেলে। খাতির একটু লোকে করেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সেদিকে কিছুই এগোল না।

কিছুদিন পর সে বুঝল, এভাবে আদুরির কাছে এগোনো যাবে না। মহিলা মহলে ঢুকতে হবে। তা তাতেও বাধা ছিল না। আদুরিদের অন্দরমহলেও ঢুকতে সে পারে। আদুরির এক বউদি হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, হ্যাঁ গো বুদ্ধি ঠাকুরপো, কোনোকালে তো তোমাকে এ বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখিনি। তোমার মতলবখানা কী খুলে বলো তো! আমার তো বাপু, তোমার মুখচোখ ভালো ঠেকছে না।

এ কথায় আর এক দফা অপমান বোধ করল বুদ্ধিরাম। সে পুরুষমানুষ, কোন লজ্জায় মা মাসি বউদি শ্রেণির মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করে?

সুতরাং বুদ্ধিরামকে জাল গোটাতে হল।

তারপরই আবার বিপদ। আদুরির ফের সম্বন্ধ এল। চেহারাখানা ভালো, কিছু লেখাপড়াও জানে, সুতরাং আদুরিকে যে দেখে সে—ই পছন্দ করে যায়।

দ্বিতীয় পাত্রপক্ষকেও বেনামা চিঠি দিতে হল। ভেঙেও গেল বিয়ে। কিন্তু তাতে বুদ্ধিরামের যে কাজ খুব এগোল তাও নয়। বরং উলটে একটা বিপদ দেখা দিল। কেউ যে বেনামা চিঠি দিয়ে আদুরির বিয়ে ভাঙছে এটা বেশ চাউর হয়ে গেল। লোকটা কে তার খোঁজাখুঁজিও শুরু হল। তৃতীয়বার যখন আদুরিকে পছন্দ করে গেল আর এক পাত্রপক্ষ তখন আদুরির বাপ জ্যাঠা পাত্রপক্ষকে বলেই দিল, বেনামা চিঠি যেতে পারে, আমল দেবেন না। কোনো বদমাশ লোক করছে এই কাজ।

খুবই ভয়ে ভয়ে রইল বুদ্ধিরাম। কেষ্টা ভরসা দিয়ে বলল, আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এমন কলঙ্কের কথা লিখে দেব যে, পাত্রপক্ষ আঁতকে উঠবে।

কিন্তু এই তৃতীয়বার বুদ্ধিরাম ধরা পড়ে গেল। আদুরির সাত সাতটা গুন্ডা ভাই একদিন বাদামতলায় চড়াও হল তার ওপর। সতীশটা মহা ষণ্ডা। সেই সাইকেল থেকে টেনে নামাল বুদ্ধিরামকে।

বলি, তোর ব্যাপারটা কী?

কীসের ব্যাপার?

ন্যাকা! আদুরির বিয়ে ভাঙতে চিঠি দেয় কে?

আমি না।

তুই ছাড়া আর কে দেবে!

আমার কী স্বার্থ?

মেজোবউদি বলছিল তুই নাকি আমাদের বাড়িতে ঘুরঘুর করতিস!

বুদ্ধিরাম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছিল। সত্য গোপন করার অভ্যাস তার নেই। গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলা তার আসেও না। সে আমতা আমতা করতে লাগল।

সতীশ অবশ্য মারধর করল না। বলল, যদি আদুরিকে বিয়ে করতে চাস তো সে কথা বললেই হয়। গাঁয়ে তোর মতো ছেলে ক—টা? আর যদি নিতান্তই বদমাইশির জন্য করে থাকিস তা হলে....

বুদ্ধিরাম কেঁদে ফেলেছিল। একটু সামলে নিয়ে বলল, বিয়ে করতে চাই।

সাবাশ। বলে খুব পিঠ চাপড়ে দিল সতীশ। বলল, এ কথাটা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতো হল। আগে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যেত।

কিন্তু ব্যবস্থা হল না। পরদিনই সতীশ এসে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, মুশকিল কী হয়েছে জানিস? তোর ওপর আদুরি মহা খাপ্পা। কী করেছিলি বল তো!

সব শুনেটুনে সতীশ বলল, আচ্ছা, চুপচাপ থাক। দেখি কী করা যায়!

বলা পর্যন্তই। সতীশ কিছু করতে পারেনি। চিঁড়ে ভেজেনি।

কিন্তু এরপর থেকে আদুরির আর সম্বন্ধ আসত না। এলেও আদুরি বেঁকে বসত।

এ সবই সাত আট বছর আগেকার কথা। এই সাত আট বছর ধরে বুদ্ধিরাম আড়াল থেকে আদুরির উদ্দেশ্যে তার সব অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করেছে। প্রতিবার পুজোয় শাড়ি পাঠায়, টুকটাক উপহার পাঠায়, কোনোটাই আদুরি নেয় না। নিলেও ফেলে টেলে দেয় বা অন্য কাউকে দান করে।

কিন্তু বয়স তো বসে নেই। আদুরির বিয়ের বয়স পার হতে চলল। বুদ্ধিরামও ত্রিশ পেরিয়েছে। কোনো দিকেই কিছু এগোল না। আদুরির কপাল বজ্র আঁটুনিতে বন্ধই রইল।

ধানখেতের ভিতর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে এসব কথাই ভাবছিল বুদ্ধিরাম।

বড়ো রাস্তায় উঠে সে সাইকেলে চাপল। পাঞ্জাবির পকেটে ভারী শিশিটা ঝুল খাচ্ছে। কষ্ট করাই সার হল। কোনো মানে হয় না এর।

গাঁয়ে ঢুকবার মুখে বাস রাস্তায় কয়েকটি দোকান। আঁধার হয়ে এসেছে। টেমি জ্বলছে দোকানে দোকানে। মহীনের চায়ের দোকানে দু—চারজন বসে আছে। ষষ্ঠী হাঁক মারল, কে রে! বুদ্ধি নাকি?

বুদ্ধি নেমে পড়ল। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে বসে গেল। একটু ঠান্ডা—ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। এক ভাঁড় চা হলে হয়।

ষষ্ঠী একটু বেশি কথা কয়। নানা কথা বকবক করে যাচ্ছিল। সে একটু তেলানো মানুষ। যাকে দেখে তাকেই একটু একটু তেল দেওয়া তার স্বভাব। পুরোনো কথার সূত্র ধরে বলল, তোর কত বড়ো হওয়ার কথা ছিল বল তো! গাঁয়ে আজ অবধি তোর মতো বেশি নম্বর পেয়ে কেউ পাশ করেছে? বসন্ত স্যার তো বলতই, বুদ্ধিরামের মতো ছেলে হয় না। যদি লেগে থাকে তো জজ—ম্যাজিস্ট্রেট কিছু একটা হয়ে ছাড়বে।

এসবই পুরোনো ব্যর্থতার কথা। বুদ্ধিরাম যা খুঁচিয়ে তুলতে চায় না। ধীরে ধীরে তার আঁচ নিবে গেছে। সে গাঁয়ের মাস্টার হয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে মাপে ছোটো করে ফেলেছে। সয়েও গেছে সব। কিন্তু কেউ খুঁচিয়ে তুললে আজও বুকটা বড়ো উথাল—পাথাল করে।

ষষ্ঠী, চুপ কর। ওসব কথা বলে আর কী হবে।

আমরা যে তোর কথা সব সময়েই বলাবলি করি। চোখের সামনে দেখেছি কিনা। কী জিনিস ছিল তোর ভিতরে।

বুদ্ধিরাম ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে উঠল। বলল, যাই। ছাত্ররা সব এসে বসে থাকবে।

যা।

বুদ্ধিরাম সাইকেলে চেপে বড়ো রাস্তা থেকে গাঁয়ের পথে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার রাস্তায় হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে। তাদের মিটমিটে আলোয় কিছুই প্রতিভাত হয় না। অথচ জ্বলে। লাখো লাখো জ্বলে। তা হলে কী লাভ জ্বলে?

মোট দশ জন ছাত্র তার বাড়িতে এসে পড়ে। মাথাপিছু কুড়ি টাকা করে মাস গেলে দুশো টাকা তার আসার কথা। কিন্তু নগদ টাকা বের করতে গাঁয়ের লোকের গায়ে জ্বর আসে। বাকি বকেয়া পড়ে যায় অনেক। তবু বুদ্ধিমান সবাইকেই পড়ায়। বেশিরভাগই গবেট। দু—একজন একটু—আধটু বোঝে সোঝে।

পড়াতে বসবার আগ পাতুকে ডেকে শিশিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ও—বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আয়। তার হাতে দিস।

রসকলির বিয়ে হয়ে গেছে। একটু বয়সকালেই হল। এখন রসকলির জায়গা নিয়েছে বুদ্ধিরামের ভাইঝি পাতু। আদুরি আর বুদ্ধিরামের ব্যাপারটা দু—বাড়ির কারও আর অজানা নেই। সুতরাং নাহক লজ্জা পাওয়ার কোনো মানে হয় না।

হাতমুখ ধুয়ে পড়াতে বসে গেল বুদ্ধিরাম। কিছুক্ষণ আর অন্যদিকে মনটা ছোটাছুটি করল না। ছাত্রদের মুখের দিকে চেয়ে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়।

এই ভুলে থাকাটাই এখন বুদ্ধিরামের কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা। যত ভুলে থাকা যায় ততই ভালো। জীবনটা আর কতই বা লম্বা! একদিন আয়ু ফুরোবেই। তখন শান্তি। তখন ভারি শান্তি।

পড়িয়ে যখন উঠল বুদ্ধিরাম তখন বেশ রাত হয়েছে। ছাত্ররা যে যার লণ্ঠন হাতে উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বুদ্ধিরাম দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখল। এরপর তার একা লাগবে। খুব একা।

পাতু ফিরে এসেছে। বারান্দায় ঘুরে ঘুরে কোলের ভাইকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

হাতে দিয়েছিস তো!

হ্যাঁ গো।

কিছু বলল?

না। শিশিটার গায়ে কী লেখা আছে পড়ল। তারপর তাকে রেখে দিল।

ভাতের গন্ধ আসছে। জ্যাঠামশাইয়ের কাশির শব্দ। কে যেন কুয়ো থেকে জল তুলছে ছপাৎ ছপাৎ করে। দুটো কুকুরে ঝগড়া লেগেছে খুব। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধিরাম বাইরের কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নার দিকে আনমনে চেয়ে রইল।

না, বেঁচে থাকাটার কোনো মানেই খুঁজে পায় না সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজের ঘরে ঢুকল। বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ঘরখানা তার। ঘরে একখানা চৌকি, একটা টেবিল আর চেয়ার আর একখানা বইয়ের আলমারি।

বুদ্ধিরাম চেয়ারে বসে লণ্ঠনের আলোয় একখানা বইয়ের পাতা খানিকক্ষণ ওলটাল। বইটা কী, কোন বিষয়ের, তাও যেন বুঝতে পারছিল না। বইটা রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নারও কোনো অর্থ হয় না। ঝড়—বৃষ্টি,শীত—গ্রীষ্ম কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না। অথচ বেঁচে থাকতে হবে। এ কী জ্বালা রে বাপ?

বউদি এসে খেতে ডাকল বলে বেঁচে গেল বুদ্ধিরাম। খাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। তবু সেটা একটা কাজ। কিছুক্ষণ সময় কাটে। কথাবার্তা হয়, হাসিঠাট্টা হয়। সময়টা কেটে যায়। বুদ্ধিরাম গিয়ে সাগ্রহে খেতে বসল।

খেয়ে এসে বুদ্ধিরাম ফের কিছুক্ষণ বসে রইল চেয়ারে। চেয়ারে বসে বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়ল, কে জানে।

পাতু এসে জাগাল, ওঠো সেজকা, বিছানা করে মশারি ফেলে গুঁজে দিয়েছি। শোও গে।

হাই তুলে উঠতে যাচ্ছিল বুদ্ধিরাম, পাতু ফের বলল, আজ ও—বাড়ির সকলের মন খারাপ। নিবারণদাদুর অবস্থা ভালো নয়। আদুরি পিসির চোখ লাল। খুব কাঁদছিল।

নিবারণ মানে হল আদুরির বাবা। বুদ্ধিরাম খবরটা শুনল মাত্র। মনে আর কোনো বুজকুরি কাটল না। কলঘর ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। বাপ যদি মরে তো আদুরির মাথা থেকে ছাদ উড়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমলো বুদ্ধিরাম। আজকাল নির্বোধের মতোই সে ঘুমোতে পারে। মাথাটা আস্তে আস্তে বোকা হয়ে যাচ্ছে তো। বোধবুদ্ধি কমে যাচ্ছে। আজকাল তাই গাঢ় ঘুম হয়।

মাঝরাতে আচমকা চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভাঙল। ভাঙতেই সোজা হয়ে বসল বুদ্ধিরাম। চেঁচামেচিটা অনেক দূর থেকে আসছে। আদুরির বাপের কি তবে হয়ে গেল?

উঠবে কি উঠবে না তা ভাবছিল বুদ্ধিরাম। ও—বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীই বা আর? না গেলেও হয়। রাতে একটু শীত পড়েছে। পায়ের কাছে ভাঁজ করা কাঁথা। সেটা গায়ে টেনে নিতেই ভারি একটা ওম আর আরাম হল। বুদ্ধিরাম চোখ বুজল।

ঘুমিয়েই পড়ছিল প্রায় এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে মেজদা বলল, বুদ্ধি, ওঠ। নিবারণ জ্যাঠার হয়ে গেল। একবার যেতে হয়। ও—বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে।

বুদ্ধিরাম উঠল। যারা বেশি রাতে মরে তাদের আক্কেল বিবেচনার বড়ো অভাব। বলল, যাচ্ছি।

গামছাখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। গাঁসুদ্ধু জেগে গেছে। আজকাল গাঁয়ে লোকও বেড়েছে খুব। রাস্তায় নামলেই বেশ লোকজন দেখা যায়। এই মাঝরাতেও ঘুম ভেঙে অন্তত জন ত্রিশ চল্লিশ লোক নেমে পড়েছে রাস্তায়, আদুরিদের বাড়ি যাবে বলে।

একটা হাই তুলল বুদ্ধিরাম। শরীরটা এখনও ঘুমজলে অর্ধেক ডুবে আছে। শরীরের যেটুকু জেগে আছে সেটাকেও চালানো যাচ্ছে না।

বাইরের উঠোনেই নিবারণ জ্যাঠাকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়েছে। চেঁচিয়ে এ ওর গলাকে ছাপিয়ে কান্নার কম্পিটিশন চলছে। কোনো মানে হয় না। জন্মালেই তো মানুষের মধ্যে মৃত্যুর বীজ পোঁতা হয়ে গেল। এভাবেই যেতে হবে। সবাই যায়।

গোটাদশেক লণ্ঠন আর দু—দুটো হ্যাজাক বাতির আলোতেও এই ভিড়ের মধ্যে আদুরিকে দেখতে পেল না বুদ্ধি। আদুরি খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে। চেঁচিয়ে কাঁদবে না, জানে বুদ্ধিরাম। আর সে আসায় হয়তো ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। মুখ দেখতেও বুঝি ঘেন্না হয় আজকাল।

মাস চারেক আগে প্লুরিসি থেকে উঠেছে বুদ্ধিরাম। বুক থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে জল টেনে বের করতে হয়েছিল গামলা গামলা। তার ঠান্ডা লাগানো বারণ। কিন্তু সে কথা বুদ্ধিরাম ছাড়া আর কেই বা মনে রেখেছে।

শ্মশানে গেলে স্নান করে আসতে হবে। শেষ রাতের শীতে হিম বাতাস লাগবে শরীরে। ডাক্তার ঠান্ডা লাগাতে বারণ করেছিল।

বুদ্ধিরাম একটু হাসল। সে রেলরাস্তায় গলা দিতে গিয়েছিল। মরণকে তার ভয়টয় নেই। একভাবে—না—একভাবে তো যেতেই হবে।

কান্নাকাটির মধ্যেই কিছু লোক বাঁশটাশ কাটতে লেগেছে। দড়িদড়া এসে গেছে। বুদ্ধিরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিছুই দেখার নেই অবশ্য।

মোড়লদের মধ্যে শলা—পরামর্শ হচ্ছে। সেই দলে বুদ্ধির বাপ—জ্যাঠাও আছে। অন্য ধারে গাঁয়ের অল্পবয়সি ছেলেরা কোমরে গামছা বেঁধে তৈরি।

আচমকাই— একেবারে অপ্রত্যাশিত, আদুরিকে দেখতে পেল বুদ্ধিরাম। উত্তরের ঘরের দাওয়ায় তিন—চারজন মহিলা দাঁড়িয়েছিল,সেই দলে বুদ্ধির জ্যাঠাইমাও। আদুরি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা বুদ্ধির দিকে তাকাল। গত দশ বছরে বোধহয় প্রথম।

বুদ্ধি একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেল। না, ভুল দেখছে না। হ্যাজাকের আলোয় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বাপের মড়া উঠোনে শোওয়ানো। তবু আদুরি সোজা তার দিকেই চেয়ে আছে। একেবারে নিষ্পলক।

আজ বুদ্ধিরামই চোখ সরিয়ে নিল। তারপর আড়ে আড়ে চাইতে লাগল। মেয়েটার হল কী?

আদুরি তার জ্যাঠাইমার কানে কানে কী যেন বলল। তারপর একটু সরে দাঁড়াল। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে নরম ভঙ্গিতে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তাতে যেন ভারি ফুটে উঠল আদুরি। কী যে দেখাচ্ছে।

জ্যাঠাইমা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছিল।

বুদ্ধিরাম অগত্যা এগিয়ে গিয়ে বলল, কী গো জ্যাঠাইমা?

মড়া ছুঁয়েছিস নাকি?

না। তবে এবার তো ছুঁতে হবেই।

কাজ নেই বাবা। বাড়ি যা। গায়ে গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা ছিটিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়। তোকে শ্মশানে যেতে হবে না।

কেন?

কেন আবার। ক—দিন আগে কী অসুখটা থেকেই না উঠলি। ঠান্ডা লাগলে আর বাঁচবি নাকি?

আমার কিছু হবে না জ্যাঠাইমা, ভেবো না।

কেন, তোরই বা যেতে হবে কেন? শ্মশানে যাওয়ার কি লোকের অভাব? কত লোক জুটে গেছে! আদুরি মনে করিয়ে দিল, তাই। যা বাবা, ঘরে যা।

আর একবার শুনতে ইচ্ছে করছিল। বলল, কে মনে করিয়ে দিল বললে?

আদুরি অদূরে দাঁড়িয়ে সব শুনতে পাচ্ছে। নড়ল না।

জ্যাঠাইমাও আর তাকে আমল না দিয়ে অন্য মহিলাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল।

বুদ্ধিরাম ধীরে পায়ে ছেলেছোকরাদের দঙ্গলটার কাছে এসে দাঁড়াল।

বুদ্ধিদা, যাবে তো!

যাব না মানে?

তা গেল বুদ্ধিরাম। মড়া কাঁধে নেচে নেচে গেল। বহুকাল পরে তার এক ধরনের আনন্দ হচ্ছিল আজ। না, প্রতিশোধ নেওয়ার আনন্দ নয়। প্রতিশোধের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। আজ তার আনন্দ হচ্ছিল একটা অন্য কারণে। ঠিক কেন তা সে বলতে পারবে না।

মড়া পুড়ল। বুদ্ধিরাম কষে স্নান করল নদীর পাথুরে ঠান্ডা জলে। দুনিয়ার একজনও অন্তত তার অসুখটার কথা মনে রেখেছে, এখন আর মরতে বাধা কী!

ভেজা গায়ে যখন উঠে এল বুদ্ধিরাম তখন শেষ রাতের হিম বাতাসে সে থরথর করে কাঁপছিল। সবাই কাঁপছে। কিন্তু তার কাঁপুনিটা আলাদা। লোকে বুঝতে পারল না। শুধু বুদ্ধিরামের নিজের ভিতরে যে নানা ভাঙচুর হচ্ছিল তা নিজেই টের পেল সে।

হোঁৎকা সতীশ কাছেই দাঁড়িয়ে গামছা নিংড়োচ্ছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হতে বুদ্ধিরামের দিকে ফিরে বলল, হ্যাঁরে বুদ্ধি, তুই যে বড়ো স্নান করলি?

করব না তো কী?

সতীশ মুখে একটা চুক চুক শব্দ করে বলল, তোর নাকি একটা অসুখ হয়েছিল ক—দিন আগে!

কে বলল তোকে?

সতীশ গামছাটা ফটাস ফটাস করে ঝেড়ে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, বেরোবার মুখে আদুরি এসে ধরেছিল আমায়। বলল বটে, রাঙাদা, বুদ্ধিরামের কিন্তু শরীর ভালো নয়। হিমজলে স্নান করলে মরবে। ওকে দেখো।

বুদ্ধিরাম কোনো কথা বলল না। গলার কাছে একটা দলা আটকে আছে। চোখে জল আসছিল।

সতীশ গা মুছতে মুছতে বলল, তোর আক্কেল নেই? কোন বুদ্ধিতে এই সকালে স্নান করলি?

দুর শালা! আজই তো স্নানের দিন। আজ স্নান করব না তো কবে করব?

যতীনবাবুর চাকর

যতীনবাবু পানুকে খুব ভালো করে চেনেন না, এ কথা ঠিক। যতীনবাবুর দোষ নেই, তাঁর মেলা লোকলশকর, মেলাই মুনিষ, দারোয়ান, চাকরবাকর। এর মধ্যে পানু কোনজন তা তাঁর না জানার হক আছে। তবে কিনা যতীনবাবুর দুটো কুকুর, সাতটা গাই, গোটা সাতেক ছাগল, পঞ্চান্নটা হাঁস, সত্তরটা মুরগি, সতেরোটা খরগোশ, সাতটা পোষা পাখি আর যতীনবাবুর প্রায় একশো বছর বয়সি দিদিমা কুসুমদাসী পানুকে ভালোই চেনে। তবে তারা আরও অনেককে চেনে, আবার পানুকেও চেনে।

পানু যদি বলে, 'আমি যতীনবাবুর চাকর' তা হলে কথাটা মিথ্যেও হয় না, আবার সত্যিও হয় না। মাস গেলে পানু যে আশিটা টাকা মাইনে পায় তা যতীনবাবুর তহবিল থেকেই আসে। দু—বেলা পানু যে পাহাড়প্রমাণ ভাত পেটের মধ্যে সাঁদ করায় তাও বটে যতীনবাবুরই ভাত। তবু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হল, পানু হল গে চাকরের চাকর। যতীনবাবু তাকে চেনেন না, তার মাথার ওপর ছড়িও ঘোরান না। তাকে হুকুম তামিল করতে হয় সত্যরামের। সত্যরাম এ বাড়ির যত চাকরবাকর আর কাজের লোকের ছড়িদার। সত্যরামের যা দাপট তা কহতব্য নয়। সত্যরামও বটে যতীনবাবুর এক চাকরই, কিন্তু সে কথা মনে আনাও পাপ। সে এখন যতীনবাবুর মেলা মেলা টাকা রোজ ছানাঘাঁটা করে, কাকে রাখবে কাকে ফেলবে তাও সে—ই ঠিক করে, সে—ই বাজার সরকার, খাজাঞ্চি, আরও বা কত কী। পানু শুধু জানে, যতীনবাবু নন, তার মাথার ওপর সত্যরাম। তার মরাবাঁচা সত্যরামের হাতে। সুতরাং সে হল গে যতীনবাবুর চাকরের চাকর।

এ বাড়িতে পানু ঢুকেছিল ছুঁচ হয়ে। তবে ছুঁচই রয়ে গেছে, ফাল আর হওয়া হয়নি। সেই ছুঁচ হয়ে ঢোকাটাও এক বৃত্তান্ত। পানু তখনও তো চাকর হয়নি। বাপ বেঁচে। গরিব বটে, তবু বাপু খাটত পিটত, পানু আলায় বালায় ঘুরে দিব্যি হেসেখেলে ছিল। পানুর তখন বয়সের জোয়ারে চেহারাখানাও এমন পাকিয়ে দড়কচা মেরে যায়নি। ভারি মিঠে করে বাঁশি বাজাতে পারত। ইচ্ছে ছিল, যাত্রা পার্টিতে ভিড়ে যাবে। গুণীর খুব কদর যাত্রার দলে। সেই সময়ে সে পড়ল গন্ধবাবুর খপ্পরে। সে আর এক বৃত্তান্ত। গন্ধবাবুর মেয়ে হল পারুল। গেছো মেয়েছেলে যাকে বলে। জামা ছেড়ে শাড়ি ধরার বয়সের ফাঁকেই দু—দুবার দুটো ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ফের ফেরত আসে। কোনো কোনো মেয়ে থাকে এরকম, যাকে শেষ অবধি সামলে ওঠা যায় না। স্বজাত স্বঘরের একটি যেমন তেমন পাত্র তখন গন্ধবাবুর খুব দরকার। নইলে মানসম্মান থাকে না।

তা গন্ধবাবুর মানইজ্জত বড়ো কমও তো নয়। উনি ছিলেন যতীনবাবুর তেলকলের ম্যানেজার। গোঁসাইগঞ্জের হাটে গন্ধবাবু পাকড়াও করলেন পানুকে। দু—চার কথার পরই ধাঁ করে কাজের কথা পেড়ে

ফেললেন। বেশ হেঁকেই বললেন, পারুলকে যদি বিয়ে করো তবে আখের গুছিয়ে দেবো। চাই কি আজই কাজে লেগে যেতে পারো।

গায়ে খুব গন্ধ মাখতেন বলে লোকটার ওই নাম। আসল নাম রাখাল টাখাল কিছু হবে। তবে গন্ধবাবু বললে দশখানা গাঁয়ের লোক চেনে। বাড়ি এসে যখন পানু তার বাপকে কথাটা বলল তখন বাবা লাফিয়ে উঠে বলল, আরিব্বাস, এ তো লটারি জিতেছিস। কালই গিয়ে কাজে লেগে যা। মেয়েটার একটু বদনাম আছে বটে, তা বিয়ের পর দু—চার ঘা দিলেই সারবেখন।

পানু অগত্যা কাজে লেগে পড়ল। তেলকলের কাজ গতরের খাটুনি। তবে হবু শ্বশুর মাথার ওপর ছিল বলে ভরসাও ছিল। দিন ফিরবে।

কিন্তু ফ্যাসাদটা বাধাল পারুলই। চোত মাসে কাজে লেগেছিল পানু আর জ্যৈষ্ঠে পারুল ফের পালাল। এবার গেল এক ঠিকাদরের সঙ্গে। গিয়ে যে কোন গাড্ডায় পড়ল কে জানে, আর ফিরল না।

গন্ধবাবু তারপর থেকেই পানুর ওপর বিগড়ে গেলেন। না, তা বলে তাড়িয়ে দিলেন না। তবে আগের মতো 'এসো, বোসো'—ও আর করলেন না। পানু চাকরি করে, গন্ধবাবু ম্যানেজারি করেন, কারও সঙ্গে কারও আর অন্য কোনো সম্পর্ক থাকল না।

সেই সময়ে যতীনবাবুর বাড়িতে কাজের লোকের টান পড়ায় সত্যরাম এসে তেল কল থেকে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল। সেই কয়েকজনের মধ্যে পানু একজন। গন্ধবাবু ফিরেও তাকালেন না।

পানুর একটু দুঃখ হয়েছিল বই কী। পারুলের জন্য তাকে দেগে রাখা হয়েছিল বটে, কিন্তু গন্ধবাবুর আরও তো মেয়ে ছিল। পারুলের ছোটো বকুল, তার ছোটো টগর। কিন্তু তাদের কোনো গণ্ডগোল নেই। কই তাদের একজনের সঙ্গেও তো বিয়েটা লাগতে পারত পানুর। গন্ধবাবু সে—দিক দিয়ে গেলেন না।

গন্ধবাবু আর বেঁচে নেই। তার পরিবার কোথায় কীরকম আছে টাছে তাও জানে না পানু। তার সে সময় নেই। যতীনবাবুর বাড়িতে পাহাড়প্রমাণ কাজ। সত্যরাম আবার কারও বসে থাকা পছন্দ করে না।

যতীনবাবুর দুটো মহল। একটা অন্দর আর একটা বার। অন্দরমহলে যারা যাতায়াত করে তারা সত্যরামের পেয়ারের লোক। পানুর কপালে সত্যরামের নেকনজর জোটেনি। সে বাইরের লোক। বাইরে থেকে ভিতরটা কিছুই দেখা যায় না। তবে আন্দাজ করা যায়। মোটা মোটা দেয়াল, চিক—মেলা বারান্দা, পর্দা ফেলা জানালার ওই যে বিশাল তিনতলা অন্দরমহল ও হল রাজার পুরী। ওখানে নরম বিছানা, আতরের সুবাস, পায়েস রসগোল্লার ছড়াছড়ি। আর সোনাদানা টাকাপয়সার পাহাড়।

এই বাইরের মহল আর অন্দরমহলের মাঝামাঝি একখানা একটেরে দালান আছে। আগে ঠাকুর—দালানই ছিল, এখন নতুন ঠাকুর—দালান হয়েছে দক্ষিণ দিকে। এই দালানের একখানা ঘরে যতীনবাবুর দিদিমা থাকে। তিন কুলে কেউ আর নেই বলে বুড়ি যতীনবাবুর কাছে এসে পড়েছিল কোনোকালে। যতীনবাবু ফেলেননি, আবার তেমন মাথায় করেও রাখেননি। গরিব আত্মীয় বড়ো বালাই। তার ওপর বুড়ি তাঁর আপন দিদিমাও নয়, মায়ের মাসি।

খুনখুনে বুড়ি কুসুমদাসী একদিন পানুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, দিবি দাদা, একখানা ডাব পেড়ে?

পানু তখন নতুন। কিছু জানে না। কোথা থেকে ডাব পেড়ে দেবে তাও বুঝতে পারছে না। হাঁ করে চেয়ে রইল।

বুড়ি বলল, আমি যতীনের দিদিমা। যা, ওই পুবের ঘরের পিছনে যে গাছগুলো আছে সেখান থেকে একটা পেড়ে আন। আজ একাদশী।

যতীনবাবুর দিদিমা! পানুর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। তক্ষুনি গিয়ে তরতরিয়ে গাছে উঠে একটার জায়গায় চারটে পেড়ে আনল।

কুসুমদাসী খুব খুশি। কত আশীর্বাদ করল। ফলে আজ পানুর রাজাগজা হওয়ার কথা। সে তো হয়ইনি সে, তার ওপর ডাব পাড়ার জন্য সত্যরাম এই মারে কী সেই মারে।

তবে সে যা—ই হোক, সেই থেকে বুড়ির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল পানুর। যতীনবাবুর দিদিমার অবস্থা যে তার চেয়ে খুব বেশি ভালো নয় তা বুঝতে পানুর দেরি হয়নি। তবে বুড়ি মানুষ ভালো। দ'য়ে পড়লে মানুষের স্বভাব ভালো হয়ে পড়ে তারা ভারি নরম নরম হয় আর লোকেদের ভক্তিমান্যি করতে শুরু করে, এ পানু অনেক দেখেছে। যতীনবাবুর দিদিমাও সেই হিসেবেই ভালো। পানুকে খুব ডাকখোঁজ করে, এটা সেটা জোগাড় করে দিতে বলে, আর লোভও দেখায়, 'তোর বে হোক, আমার এক ছড়া তিন ভরির মটরদানা হার আছে, তোর বউকে দেবো।'

পানু হাসে। মটরদানা হারখানা আর দিদিমাকে হাতছাড়া করতে হবে না ইহজন্মে। পারুল সটকে পড়ার পর থেকেই পানু জানে, এই টনটনে কপালে বে আর নেই।

খড় কুচোতে বসে, কিংবা চুন আর বালি দিয়ে ঝামায় ঘষে কুয়োপাড়ের শাওলা তুলতে তুলতে, কিংবা পুকুরধারে পাটায় বাবুদের পেল্লায় পেল্লায় মশারি কাচতে কাচতে জীবনটার ওপর যেমন ঘেন্না আসে, তেমনি আবার শিউলি ফুটলে, নলেনগুড় জ্বালের গন্ধ বেরোলে বা কোকিল আচমকা ডেকে উঠলে মনটা ভারি খুশি খুশি হয়ে ওঠে। জীবনটায় আর একটা খুশির তুফান লাগতে পারত যদি সত্যরাম তার ওপর খুশি থাকত। কিন্তু সেটাই কিছুতেই হয়ে উঠল না। এক—একজন থাকে, বেশ আছে, দোষঘাট কিছু করেনি, তবু তার ওপর কেউই যেন খুশি হয় না। তাকে দেখলেই মুখ বেজার করে ফেলে। পানুরও হয়েছে তাই।

পানুর বাপ মারা গেল এই তো সেদিন। খবর পেয়ে পানুর তেমন কিছু বুক—তোলপাড় হল না। গরিবদের তেমন আঠা থাকে না কিনা। বাপের সঙ্গে পানুরও বহুকাল ছাড়কাট হয়ে গেছে। তবু খবর পেয়ে যেতে হয়, তাই গেল। গিয়ে দেখল, দেড় বিঘে জমি আর খোড়ো ঘরসমেত বাস্তুটা জুড়ে থাবা গেড়ে আছে তার ছোটোভাই কানু। রাগী কুকুর যেমন লোক দেখলেই গরগর করতে থাকে, তেমনি তাকে দেখেও কানু কেমন যেন গরগর করতে থাকল। বুঝি ভেবেছিল পানু বাপের সম্পত্তির ভাগ চাইবে। চাওয়ার কথা মনেই হয়নি পানুর। সে বড়োলোকের চাকর, নজর একটু উঁচু হয়েছে। দেড় বিঘে জমি আর নড়বড়ে খোড়ো ঘরের ভাগ চাইবার মতো ছোটো নজর তার আর নেই। সে কথা কানুকে বুঝিয়েও বলল সে, তবু কানু গরগরানিটা থামাল না। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে বেশ ফাঁদানো সংসার। এখানে ভাগিদার জুটলে তার বিপদ। সে তো আর সুখে নেই। তবে ছোঁড়াটা বরাবরই খারাপ ছিল। মদ টদ খায়। জুয়া খেলে, বউকে ধরে পেটায়, বাপকে ঝাড় দিত মাঝে মাঝে।

পানু ফিরে আসার পর সত্যরাম একদিন তাকে পা দাবাতে ডেকে পাঠাল। সত্যরামের পা দাবানো এক মস্ত সম্মানের ব্যাপার। যে—সে সত্যরামের পায়ে হাত ছোঁয়াতে পারে না। যারা পারে তাদের নির্ঘাৎ দশ বিশ টাকা বেতন বেড়ে যায়। আর তারা নেক—নজরেও থাকে।

পানুর ভারি আহ্লাদ হয়েছিল সত্যরামের ডাক পেয়ে। কিন্তু পা দাবাবে কী, হাত ছোঁয়াতে—না—ছোঁয়াতেই সত্যরাম ককিয়ে উঠে বলল, ওরে থাম থাম, কী লোহার হাত রে বাবা। কড়া পড়ে যে এক্কেবারে শিরীষ—কাগজ বানিয়েছিস। আমার নরম শরীর, ওই কেঠো হাত চলবে না।

তা কথাটা বটে সত্যি। পানুর হাত আর হাত নেই। থাবা হয়ে গেছে। মনের দুঃখে সে সত্যরামের ঘর থেকে ফিরে এল। কপালটা খুলি—খুলি করেও খুলল না। সত্যরামের চাকর বটে, কিন্তু বড়ো চাকর, সব ননি দুধ ঘি খেয়ে আর গতর না খাটিয়ে সে ইদানীং ভারি নাদুসনুদুস হয়েছে। মুখখানায় আহ্লাদী ভাব। তিন আঙুলে তিনখানা সোনার আংটি। এমন এঁটে বসে গেছে যে, স্যাকরা ডেকে না খোলালে আর খুলবে না। তার পা দাবাতে গেলে পানুকে সাতদিন হাত দু—খানা তেলে ভিজিয়ে নরম করে নিতে হবে।

এই সব নানা কথা নিয়ে ভাবে পানু। আর কাজ করে। আর খায়। আর ঘুমোয়। ভাবে।

ওদিকে যতীনবাবুর কারবার বাড়ছে, টাকা বাড়ছে, লোক বাড়ছে। ক্রমে ক্রমে চারদিকটা বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে। দু—খানা গাড়ি কিনলেন যতীনবাবু। বারবাড়ির উঠোনে একখানা দোতলা তুলে ফেললেন। পঞ্জাব থেকে দুটো বিশাল গাই এল।

কিন্তু পানু যে কে সে—ই। তবে এ কথাও ঠিক, যতীনবাবুর উন্নতি যত হয় ততই পানু খুশি হতে থাকে। শত হলেও মনিব তো। যতীনবাবুর রংখানা দিন দিন ফরসা হয়েছে, চোখ দু—খানা থেকে দু—বাটি মধুর মতো মুখ থিকথিক করছে। মুখখানা সর্বদা যেন হাসি—হাসি ভাব। আগে একজন পাইক সর্বদা ঘুরত। আজকাল দু—জন। দু—নম্বর পাইকটার চেহারা কাবলিওলাদের হার মানায়। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া তেমনি বিশাল বুকখানা। আর চোখ দু—খানায় দোফলা ছুরির ধার। যত টাকা বাড়ছে যতীনবাবুর ততই শত্রু বাড়ছে। তাই বাড়ছে পাইক। নতুন পাইকটার হাতে একটা দোনলা বন্দুকও থাকে। দেখে ভারি ভক্তিশ্রদ্ধা হল পানুর।

দুপুরবেলা বারবাড়ির বারান্দায় তারা ছ—জন বাইরের চাকর খেতে বসেছে। সত্যরামের পেয়ারের লোকদের জন্য ভিতরের দরদালানে ভিন্ন ব্যবস্থা। তা হোক, পানুর কোনো দুঃখ নেই। যতীনবাবুর বাড়িতে ভাতটা নিয়ে হিসেব কষা হয় না। যত পারো খাও। ভাতটা বেশ চেপেই নেয় সকলে। ভাতের মাথায় একটা গর্ত করতে হয়, তাতে বড়ো হাতা দিয়ে হড়হড় করে ডাল ঢেলে দিয়ে যায় হরিহর। একটু ঘ্যাঁট মতো থাকে সঙ্গে। পরে চুনো বা ছোটো মাছের একখানা ঝোল। বাড়িতে ভোজ হলে অবশ্য তাদেরও কপাল ফেরে। আর যতীনবাবুর বাড়িতে ভোজ লেগেই আছে।

খেতে বসে আজ নলিনীকান্ত পানুর কানে কানে বলল, নতুন পাইকটার বৃত্তান্ত শুনেছ! সাতখানা খুন করে এয়েছে।

পানু শুনে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়, বলিস কি?

নোনাপুকুরের বটকেষ্ট কাপালিকের কাছে গিয়ে গা—ঢাকা দিয়েছিল। পুলিশ গিয়ে ধরে। বটকেষ্টর খুব ভক্ত হল যতীনবাবু। তার কথায় ওঠে বসে। বটকেষ্ট যতীনবাবুকে হুকুম দিল পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ছাড়িয়ে এনে পাইকের চাকরিতে বহাল করতে। যতীনবাবুও কাঁচাখেকো খুনিটাকে এনে রেখেছে। রোজ দুটো করে মুরগি, ডজন ডজন ডিম ওড়াচ্ছে আর বন্দুক নিয়ে গোঁফ মুচড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবান বলে কিছু নেই, বুঝলে?

পানু মাথা নেড়ে বলল, সে আমি অনেক আগেই বুঝেছি।

বলাই দাঁতের ফাঁক থেকে একটা মাছের কাঁটা টেনে বের করার চেষ্টা করতে করতে বলল, তবে দীনু পাইক আসায় সত্যরামের বাজার খারাপ। কর্তাবাবু দীনুকে চোখে হারাচ্ছেন আজকাল।

কথা সকলের মনে ধরল। তারা কেউ সত্যরামের পেয়ারের লোক নয়। সত্যরামকে তারা কখনো ঘাঁটায় না এবং মুখে যথেষ্ট খাতির দেখায়। নইলে সত্যরাম যেদিন খুশি ঘাড় ধরে যে—কাউকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। দিয়েছেও কতককে। তবে তারা ছ—জন যে টিকে আছে তার কারণ, তারা কাজের লোক, প্রাণপণে খাটে।

পানু মাথা নেড়ে বলল, কথাটা বড়ো ভয়ের হল।

বলাই বলল, কেন ভয়ের কী? দিক না বন্দুকটা সত্যরামের ইয়েতে ঢুকিয়ে। আমি তো হরির লুট দেব।

পানু লেবুপাতা ডলে শেষ কয়েকটা গরাস গপাগপ মুখে চালান দেওয়ার ফাঁকে বলল, সত্যরামের কিছু হলে দীনু পাইক যদি আমাদের মাথার ওপর বসে তা হলে তো দিনেদুপুরে হাতে মাথা কাটবে।

ফটিক গতকালই সত্যরামের হাতে জুতোপেটা হয়েছে হাট থেকে তামাক আনেনি বলে। সে বলল, আগে তো সত্যরামের ব্যবস্থা হোক পরে দীনুকে নিয়ে ভাবা যাবে।

কেষ্ট এতক্ষণ কিছু বলেনি। একটা মস্ত লঙ্কা নুনে মেখে একটু একটু করে খেয়ে শিসোচ্ছিল। লঙ্কায় আর একখানা চাটন দিয়ে বলল, খবর তো রাখো না। দীনু পাইক এমনি আসেনি। খবর হয়েছে এ বাড়িতে ডাকাত পড়বে। এত টাকা, ডাকাত না পড়ে পারে!

পাঁচুর সঙ্গে শ্রীপতি এতক্ষণ নীচু গলায় দাক্ষী নামে একটা নতুন ঝিকে নিয়ে রসের কথা বলছিল। দাক্ষীর বয়স কাঁচা, দেখতেও ভালো। পাঁচু আর শ্রীপতিরও বয়স কম। দাক্ষী অন্দরমহলের ঝি। বাইরে বড়ো একটা

আসে না। তবে দোতলার জানালা বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বেপর্দা হাঁ করে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। পাঁচুর সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে। মেয়েটার ভাইয়ের বড়ো অসুখ। টিবি। সারাক্ষণ ভাইটার কথা ভাবে। পাঁচু বলল, কিছু টাকা জমলে ভাবছি ওকে দেব।

শ্রীপতি মুখখানা উদাস করে বলল, ও টাকায় কী হবে? ক—টাকাই বা তুই পাস? ও টাকা তো সাগরে শিশির। অত মজে যাস না বাপ। সত্যরাম টের পেলে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।

সবাই যে যার থালা নিয়ে গিয়ে পুকুরধারে মাজতে বসল।

খেয়ে উঠে পানু একটু চিন্তিতভাবে ঘরে এল। দীনু পাইককে নিয়ে তার কেন যেন খুব চিন্তা হচ্ছে।

যদিও কোনোদিন কথাবার্তা হয়নি বা এমনকী চোখাচোখিও ভালো করে নয় এবং তার নামও যদিও তিনি জানেন না তবু যতীনবাবুর প্রতি একটা দুর্বলতা আছে পানুর। শত হলেও মনিব। খুব ইচ্ছে হয় পানুর, একদিন গিয়ে যতীনবাবুকে বলে, আজ্ঞে আমি আপনার চাকর, আমার নাম পানু।

যতীনবাবু হয়তো ভারি অবাক হয়ে বললেন, ও তাই নাকি? বা! বেশ, বেশ।

ওইটুকুই যথেষ্ট। পানু আর বেশি কিছু চায় না। যতীনবাবু কেমন লোক তা জানে না পানু। কেমন আর হবেন, ভালোই হবেন বোধ হয়। ভগবান যাঁকে এমন ঢেলে দেন, লক্ষ্মী যাঁর ঘরে এমন উথালপাথাল তিনি কি আর খারাপ লোক? তা এই যতীনবাবুর জন্য পানুর এখন একটু চিন্তা হচ্ছে। দীনু পাইকের মতো খুনে লোককে নিয়ে ঘোরাফেরা কি ঠিক হচ্ছে কর্তাবাবুর?

বটকেষ্ট কাপালিকের নাম হল গে কালিকানন্দ। তার সাধন—নামে কেউ অবশ্য তাকে ডাকে না। সবাই তার পুরোনো নামই বজায় রখেছে। লোকে বলে, সে তার একটা বউকে কুয়োয় ফেলে মেরেছে, আর একটাকে গলায় ফাঁস দিয়ে। দু—বারই আত্মহত্যা বলে পার পেয়ে যায় বটকেষ্ট। নোনাপুকুরের শ্মশানে এখন তার সাধনপীঠ। খুব রবরবা। লোক যে সুবিধের নয় ঠিকই, কিন্তু পানু এও জানে, লোকে ভালো হলে কাপালিকদের চলে না। দুনিয়ার আর সব লোকের প্রতি পানুর যে মনোভাব, বটকেষ্টর প্রতিও তাই। মনোভাবটা ভয়ের। এ বাড়িতে যখন আসে তখন তার জন্য খাসি কাটা হয়, দিশি মদের বোতল আসে আর বাড়িটা কেমন ছমছম করতে থাকে। করবেই। বটকেষ্টর সঙ্গে দেড়শো ভূত সব সময়ে ঘুরে বেড়ায়। ভূতের গায়ের বোঁটকা গন্ধে বাড়ি একেবারে ম ম করতে থাকে। যতীনবাবু বিশ্বাস করেন, তাঁর যে অবস্থার এত উন্নতি তা ওই বটকেষ্টর জন্য।

তা হবে। পানু অতশত জানে না। কী থেকে কী হয় তা সে কী জানে। বটকেষ্টর ভূতেদেরও সে খুব ভক্তিমান্যি করে এবং ভয় খায়।

খাওয়ার পর তবু উবু হয়ে বসে কুয়োতলার শাওলা ঘষে তুলছিল পানু। শীতকাল। রোদ পশ্চিমে হেলেছে।

সেই রোদে একটা ছায়া পড়ল তার গায়ে।

পানু মুখ তুলে যা দেখল তাতে ফের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। সামনে দীনু পাইক দাঁড়িয়ে। বুকের মধ্যে কেমন একটা গুড়গুড় শব্দ উঠল। হাত—পা সব ঠান্ডা মেরে যেতে লাগল।

দীনু খুব ঠান্ডা গলায় বলল, অ্যাই, তুই গোবরার কানু মণ্ডলের ভাই না?

পানু ভারি চমকে গেল। সে গোবরা গাঁয়ের কানু মণ্ডলের ভাই বটে, কিন্তু সে কথা বেশি লোকে জানে না। জানার কথাও নয়। দীনু পাইকের মতো মস্ত লোকের কানে যে কথাটা গেছে এইতেই সে অবাক। পানু ভারি বিগলিত হয়ে বলল, আজ্ঞে।

তোর নাম পানু?

যে আজ্ঞে।

পানু লক্ষ করল, দীনু পাইকের পরনে একটা ফরসা পায়জামা, গায়ে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি, তার ওপর জহর কোট। আড়েদিঘে আলিসান লোকটা বোধ হয় খালি হাতে মোষের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে। দীনু

পাইক তার বাঘা গলায় গরগর শব্দ তুলে বলল, সেদিন গোবরায় গিয়ে কানু মণ্ডলকে ভয় দেখিয়ে এসেছিস?

পানুর একগাল মাছি। কানুকে কেন, সে তো মশা মাছিকেও ভয় দেখানোর এলেম রাখে না। সবেগে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না।

লোকটা কিছুক্ষণ খুনিয়া চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, কানু মণ্ডল আমার ইয়ার। বুঝেছিস কথাটা?

যে আজ্ঞে।

ওর জমিবাড়ির ওপর তোর কোনো হক নেই। আছে?

পানু সভয়ে মাথা নেড়ে বলল, ভাগ তো চাইনি।

আলবাৎ চেয়েছিস।

আজ্ঞে না।

লোকটা আবার কিছুক্ষণ রক্ত—জল—করা চোখে তাকে ঠান্ডা করে দিয়ে বলল, তা ভালো কথা। সাতদিনের মধ্যে গোবরায় গিয়ে কাগজে সইসাবুদ টিপছাপ দিয়ে আসবি।

খুব ভয়ে ভয়ে পানু জিজ্ঞেস করল, কীসের কাগজপত্র আজ্ঞে?

তোর অত খতেনে কী দরকার? যা বলছি তা—ই করবি। বেশি ট্যাঁ—ফোঁ করলে বিপদ আছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চোখের পলকে দীনু পাইক হাওয়া হয়ে গেল।

পানু তার ভেজা হাতে কপালটা মুছল। দোতলার জানালা থেকে দাক্ষী নামে নতুন ঝিটা তাকে হাঁ করে দেখছে। দেখেছে আরও অনেকেই। দীনু পাইক চলে যাওয়ার পরই পাঁচু, শ্রীপতি, বলাই এসে জুটল।

কী ব্যাপার গো পানুদাদা, দীনু পাইক তোমার ওপর তম্বি করে গেল কেন?

পানু কী আর বলবে, ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছু করিনি,ভাগ টাগও চাইনি।

কীসের ভাগ? কী করোনি?

পানু মাথা নেড়ে বলল, সে অনেক কথা রে ভাই। তবে আমিও ব্যাপারটা ভালো বুঝছি না।

সবাই মিলে ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ তুমুল কথাবার্তা হল। পাঁচু বলল, ও যা বলছে তাই করো গো পানুদা। পৈতৃক প্রাণটার দাম অনেক বেশি।

পানু শুধু বলল, হুঁ।

রাত্রিবেলা পানু ভালো করে খেতে পারল না। এত তেষ্টা পাচ্ছিল যে ঘটি—ঘটি জল খেয়ে খিদের বারোটা বেজে গেল। রাত্রিবেলা ঘুমও হল না ভালো। ঘন ঘন পেচ্ছাপ চেপে যেতে লাগল। দীনু পাইক যে কানুর বন্ধু তা কে জানত। আর কানুই বা কেন দীনুকে তার পেছনে লাগাল তাও বুঝে ওঠা ভার।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল পানু। মাথাটা গরম হয়ে গেল।

সকালবেলায় যতীনবাবু তার পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পানু সে সময়ে পুকুরধারে চাদর কাচছে। এমন সময় সত্যরামের পেয়ারের লোক মুকুন্দ এসে বলল, ওরে তোর তলব হয়েছে।

সত্যরাম তার ঘরে নরম সাদা বিছানায় বসা। দেয়ালে হরেক ক্যালেন্ডার। একখানা পেল্লায় লোহার আলমারি। ইস্তক টেবিল চেয়ার। কে বলবে চাকরের ঘর। তা সে যত বড়ো চাকরই হোক।

তবে কিনা পরিষ্কার ঘরখানা যেমন হাসছে, সত্যরামের মুখে কিন্তু তেমন হাসি হাসি ভাব নেই। ভারি বেজায় মুখ। তাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী রে, ওই ডাকাতটার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল? ষড় করছিস নাকি?

পানু আগাপাশতলা অবাক হয়ে বলল, ষড়? কীসের ষড়? গুন্ডাটা যে আমাকে শাসাচ্ছিল।

শাসাচ্ছিল? কেন রে আহাম্মক, করেছিসটা কী?

সেইটেই তো ভাবছি। ভেবে ভেবে কিছু ঠিক পাচ্ছি না।

খোলসা করে বল।

খোলসা করেই বা বলি কি! কপালটাই আজ্ঞে আমার খারাপ।

দীনু পাইক তো আর যাকে তাকে শাসায় না। তার কাছে তুই তো পিঁপড়ে। কিছু গুরুচরণ করে থাকলে ঝেড়ে কেশে ফ্যাল।

পানু উবু হয়ে বসল। তারপর খানিক ভাবল। পারুল না সটকালে আজ তার তেলকলটার ম্যানেজার হওয়ার কথা। গন্ধবাবু সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সত্যরাম বা দীনু পাইক কেউই তাকে পেত না। স্বয়ং যতীনবাবুর সঙ্গে সে রোজ মুখোমুখি কথা বলতে পারত। কতবড়ো সম্মান!

চোখে জল আসছিল পানুর। মায়ের পেটের ভাই হয়ে কানু কিনা বিনা দোষে পেছনে গুন্ডা লাগাল।

সত্যরাম তার দিকে চোখা নজরে চেয়ে থেকে বলল, দ্যাখ, তোদের কিন্তু আমিই একরকম বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রেখেছি। দোবেলা খেতে জুটছে, ট্যাঁক গরম—করা পয়সা জুটছে এবং আরামে। সাতটা গাঁয়ে ঘুরে দেখে আয় আরে কেউ আছে কি না। তোদের মতো মনিষ্যির পক্ষে কি এটা কম হল?

তা আজ্ঞে ঠিক।

তাই বলছি,ওই ডাকাতটার সঙ্গে ষড় করে আমার পিছনে লাগার মতলব যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আখেরে ভালো হবে না। বেশি কথা কী, কালকেই সকালে বাবুরে বলে ঘাড় ধাক্কা দেবো।

পানু মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে আমি যথার্থই পিঁপড়ে। দীনু পাইক আমার সঙ্গে ষড় করার লোক নয়। তবে আমার ভাই কানুর সঙ্গে ওর ভাব আছে। বোধ হয় মদ বা জুয়ার আড্ডায় ভাব হয়েছিল। তাই আমাকে শাসাচ্ছিল বাপের সম্পত্তি যা আছে সব যেন লেখাপড়া করে কানুকে ছেড়ে দিয়ে আসি।

তোরও আবার বাপের সম্পত্তি আছে নাকি? এ যে গোরুর গাড়ির হেডলাইটের বৃত্তান্ত। তা কত কী আছে?

শুনলে হাসবেন। দেড় বিঘে জমি আর দুটো খোড়ো ঘর।

শুনে কিন্তু সত্যরাম হাসল না। বলল, তা তুই কী বললি ডাকাতটাকে?

কী আর বলব! রাজি হতে হল!

সত্যরাম কথাটা বোধ হয় মনে মনে ওজন করে দেখল। তারপর বলল, তোর বাড়ি তো গোবরায়!

আজ্ঞে, মাইল তিনেক হবে উত্তর দিকে।

চিনি।

আজ্ঞে সবাই চেনে। গোবরার বেগুন খুব নামকরা।

সত্যরাম খিঁচিয়ে উঠে বলল, বেগুনটাই চিনলে! আর কিছু দেখলে না!

কী দেখব আজ্ঞে?

দেখোনি খেতখামারের ওপর দিয়ে আমিনবাবুরা শেকল টেনে মাপজোক করছে।

তা দেখেছি বটে।

আহাম্মক কোথাকার! ওখানে বিরাট কারখানা হবে। জমির দাম হু হু বাড়ছে। চাষের জমি সব গাপ করে বড়ো বড়ো বাড়ি হবে।

পানুর গালে হাত, আজ্ঞে তা তো জানতুম না। কানু বলেওনি।

দেড় বিঘেতে কত কাঠা হয় জানিস?

তা জানি।

এক এক কাঠার দাম যদি ঠেলে দশ হাজারে ওঠে তবে কানুর ট্যাঁকে কত আসবে তার আন্দাজ আছে?

পানুর চোখ কপালে, উরে বাবা!

সাধে কি আর দেড় বিঘের জন্য দীনু পাইক তোকে শাসায়?

গুহ্য কথা আছে না। যতীনবাবু থলিভর্তি টাকা নিয়ে রোজ গোবরায় আনাগোনা করছেন। আজও গেলেন একটু আগে। গোবরায় জমি এখন সোনা।

পানুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। কথা সরছিল না।

সত্যরাম করুণার স্বরে বলল, যা, কাজ করগে যা। ভেবেচিন্তে একটা কিছু মাথায় এলে বলবখন তোকে।

দীনু পাইক যে মোটে সাতদিন সময় দিয়েছে। কাগজপত্র সব তৈরি। গিয়ে টিপছাপটা দিলেও হয়।

সত্যরাম উদার গলায় বলল, জাতসাপে ধরলে তো আর বাঁচন নাই রে। টিপছাপ দিতে হলে দিবি। তবে একেবারে ফাঁকিতে পড়তে যাবি কেন? দু—চার হাজার চেয়ে বসবি।

যদি মারে?

মরবি তো বটেই। তোর আবার ওয়ারিশও নেই যে, তুই মরলে কেউ দাবিদার দাঁড়াবে। নাঃ, তোর কপালটাই খারাপ দেখছি।

পানু উঠল। সত্যরামের মুখচোখে দুশ্চিন্তার ছাপটা তার ভালো লাগবে না।

সত্যরামের যেমনই হোক, পানুর মতো লোকের পুঁটিমাছের পরান তো ওরই হাতের তেলোয় দাপাচ্ছে। মারলে ওই মারবে, রাখলে ওই রাখবে। কিন্তু ওরও যদি বাঁচন মরণের সমস্যা দেখা দেয় তো ঘোর বিপদের কথা।

পানু পুকুরপাড়ে গিয়ে আজ খুব গতর নেড়ে কাপড় কাচল। কাজে মন থাকলে, শরীর ব্যস্ত থাকলে দুশ্চিন্তা একটু কম হয়।

বিকেলের দিকটায় সত্যরামের একটু ছুটি হয়। ঘণ্টাটাক একটু নিজের মনে থাকতে পারে সাঁঝবেলাটায়। সত্যরাম এ সময়ে সিদ্ধি খায় আর শাগরেদদের নিয়ে ঘরে বসে কুটকাচালি করে।

পানু চাদরটা জড়িয়ে বাঁশবন পার হয়ে কালীবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। আরতিটা দেখে আসবে। আর ওই সঙ্গে মায়ের কাছে একটু মানসিকও করে আসবে। সাতে নেই পাঁচে নেই মা, তবে কেন আজ আমার এমন বিপদ!

আনমনা ছিল, তাই লোকটাকে দেখতে পায়নি পানু।

দাদা!

পানুর পিলে কেঁপে গেল। দু—বার 'আঁ আঁ' করল মুখ দিয়ে। পথ আটকে কানু দাঁড়িয়ে।

দাদা, ভয় পেলে নাকি? আরে আমি কানু।

পানুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। বলল, ক্কী? ক্কী? ক্কী চাস তুই?

তোমার সঙ্গে কথা আছে। আড়ালে চল।

পানু মাথা নেড়ে বলল, ও বাবা, আড়ালে আমি যাচ্ছি না।

কানু অবাক হয়ে বলল, অত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক?

পানু দু—পা পিছিয়ে বলল, আমি চললুম। যা বলার চিঠি লিখে জানাস।

কানু বেকুবের মতো দাদার দিকে চেয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার বলো তো! আমি যে ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এলুম।

কী বিপদ?

দীনু গুন্ডা যে আমাকে ভিটেছাড়া করতে চাইছে।

অ্যাঁ। তা সে তোর পেয়ারের লোক, তা—

কী যে বলো দাদা, তার ঠিক নেই। কে কার পেয়ারের লোক? গোবরায় বলে কী সব কলকারখানা হবে টবে, সেই শুনে সবাই জমির দাম বাড়িয়ে বসে আছে। সেই কবে জুয়া খেলতে গিয়ে পঞ্চাশটা টাকা ধার করেছিলুম সেই সুবাদে দীনু শালা গিয়ে নানারকম গাইতে লাগল। তোমার মনিবেরও সাঁট আছে এর মধ্যে।

দীনু কী বলছে?

বলছে, হাজারটা টাকা নগদ দিচ্ছি ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যা। নইলে ঘরে আগুন দিয়ে বেগুনপোড়া করে ছাড়ব। সব তোমাকে বলা যায় না, শালা দীনু আমার কিছু গুপ্ত কথাও জানে। আমার বড়ো খারাপ সময়

পড়েছে।
পানু আতঙ্কিত হয়ে বলল, তা আমার কাছে কেন? আমি কী করব?
বলছিলুম কি এ সময়টায় তুমি যদি তোমার ভাগেরটা না ছাড়ো তাহলে দীনু শালা মুশকিলে পড়বে।
ও বাবা, সাতদিন সময় দিয়েছে। তার মধ্যে লেখাপড়া করে না দিলে ঘাড় নামিয়ে দেবে।
বলো কী, তোমাকেই ধরেছিল এর মধ্যে? তুমি যে আমার দাদা তা তো তার জানার কথা নয়।
পানু বলল, জেনেছে। তা ছাড়া আমাকে তো বলল আমি গিয়ে নাকি তোকে ভাগের জন্য ভয় দেখিয়েছি।
কানু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। বলল, সব্বনাশ। আমার ভরসা তো ছিলে তুমি। এখন তুমিও যদি লিখে দাও তাহলে তো দীনু শালা আমার ঘাড় ধরে আদায় করে নেবে। তোমার কথা গেয়ে একটু ভজঘট পাকানোর তালে ছিলুম যে।
পানু একটু ভাবল। তারপর হালছাড়া গলায় বলল, তা আর কী করা যাবে! প্রাণটা তো আগে। শুনেছি গুন্ডাটা মেলা খুনখারাবি করেছে।
তা করেছে।
ওরকম লোকের সঙ্গে কি লাগা ভালো?
কানু এ কথাটার জবাব দিল না। উবু হয়ে বসে চাদরের খুঁটে চোখ মুছল। বেশ কাহিল দেখাচ্ছিল তাকে। গরগরানিটাও আর নেই। দায় পড়লে মানুষের স্বভাব ভালো হয়ে পড়ে। কানুকেও কেমন যেন ভালোমানুষের মতো দেখাচ্ছে। কেঁদেকেটে চোখ লাল করে ফেলল কানু। তারপর মুখ তুলে ধরা গলায় বলল, মায়ের দিব্যি কেটে বলছি দাদা, যদি দীনু গুন্ডাকে ঠেকাতে পারো তবে জমি বেচে যা পাবো অর্ধেক তোমার। এখনই সাত হাজার করে কাঠায় দর উঠছে। আমাদের জমির পাশ দিয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে বলে দর আরও বেশি।
সত্যরাম বলছিল কাঠা নাকি দশ হাজার।
আর ছ—মাস পরে তাই হবে। যদি ততদিন ধরে রাখা যায়।
পানু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।
বাঁশবনের ভিতরে কুয়াশা আর অন্ধকারে একটু শব্দ উঠল। কে যেন সাবধানী পায়ে আসছে বা যাচ্ছে। বাঁশপাতায় খড়মড় শব্দ উঠছে।
কানু সপাৎ করে উঠে দাঁড়াল।
পানু বলল, কে?
কেন যেন দৌড়ে পালাচ্ছে ওধারে।
কানু সভয়ে বলল, কে গো দাদা?
পানু মাথা নেড়ে বলল, বুঝতে পারছি না। আবছা মনে হল একটা মেয়েছেলে। দাঁড়া, দেখছি।
আমি আর দাঁড়াব না। ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। তার ওপর দীনু শালা দেখতে পেলে বিপদ ঘটাবে। কাল পরশু একবার আসবখন।
কানু চলে গেল।
পানু বাঁশবনের ভিতরে একটু চেয়ে রইল। মরা আলোর ঝুঁঝকো মায়ার ভিতর সে একটা খয়েরি ডুরে শাড়ির আভাস দেখেছে। মেয়েছেলেটা দৌড়ে বেশিদূর যায়নি। কথা শুনছিল আড়ি পেতে। কথা যে শেষ হয়েছে তা জানে না। ফের আসবে।
পানু সন্তর্পণে এগোলো। মস্ত একটা শিমুল গাছ আছে ভিতরবাগে। তার যতদূর ধারণা, ওখানে গা—ঢাকা দিয়েছে।
পানু তাড়াহুড়ো করল না। বরং বেশ গুনগুন করে রামপ্রসাদী ভাঁজতে ভাঁজতে শুঁড়িপথটা ধরে দুলকি চালে এগোল। শিমুল গাছটার ডান ধার বরাবর হয়ে আচমকা গোঁত্তা মেরে ঢুকে গেল বাঁশবনে। তারপর

একদম মুখোমুখি।

মেয়েটা নড়ারও সময় পেলে না। একটু হাঁফাচ্ছিল।

তুমি! অ্যাঁ! তুমি তো দাক্ষী!

বছর সতেরো আঠেরোর মেয়েটা সভয়ে চেয়ে রইল পানুর দিকে।

এখানে কী করছিলে শুনি।

দাক্ষী হাঁফসানো গলায় বলে, কী করব, নিজের ইচ্ছেয় এসেছি নাকি?

তবে?

তোমরা সবাই যাকে ভয় খাও সেই দীনুই তো ধরে এনেছে আমাকে।

ধরে এনেছে মানে?

মানে চুলের মুঠি ধরেই একরকম টেনে বের করে এনেছে। আমার বাবার পেটে লাথি মেরেছিল। কী জানি কেমন আছে বাপটা। ভাইয়ের টিবি বলে বাবা টাকা নিয়েছিল। ধার। শোধ হয়নি।

বটে! তা এখানে কী করছিলে?

রাক্ষসটা যে আমাকে এ বাড়িতে রেখেছে চারদিকে নজর রাখার জন্য। কোথায় টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি, কে কেমন এই সব খবর নিতে। আজ সকালে ডেকে পাঠিয়ে তোমার ওপর নজর রাখতে বলল।

কেন? কেন?

তোমার কাছে কেউ আসে কিনা, কী কথা হয় সব খবর দিতে বলেছে। নইলে তো বুঝতেই পারছ।

পানু ভয়ে এবং শীতে কাঁপছিল। রীতিমতো হি—হি কাঁপুনি। কাঁপা গলাতেই বলল, বড্ড শীত করছে।

আমারও।

তা তোমাকে ধরে এনে ও কী করতে চায়?

মেয়েটা করুণ গলায় বলল, এখনও খারাপ কিছু করেনি। তবে কপালে যা আছে হবে। খারাপই হবে। হয়তো নিজে কিছুদিন কাছে রাখবে, তারপর গোহাটার গোরুর মতো বেচে দেবে। বাজারের মেয়ে হওয়া ছাড়া ভগবান আর আমার কপালে কী লিখেছেন?

ও বাবা!

শোনো। সাঁপুই গাঁ চেনো?

চিনি। কাছেই।

সেখানে গোপাল দাসের বাড়ি। আমার বাবা। কেমন আছে আমার বাপটার একটু খবর এনে দেবে? পেটে লাথিটা লেগে বড়ো কাতরাচ্ছিল।

তে দেখবখন চেষ্টা করে।

যদি এনে দাও খবরটা তা হলে আজকের কথা আমি গুন্ডাটাকে বলব না। বুঝলে?

বুঝেছি।

কানুর মতো এ মেয়েটাও কাঁদল। বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। কাঁদতে কাঁদতে ধরা গলায় বলল, আমি তো গেছিই, নিজের জন্য আর ভাবছি না। বাপটা ভাইটার যে কী হবে।

পানু মৃদু স্বরে বলল, হিম পড়ছে। ঘরে যাও। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে লোকে নানারকম সন্দেহ করতে পারে। যাও।

যাচ্ছি।

মেয়েটা চলে গেলে বাঁশবনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল পানু। হাতপায়ের কাঁপুনি কমেছে, কিন্তু ভয়টা তাঁর শরীরকে একেবারে কাঠ করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পানু নড়তে পারল না।

বাঁশবনের ভিতর দিয়ে কারা আসছে। টর্চ জ্বলছে মাঝে মাঝে। কথা কইছে। যতীনবাবু হবে না। যতীনবাবু তো গেছেন হাওয়াগাড়ি চেপে। তাইতেই ফিরবেন। পানু কয়েক পা এগোল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল।

যতীনবাবুই। সঙ্গে বিভীষণ দীনু পাইক এবং আরও ক—জন। জমিজমা বিষয়—আশয়ের কথাই হচ্ছে।

পানু আর এগোল না। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে এল ঘরে।

ঘটনাটা ঘটল একটু বেশি রাতে। খেতে যাবে বলে ছয় চাকর তৈরি হচ্ছে। পাঁচু গাড়ু নিয়ে মাঠে গেছে। শ্রীপতি রান্নাঘর সেরে এসে হাতমুখ ধুচ্ছে। কেষ্ট টেমির আলোয় গোপালভাঁড় পড়ে শোনাচ্ছে সবাইকে। বেশ ফুর্তির ভাব।

হঠাৎ দীনু এসে ঘরে ঢুকল। বিশাল চেহারাখানা যেন ঘর ভরে দাঁড়াল।

পানুর দিকে রক্ত—জল—করা চোখে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কে এসেছিল তোর কাছে?

পানু থতমত খেয়ে বলল, কই!

জিব টেনে বের করে দেব। কে এসেছিল?

পানুর মাথাটা টাল খেল। দাক্ষীই কি বলে দিল শেষে? কথা দিয়েছিল, বলবে না।

পানু মাটির দিকে চেয়ে বলল, কানু!

বটে! কী পরামর্শ হল ভাইয়ের সঙ্গে?

হঠাৎ পানু একটু হাসল, বলল, দু—ভাইয়ে ঠিক করলুম জমিটা আমরা হাতছাড়া করছি না।

বটে! বলে একটা বাঘ গর্জন ছাড়ল দীনু।

পানু চমকাল না। উঠে দাঁড়াল। দাক্ষী কথা রাখেনি। সেইটে তার বড়ো মনে বাজছে। খিদেটা পেট থেকে খাঁ খাঁ করে উঠে আসছে বুকে। মনে পড়ছে, পারুল তাকে বিয়ে করবে না বলে সটকে পড়েছিল কার সঙ্গে। সব মিলেমিশে আজ পানুর মাথাটা বড়ো গোলমাল।

সে একেবারে সমানে সমানে দীনুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি বড়ো বেচাল লোক হে। বড়ো পাপী। খুন করো, মেয়েমানুষকে ধরে আনো, লোকের জমিজমা কেড়ে নাও...

কথাটা শেষ হল না। দীনু একখানা থাপ্পড় তুলল। একেবারে আকাশসমান উঁচু।

পানু যতীনবাবুর বাড়ির বড়ো বড়ো মশারি আর কাপড় কাচে, খড় কুচোয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কলপাড়ের শ্যাওলা তোলে, জন্মের শোধ ভাতের পাহাড় সাঁদ করায় ভিতরে। তার পা পাকিয়ে দড়ির মতো হয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু ভারি পোক্ত শরীর। শীতে গ্রীষ্মে রোদে জলে একেবারে সই। কোদাল কুড়ুলে তার চমৎকার হাত। মাঝারি মাপের পাটের দড়ি কতবার দায়ের অভাবে টেনে ছিঁড়েছে।

দীনুর চড়টা নামবার আগেই থাবড়াটা পানু কষাল।

সে এমন থাবড়া যা আর কহতব্য নয়।

দীনু পাইক চড়টা নিরীহভাবে নামিয়ে নিজের গালে হাত বোলাতে লাগল অবাক হয়ে। মুখে কথা নেই, এত অবাক।

পানু সমানে সমানে দাঁড়িয়েই রইল। বলল, আমরা বাবুর পেয়ারের চাকর নই, বুঝলে? খেটে খাই। আমাদের প্রাণের ভয় থাকলে চলে না।

দীনু দাঁতে দাঁত ঘষটাল। তারপর পটাং করে গায়ের গরম চাদরখানা খুলে ফেলে দিয়ে দুটো মুগুরের মতো হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল পানুকে।

তারপর কী থেকে যে কী হল পানু তা বলতে পারবে না। কিন্তু লড়াইটা বেশিক্ষণ চলেনি। এক সময়ে সে দেখল, দেখে খুবই অবাক হল যে, সে অর্থাৎ পানু, দীনু পাইককে উপুড় করে ফেলে তার চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা চৌকাঠে ঠুকছে আর বলছে, মর, মর, মরে যা।

শ্রীপতি পাঁচুরা এসে না ছাড়ালে দীনুকে মরতেই হত।

তবে মরার চেয়ে খুব কম হল না। দীনুকে গো—গাড়িতে তিন মাইল দূরের হাসপাতালে পাঠাতে হল রাত্রেই।

চাকরি যাবে। জেলও খাটতে হবে। সবই জানে পানু। ঘরে বসে সে বুটের শব্দের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার চারদিকে পাঁচজন বাইরের চাকর। মুখ গম্ভীর, কথা নেই।

ঠিক এই সময়ে সত্যরামকে সঙ্গে নিয়ে যতীনবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

তটস্থ হয়ে সকলে উঠে দাঁড়াল।

যতীনবাবুর মুখখানা গম্ভীর। সকলের দিকে একে একে চেয়ে দেখে সত্যরামকে জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কোনজন?

আজ্ঞে এই যে। বলে সত্যরাম তাড়াতাড়ি পানুকে দেখিয়ে দিল।

যতীনবাবু কাশ্মীরি শালের ভিতর থেকে তাঁর ডান হাতখানা বের করলেন, ঘরে হারিকেনের আলো, তবে সে আলোতেও হিরের আংটি ঝিকিয়ে উঠল। আর কী ফরসা হাত। সেই হাতে নিজের থুতনিটা খামোখা একটু চুলকোলেন যতীনবাবু। তারপর বললেন, ও। তারপর চারদিকটায় ঘুম—ঘুম চোখে একটু তাকিয়ে নিয়ে সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, এ ঘরটায় একটা বিশ্রী গন্ধ। তাই না?

সত্যরাম বিনয়ের গলায় বলল, আজ্ঞে। তারপর বললেন, আজ বড়ো ঠান্ডা, তাই না সত্যরাম?

আজ্ঞে, বেজায়।

যতীনবাবু যেন কথা খুঁজে পাচ্ছেন না এমনভাবে চারদিকে চাইতে লাগলেন। ঘরখানাই যেন দেখছেন। সামনে ছ—জন বশংবদ চাকর বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে।

যতীনবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, সত্যরাম, ওর নাম কী?

আজ্ঞে, পানু। এমনিতে খারাপ নয়। কাজ ভালোই করে। বিশ্বাসী।

কতদিন আমার কাজ করছে?

আজ্ঞে তা বছর পাঁচেক হবে বোধহয়?

যতীনবাবু একটু কাশলেন। এই সব হীন চাকরদের সঙ্গে তিনি কখনো কথা বলেননি। কীভাবে বলবেন তা বোধহয় ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাই অসহায়ের মতো সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, ওর কি আমাকে কিছু বলার আছে সত্যরাম? ও কথা বলছে না কেন?

সত্যরাম শশব্যস্তে বলল, বলবে আবার কী আজ্ঞে? কথাটথা তো বিশেষ বলতে শেখেনি। ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় খায়। ওরে ও পানু, বাবুকে কিছু বলবি?

পানু মাথা নাড়ল। তার কিছু বলার নেই।

ও কত মাইনে পায় সত্যরাম?

আজ্ঞে, আশি টাকা। এ বাজারে কম নয়। খাওয়া মেলা। হরেদরে পাঁচ সাত শোই পড়ে যায় আজ্ঞে।

যতীনবাবু গলাখাকারি দিয়ে ঘরের চালের দিকে চেয়ে বললেন, পুলিশ অবশ্য আসবে। ও পুলিশকে কী বলবে সত্যরাম?

সত্যরাম শশব্যস্তে পানুর দিকে চেয়ে বলল, ওরে ও ডাকাত,বাবুর কথাটা কানে গেছে না কি?

পানু মাথা নাড়ল। গেছে।

একটা কিছু বলবি তো!

পানু মেঝের দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না।

যতীনবাবু একটা হাই তুলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বাতাসটা কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি কানের ফুটোয় আঙুল দিয়ে একটু নাড়া দিলেন। তারপর পানুর দিকে চেয়ে বললেন, আমার বড়ো বিপদ হে।

পানুর সঙ্গে মনিবের এই প্রথম চোখাচোখি। পানুর অবশ্য ভয়ডর কেটে গেছে। ভক্তিমান্যির ভাবটাও আর নেই। তবে যতীনবাবুর ভয়টা কীসের তা সে ভালো বুঝতে পারল না।

যতীনবাবু তাঁর নাকের ডগাটা চেপে ধরলেন একটু। তারপর বললেন, পুলিশ অনেক কথা জানতে চাইবে বাপু। দীনু যে আমার চাকর ছিল সে কথাটা ওদের বলা ঠিক হবে না। ওর নামে হুলিয়া আছে। তা, ইয়ে, আমি বলছিলুম কী, তোমাকে আমি আমার পাইক করে নিচ্ছি। তিনশো টাকা— কী বলিস রে সত্যরাম, তিনশো কি কম হচ্ছে?

আজ্ঞে না।

আর অন্য সবাইকেও বিশটাকা করে বাড়িয়ে দিস।

যে আজ্ঞে।

যতীনবাবু পানুর দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে আমি দেখব। তুমিও একটু আমাকে দেখো। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে বোলো, দীনুকে এ বাড়িতে কখনো দ্যাখোনি। ও ডাকাতি করতে ঢুকেছিল, তুমি রুখেছ। মনে থাকবে কথাটা?

পানু জবাব দিল না। চেয়ে রইল।

যতীনবাবু আঙুলের হিরের ঝলমলানি তুলে কপাল থেকে একটা মশা তাড়ালেন। কাহিল গলায় বললেন, বটকেষ্ট বলেছিল, দীনুর হাতে কবচ আছে, যমেও নাকি ওর সঙ্গে এঁটে ওঠে না। তা দেখছি তুমি যমের ওপর দিয়ে যাও। আমিও একটু শক্তপোক্ত লোক খুঁজছি। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। টাকাপয়সা নিয়ে চলাফেরার বড়ো বিপদ আজকাল।

জীবনে প্রথম মনিবের সঙ্গে কথা বলল পানু। কিন্তু যেমনটি বলার কথা তেমনটি তার মুখ দিয়ে বেরোল না। পেট থেকে যেন আপনা—আপনিই বেরিয়ে এল আজ্ঞে, বাবুমশাই, চাকর হয়ে আর থাকা চলে না।

যতীনবাবু ভারি অবাক। কেন?

আজ্ঞে, চাকর হয়ে থাকলে নিজেকে ঠিকমতো চেনা যায় না কিনা।

যতীনবাবু একটু অপ্রস্তুত। হিরেসুদ্ধ হাতটা শালে চাপা দিয়ে বললেন, তোমার বোধহয় খুব অযত্ন হয়েছে এ বাড়িতে?

আজ্ঞে, তাতে ভালোই হয়েছে। ভগবান ভালোই করেন। তবে আমার আর চাকর হয়ে থাকতে ইচ্ছে যাচ্ছে না। আমি বাড়ি যাব।

যতীনবাবুর ফরসা মুখটা একটু লাল হল। সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, ওকে পাঁচশো করেই দিস রে সত্যরাম। আর চাকরের মতো নয়, বাড়ির ছেলের মতোই থাকবে।

যে আজ্ঞে।

পানু একটু হাসল, তারপর চাকরের পক্ষে বেমানান গলায় বলল, আজ্ঞে না বাবুমশাই। আপনার অনেক নুন খেয়েছি। পুলিশকে যা বলার বলবখন। ও নিয়ে ভাববেন না। আমার কিছু টাকা জমেছে। দেশে গিয়ে ঘর তুলব। দু—ভাইয়ে থাকব।

যতীনবাবুর হিরে আবার চমকাল। উনি হাঁটু চুলকোলেন।

পানু বলল, টাকাপয়সা নয় বাবুমশাই, তবে একটা জিনিস চাই। দাক্ষী যদি রাজি থাকে তবে ওকে নিয়ে যাব। বে করব।

যতীনবাবু অবাক হয়ে সত্যরামের দিকে তাকালেন, দাক্ষী কে?

নতুন একটা ঝি আজ্ঞে। ভারি কাঁদুনে। সারাদিন কাঁদে।

যতীনবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, একে বিয়ে করতে রাজি হবে?

খুব হবে আজ্ঞে। ওর বাপ রাজি হবে।

ভোরবেলা কুয়াশায় মাখা খেতের ভিতর দিয়ে আগুপিছু দুটি প্রাণী এগিয়ে চলেছে। দু—জনের বগলে পুঁটুলি।

মাঝে মাঝে ফিরে চাইছিল পানু। ছুঁড়িটা পিছিয়ে পড়ছে বারবার।

দাক্ষী চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল লজ্জায়। মরণ! গুন্ডাটা তাকাচ্ছে দেখ, যেন গিলে খাবে।

দু—জনেরই আজ মনে হচ্ছে, আকাশটা কত বড়ো! পৃথিবীটা কী বিশাল! আর বেঁচে থাকাটা কত ভালো!

তৃতীয় পক্ষ

একদম আনকোরা, টাটকা, নতুন বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল কনিষ্ক গুপ্ত। বউয়ের নাম শম্পা। শম্পার সঙ্গে বিয়ের আগে কখনো দেখা হয়নি গুপ্তর। প্রেম—ট্রেমের প্রশ্নই ওঠে না, এমনকী বিয়ের আগে শম্পাকে চোখেও দেখেনি। একটা ফোটোগ্রাফ অবশ্য পাঠিয়েছিল ওরা কিন্তু সেটাও স্পর্শ করেনি।

বিয়ের আগে গুপ্তর একটা প্রেম কেঁচে যায়। সে বিয়ে করতে চেয়েছিল মলি নামে এক স্কুল—শিক্ষিকাকে। মলি দেখতে—শুনতে যাই হোক, স্বভাব যেমন ধারাই হয়ে যাক না কেন, গুপ্ত তাকে ভালোবাসত। মলিরও গুপ্তর প্রতি ভালোবাসার অভাব দেখা যায়নি কখনো।

কিন্তু ঠিক মাসছয়েক আগে এক বিকেলে ভিক্টোরিয়ার বাগানে বসে মলি গুপ্তকে একটা সদ্য চেনা চৌকস ছেলের বিবরণ দিয়েছিল, ছেলেটা নাকি দুর্দান্ত স্মার্ট, আইএএস দিয়েছে এবং নির্ভুল ইংরেজি গড়গড় করে বলতে পারে। গুপ্ত এর কোনোটাই পারে না। সে একটা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক, কিন্তু অধ্যাপনায় তার একদম সুনাম নেই। বরং ছাত্ররা তার ক্লাস কামাই করে, একবার তার বিরুদ্ধে জয়েন্ট পিটিশনও দিয়েছিল অধ্যক্ষের কাছে।

তাই মলির মুখে এক অচেনা ছেলের চৌকসের বিবরণ শুনে সে একটু নার্ভাস হয়ে যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার পছন্দ নয়। কারণ বরাবর গুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেছে।

ইস্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ার সময়ে একবার সে ইস্কুল—স্পোর্টসে নাম দেয়। একশো মিটার দৌড়ে শুরুতে সে বেশ এগিয়ে গিয়েছিল, অন্তত সেকেন্ড প্রাইজটা পেতই। হঠাৎ নিজের এক আশু সাফল্য টের পেল সে। বুঝল, সে সেকেন্ড হতে চলেছে। দৌড় শেষে ফিতেটাও খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু যেই ব্যাপারটা সে টের পেল অমনি তার দুই হাঁটুর একটা হঠাৎ কেন যে আর একটাকে খটাং করে ধাক্কা মারল কে জানে! সেখানেই শেষ নয়। শোধ নিতে অন্য হাঁটুটাও এ হাঁটুকে দিল গুঁতিয়ে। কনিষ্ক গুপ্ত ফিতে ছুঁতে পারল না, দৌড় শেষের কয়েক গজ দূরে নিজের দুই হাঁটুর হাঙ্গামায় জড়িয়ে বস্তার মতো পড়ে গড়াগড়ি খেল।

আর—একবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চোদ্দোশো সাল আবৃত্তি করার সময়ে সে এত চমৎকারভাবে কবিতাটির অন্তর্নিহিত ব্যথা ও বেদনাকে কণ্ঠস্বরে প্রক্ষেপ করেছিল সে নিজেই বুঝেছিল, প্রতিযোগিতায় তার ধারেকাছে কেউ আসতে পারবে না। শ্রোতারাও শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। কবিতার শেষ কয়েকটা লাইনে এসে কনিষ্ক যখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে এক সেট রবীন্দ্র—রচনাবলীর প্রথম পুরস্কারটি তার হাতের নাগালে তখনই হঠাৎ কোথা থেকে এক ভূতুড়ে বিভ্রম এসে তার মাথার ভিতরে জল ঘোলা করে দেয়। শেষ দুটি লাইন একদম মনে পড়ল না। বারকয়েক তোতলাল সে। তারপর নমস্কার করে লজ্জায় রাঙা মুখ নিয়ে উৎসাহের আড়ালে চলে এল। একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছিল সেবার।

বড়ো হওয়ার পর একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রেসের মাঠে গিয়েছিল কনিষ্ক। রেসের কিছুই তার জানা নেই, মহা আনাড়ি যাকে বলে। সে তাই ঠিক করল সবক—টা রেসের দু—নম্বর ঘোড়ার ওপর একটা করে বাজি খেলবে।

প্রথম তিনটে রেসে খেললও দু—নম্বর ঘোড়ায়। তিনটেতেই দু—নম্বর ঘোড়া হেরে গেল। তখন এক বন্ধু বলল কি আনাড়ির মতো পয়সা নষ্ট করেছিস? দেখেশুনে বাছাই ঘোড়ার ওপর খেল!

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল কনিষ্ক। তখন প্রায় পনেরো টাকার মতো লস চলছে। এই দ্বিধাই তার কাল হল। পরের চারটে রেসে সে বাছাই ফেবারিট ঘোড়াগুলোর ওপর বাজি ধরতে লাগল। সব ক—টাতেই হার। কিন্তু শেষ চারটে রেসে প্রতিবার জিতল দু—নম্বর ঘোড়া।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতাকে তাই বড়ো ভয় পায় কনিষ্ক গুপ্ত। মলির মুখে সেই অচেনা পুরুষটির প্রশংসা শুনে সে মনে মনে খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এতকাল মলিকে নিয়ে তার কোনো ভাবনা ছিল না। খুব সহজ ছিল সম্পর্ক।

ব্যাপারটা ভালো করে বোঝাবার জন্য সে পরদিন নিজে থেকেই সেই ছেলেটির প্রসঙ্গ তুলে বলল— মলি, কাল তুমি সুব্রত নামে ছেলেটির কথা বলছিলে তার কথা শুনতে আমার বেশ লাগছিল। কেমন দেখতে বলো তো?

মেয়েরা গন্ধ পায়। মলি একবার সচকিত হয়ে কনিষ্কের দিকে তাকাল। আর মলির সেই সচকিত ভাবটুকু দেখে কনিষ্কও বেশ সচকিত হয়ে ওঠে। মানুষের দুর্বল গোপনীয় কোনো বিষয়ে স্পর্শ হলে মানুষ ওইরকম চমকে ওঠে। কেমন করে। কিন্তু মলির সে ভাবটা বেশিক্ষণ রইল না। আসলে সুব্রতর চালচলনে সে এত বেশি মুগ্ধ হয়েছে যে—সে কথা কাউকে না বলেই বা সে থাকে কী করে?

মলি বলল— দেখতে? ধরো ছ—ফুট লম্বা, ছিপছিপে, রং একটু কালো হলেও মুখখানা ভীষণ চালাক। এত সুন্দর হাসে!

কনিষ্ক নিজে পাঁচ ফুট পাঁচ। রোগা, ফ্যাকাশে এবং ভাবুক ধরনের চেহারা। সে আবার ভীষণ অন্যমনস্কও। প্রায় সময়েই এক কথার আর—এক উত্তর দেয়। মনে মনে নিজের পাশে সুব্রতকে কল্পনা করে সে ঘুমিয়ে গেল।

মলির সঙ্গে সেই থেকে সম্পর্কটা আর স্বাভাবিক রইল না। মাঝখানে এক অচেনা সুব্রত এসে পরদা ফেলে দিল।

পরের এক মাস কনিষ্ক নানা জ্বলুনিতে জ্বলে গেল মনে মনে। তখন প্রায় সময়েই সুব্রতর সঙ্গে প্রোগ্রাম করে। তবে সে একথা বলত— দ্যাখো, হিংসে কোরো না যেন। কোনো পুরুষই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় আমার কাছে।

কিন্তু কনিষ্ক সে কথা মানে কী করে? সে যে অনবরত হীনমন্যতায় ভুগছে।

তাই একদিন সে তার পরিষ্কার গোটা—গোটা হস্তাক্ষরে চিঠি লিখে মলিকে জানিয়ে দিল— আমাদের আর বেশিদূর এগোনো ঠিক নয় মলি। এখানে দাঁড়ি টেনে দেওয়া উচিত।

চিঠি লিখে সে দু—মাসের ছুটি নিয়ে বাইরে গেল বেড়াতে। এতদিনে বাড়ির লেকেরা তার বিয়ে ঠিক করল। মাত্র পনেরো দিন আগে সে সম্পূর্ণ অদেখা, অচেনা, অজানা শম্পাকে বিয়ে করেছে। বলতে কী, শম্পার সঙ্গে তার প্রথম দেখা শুভ দৃষ্টির সময়ে। ভালো করে তাকায়নি কনিষ্ক। তার মনে তখন এক বিদ্রোহ ভাব। সমস্ত পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণা, বিরাগ, ভয়।

গত পনেরো দিন সে যে শম্পার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশেছে তা বলা যায় না। কথাবার্তা হয়েছে, পাশাপাশি এক বিছানায় শুয়েছে, প্রাণপণে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে মেয়েটির প্রতি। কিন্তু তা বলে তার মনে হতাশা ও সন্দেহের ভাবটি যায়নি। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীর সর্বত্র তার চেয়ে বহুগুণে যোগ্যতর লোকেরা ছড়িয়ে আছে। সে একটা হেরো লোক। নিজের সম্পর্কে এইসব জরুরি চিন্তা তাকে এত বেশি ব্যস্ত

রেখেছিল যে তার কাম তিরোহিত হয়, আগ্রহ কমে যেতে থাকে, শম্পা দেখতে কেমন তাও সে বিচার করে দেখেনি।

কনিষ্কর মা আজ সকালে তাকে ডেকে বললেন— খোকা, বউমা, কেন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে রে? তোর কি বউ পছন্দ হয়নি?

কনিষ্ক মুশকিলে পড়ে বলে, তা নয়। আমি তো ভালো ব্যবহারই করি।

—শুধু ভালো ব্যবহারেই কি সব মিটে যায় বাবা? পুরোনো কথা ভুলে এবার নতুন করে সব শুরু করে দাও। যাকে ঘরে এনেছ তার দিকটা এবার দ্যাখো। বউ তো ক্রীতদাসী নয়, তার মনের দিকে নজর দিতে হবে।

—কী করব মা? আমার হইচই ভালো লাগে না।

—হইচই করতে হবে না, আজ বিকেলে বউমাকে নিয়ে বেড়াতে যা। দ্বিরাগমন সেরে আসবার পর দু—জন মিলে তো কোথাও গেলি না দেখলাম।

অনেক ভেবেচিন্তে প্রস্তাবটা গ্রহণ করল কনিষ্ক। আসলে মলি বা সুব্রতর কথা ভাবার কোনো মানেই হয় না। কেননা এই নতুন অবস্থায় সে আর পুরোনো সম্পর্কের মধ্যে ফিরে যেতে পারে না।

সিনেমা দেখার কথা ছিল, কিন্তু টিকিট পাওয়া যায়নি। তাই নিছক ঘুরে বেড়ানোর জন্যই দু—জনে বেরিয়েছে। কথা আছে, আজ রাতে বড়ো কোনো রেস্টুরেন্টে দু—জনে রাতের খাওয়া সেরে একেবারে বাড়ি ফিরবে।

কনিষ্ক ট্যাক্সি নিয়েছিল। টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে খানিক দূর আসতেই শম্পা বলল, শোনো ট্যাক্সিটা এবার ছেড়ে দাও।

—কেন?

—ট্যাক্সি করে আমাদের মতো লোক বেড়াতে যায় না। মধ্যবিত্তরা প্রয়োজনে ট্যাক্সি নেয়। বেড়ানোর জন্য ট্যাক্সি ভালো নয়।

—তবে কীসে যাবে? ট্রামে বাসে যা ভিড়!

—হোক। তবু ভিড় ভালো। কত মানুষ দেখা যায়।

কনিষ্ক নড়েচড়ে বলে, তুমি কি ভিড় পছন্দ করো? আমি করি না।

—ভিড় নয়, তবে মানুষ পছন্দ করি। ট্যাক্সির ভিতরে নিঝুম হয়ে বসে থাকাটা ভারি একঘেয়ে। কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না।

কনিষ্ক রাসবিহারীর মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে শম্পা বলল, তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে শাশুড়ি মা আমাকে বারণ করেছেন। কিন্তু আমার একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে।

—কী?

—তুমি এত অহংকারী কেন?

—আমি অহংকারী?

—নয়?

কনিষ্ক অবাক হয়ে বলে— মোটেই নয় শম্পা। বরং আমি ঠিক উলটোটাই সব সময়ে ভাবি। আমার মনে হয়, আমি বড়ো অপদার্থ পুরুষ।

—সে কী! কেন?

—আমি তো তেমন স্মার্ট নই। লম্বা—চওড়া নই। আমার ভিতরে হাজার রকমের ডেফিসিয়েন্সি।

শম্পা খুব খিলখিলিয়ে হাসে। বলে— তাই নাকি! তাহলে তো তোমাকে বিয়ে করাটা মস্ত ভুল হল!

—হলই তো।

—শোনো। ভাবতে গেলে, আমারও হাজারটা ডেফিসিয়েন্সি। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকলে তো জীবনটাই তেতো হয়ে গেল।

শীতকালের বেলা। ক্রিসমাসের ছুটি চলছে। হাজারটা লোক বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। অপরাহ্ণের কোমল কবোষ্ণ রোদে আর ছায়ায় অপরূপ হয়ে আছে পথঘাট।

এই আলোয় আজ কনিষ্ক শম্পার মুখশ্রী খুব অকপট চোখে দেখল। তুলনা করে নম্বর দিলে মলি আর শম্পা প্রায় সমান—সমান নম্বর পাবে। শম্পার তুলনায় মলি কিছু লম্বা ছিল, কিন্তু সেইরকম আবার মলির চেয়ে শম্পা ফরসা। মলির শরীরে কিছু বাড়তি মেদ ছিল বলে পেটে ভাঁজ পড়ত। শম্পার সেসব নেই মলির মুখখানা ছিল গোল ধরনের। শম্পার মুখ লম্বাটে, লাবণ্য শম্পারই বেশি কারণ সে বয়সে মলির চেয়ে কম করে পাঁচ বছরের ছোটো। বিএ পরীক্ষা দিয়েই তার বিয়ে হয়েছে।

কনিষ্কর কথাটা ভালো লাগল। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকাটা কাজের কথা নয়।

সে বলে, আমাকে তোমার কেমন লাগে?

—আগে বলো, আমাকে তোমার কেমন?

—শোনো শম্পা, তোমাকে কেমন লাগে তা আমি এখনও ভেবেই দেখিনি।

আচমকা শম্পা বলে— মলিকে তোমার কেমন লাগত?

কনিষ্ক থমকে যায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে, তুমি জানলে কী করে?

—তোমার মা বলেছেন।

—মা?

—মা সব বলে দিয়েছেন আমাকে। আরও বলেছেন, আমি যেন এসব তোমাকে জিজ্ঞেস না করি।

শ্বাস ফেলে কনিষ্ক বলে, জিজ্ঞেস করে ভালোই করেছ। মলিকে আমার ভালোই লাগত। শুধু শেষদিকে—

শম্পার মুখখানা ভার হয়ে গেল। কনিষ্কর মুখচোখও লাল দেখাচ্ছে। সে বড়ো অস্বস্তি বোধ করে বলে, এসব কথা কি ভালো?

শম্পা বলে— ভালো নয়। কিন্তু আমাদের দু—জনের সম্পর্কের মধ্যে যদি তৃতীয় কোনো লোক নাক গলায় তবে সেই তৃতীয় লোকটাকে জেনে রাখা দরকার।

অবাক হয়ে কনিষ্ক বলে— তুমি তো ভীষণ বুদ্ধিমতী। এত গুছিয়ে কথা বলো কী করে? মাথায় আসে?

শম্পার ভার মুখ হালকা হয়ে গেল। হেসে বলে— যাঃ।

—সত্যি বলছি, তুমি খুব ভালো কথা বলতে পারো। আমি পারি না।

শম্পা বলে, বাপের বাড়িতে আমাকে সবাই কটকটি বলে ডাকত। আমি নাকি ভীষণ কটকট করে কথা বলি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দেশপ্রিয় পার্ক বরাবর এসে গেল। গলার স্কার্ফটি ভালো করে জড়িয়ে শম্পা বলে— একটু চা খেতে পারলে বেশ হত। আজ যা শীত।

কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট। কিন্তু আজ ছুটির দিন সেখানে বেশ ভিড়। বসার জায়গা নেই।

কনিষ্ক বলে— আর একটু হাঁটি চলো। পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে একটু এগোলে বোধহয় গাছতলায় একটা দেশওয়ালি চায়ের দোকান পাওয়া যাবে।

তাই হল। গাছতলার দোকানদার দু—ভাঁড় চা বড়ো যত্নে এগিয়ে দেয়। শম্পা আর কনিষ্ক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চুমুক দেয়।

কনিষ্ক বলে— কেমন?

—বেশ গো।

কনিষ্ক খুশি হয়ে পয়সা মিটিয়ে দেয়। বলে— খিদে পেয়েছে নাকি? কিছু খাবে?

—কে খাওয়াবে? আমার তো পোড়া কপাল, কেউ পছন্দ করে না।

কনিষ্ক হেসে বলে— কটকটি, এবার কিন্তু কথা ফেইল করলে।
—কেন?
—যে চা খাওয়াল সেই খাবার খাওয়াতে পারে। আর কে খাওয়াবে?
—মলির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হল কেন? হঠাৎ শম্পা প্রশ্ন করে।
—ঝগড়া! না, ঝগড়া হয়নি তো। ও একটা ছেলের খুব প্রশংসা করত। সেটা আমার সহ্য হত না।
—ওমা! তাই নাকি? এসব তো মা আমাকে বলেনি!
—মা জানবে কী করে? কনিষ্ক গুপ্ত বলে— মা শুধু জানত, মলির সঙ্গে আমার ভাব।
—এখন তুমি মলির কথা খুব ভাবো না? ভাবো, আমার মতো একটা বিচ্ছিরি মেয়ের সঙ্গে কেমন হট করে বিয়ে হয়ে গেল। সারাটা জীবন কেমন ব্যর্থতায় কাটবে।
কনিষ্ক খুব হতাশার ভাব করে বলে, কতগুলো ভাবনা আছে যা তাড়ানো যায় না। বিরহ ভোলা যায়, কিন্তু অপমান কি সহজে ভোলে মানুষ? কিংবা ঈর্ষা? হীনমন্যতা?
শম্পা মুখখানা করুণ করে বলে, আমাকে একটা কথা বলতে দেবে? ধরো আজ তোমার কাছে আমার খুব একটা দাম নেই। তুমি ভালোবাসতে পারছ না আমাকে। অথচ আমি তোমার কাছে কত সহজলভ্য। কিন্তু দ্যাখো, সুজন নামে একটা ছেলে আছে। তার কাছে শম্পাই হল আকাশ—পাতাল জোড়া চিন্তা। শম্পার জন্য কী জানি সে হয়তো আত্মহত্যার কথা ভাবে। পৃথিবীতে শম্পা ছাড়া বেঁচে থাকা কত কষ্টের সে জানে একমাত্র সুজন। তুমি তো কখনো জানবে না, বুঝবে না। পৃথিবীটা ঠিক এরকম নিষ্ঠুর।
চোয়াল কঠিন করে কনিষ্ক বলে, সুজন কে?
—সে একটা ছেলে। আমাকে ভালোবাসত। কোনোদিন তাকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু আজ অনাদরের মাঝখানে থেকে তার কথা খুব মনে হয়।
কনিষ্ক স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে।

সেই রাতে শম্পা আর কনিষ্কর ভালোবাসার মাঝখানে অনেকবার মলি এসে হানা দিল, এল সুজনও। দু—জনে এসে এক অদৃশ্য প্রজাপতির দুটি ডানার মতো কাঁপতে লাগল। তাতে বড়ো সুন্দর হল কনিষ্ক ও শম্পার ভালোবাসার নিরালা ঘরটি।

প্রিয় মধুবন

মাথা অনেক শূন্য লাগছে আজকাল। অনেক বেশি শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর। মাঝে মাঝে শুধু একটি কি দুটি শালিক কি চড়ুইয়ের আনাগোনা। এরকম ভালো। এরকম থাকা ভালো। আমি জানি।

কালকেও আমার কাছে একখানা বেনামি চিঠি এসেছে। তাতে লেখা 'বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে!' লাল কালিতে লেখা চিঠি। নাম সই নেই, তবু আমি হাতের লেখা চিনি। লিখেছে কুণাল মিত্র। আমার বন্ধু। এখনও বোধহয় ফেরারি। প্রায় দশ বছর তার খোঁজ জানি না।

আমাদের ডাকঘরগুলির কাজে বড়ো হেলাফেলা। চিঠির ওপর ঠিকঠাক মোহরের ছাপ পড়েনি। আমি কাল সারাদিন আতস কাচ নিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম। না, কোথা থেকে যে চিঠিটা ডাকে দেওয়া হয়েছে তা পড়াই গেল না। জানি যেখান থেকেই দেওয়া হোক ডাকে, কুণাল আর সেখানে নেই। সে সরে গেছে অন্য জায়গায়। রমতা যোগীর মতো ফিরছে কুণাল, কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাচ্ছে! তবু বড়ো ইচ্ছে করছিল কুণাল কোথায় আছে তা জানতে।

কাল বিকেলের দিকে আলো কমে এলে আমি আতস কাচ নামিয়ে রাখলাম। মাথা ধরে গিয়েছিল সারাদিন আতস কাচের ব্যবহারে। তাই চোখ ঢেকে বসেছিলাম অনেকক্ষণ! ভুল হয়েছিল। সে তো ঠিক চোখ—ঢাকা নয়! টের পেলাম দুটি হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়ে নামছে চোখের জল।

বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে। এ আমারই কথা। কুণাল কেবল কথাটা ফিরিয়ে দিয়েছে। যেন ওর কথার আড়াল উঁকি মারছে তার সকৌতুক দয়াহীন মুখ— রাস্তা তুমিই দেখিয়েছিলে, ঘর থেকে বের করে এনেছিলে তুমিই। তারপর সরে গেছ কোথায়! এখন কার এঁটো চেটে বেড়াচ্ছ মধুবন? তোমার ঘেন্না করে না?

চমৎকার এইসব শব্দভেদী বাণ কুণালের। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই। প্রতিদিন পালটে যাচ্ছে তার ঠিকানা। আর আমি মধুবন— আমি বাঁধা পড়েছি স্থায়ী ঠিকানায়। কুণাল হয়ে গেছে ছায়া কিংবা মায়া। আমি এখন কোথায় পাব তাকে? এ চিঠির তাই জবাব দেওয়ার দায় নেই।

কাল সন্ধেবেলায় আমি ঘরের আলো জ্বালিনি। কুণালের চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। আমার বুকের মধ্যে টিকটিকির বাসা। ঘর ছাড়ার কথা মনে হলেই সে ডাক দেয় টিকটিক টিকটিক। যেয়ো না। যাব না তা আমি জানি। তবু চোখের জলে আমার দু—হাতের আঙুল ভিজে গিয়েছিল। নিজের জন্য নয়, আমি কুণালের জন্য কেঁদেছিলাম। তারপর ফাঁকা একখানা ঘরের মতোই শূন্য হয়ে গেল মাথা। মাঝে মাঝে একটি দুটি শালিক কি চড়ুইয়ের মতো ভাবনা ও স্মৃতি আনাগোনা করে গেল।

অনেকক্ষণ আমার বাইরের কোনো জ্ঞান ছিল না। তারপর আমার বউ সোনা আমাকে ডাকল, 'রাজা, একটু এ—ঘরে এসো।'

গিয়ে দেখি সে কাপড় পালটাচ্ছে। বলল, 'দেখো, আমি তোমাকে সারাদিন একটুও জ্বালাইনি। তবু এখন জিজ্ঞাসা করছি ও চিঠিটা কার? সারাদিন তুমি ওটা নিয়ে বসে আছ?' আমি চিঠিটা এনে তার হাতে দিলাম।

ও দেখল। তারপর অবহেলায় চিঠিটা টেবিলের ওপর ফেলে গিয়ে বলল, 'দ্যাখো কী বিচ্ছিরি ব্লাউজ পরেছি। পিছনদিকে বোতাম ঘর। কিছুতেই আটকাতে পারছি না, তুমি একটু বোতাম এঁটে দাও না।'

তখন সোনার সাজ আমি লক্ষ করলাম। কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা একটা ব্লাউজ পরেছে সে, গলায় আর হাতে পাতলা লেস—এর ফ্রিল দেওয়া। ব্লাউজটা আরও কয়েকদিন ধরে পরতে দেখেছি। কোনোদিনই বোতাম এঁটে দেওয়ার জন্য ডাক পড়েনি। তাই মৃদু হেসে আমি ওর পিঠের দিকে বোতাম আর হুকগুলো লাগিয়ে দিলাম।

ও আস্তে করে বলল, 'ইস, কী ঠান্ডা হাত!'

'ঠান্ডা!' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কই!' বলে হাত দুটো ওর গালে রাখলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোনা বলল, 'না সে ঠান্ডা নয়! নিস্পৃহতার কথা বলছিলাম।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সোনা ধীরে ধীরে আঁচল তুলে দিচ্ছিল শরীরে। হঠাৎ মুখ এগিয়ে বলল, 'আদর!'

তক্ষুনি কুণালের চিঠিটার কথা একদম ভুল হয়ে গেল।

সোনার ব্লাউজের বোতাম আর হুকগুলো আর—একবার লাগিয়ে দিতে হল আমাকে। তারপর সোনা টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে বলল, 'লাল কালিতে লেখা এই দেড় লাইনের চিঠিটা নিয়ে এখন আমরা কী করব? বাঁধিয়ে রাখব?'

হেসে বললাম, 'ঠাট্টাটা আমাকেই লাগল, সোনা। চিঠির ও কথাগুলো একদিন আমিই বলতাম। বহুদিন পর অনেক খুঁজে খুঁজে আমার কাছে ফিরে এসেছে আমারই কথা।'

ও ভ্রূ কুঁচকে চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এটা কি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য?'

'না, না!' আমি মাথা নেড়ে হেসে উঠি, 'ওটা এমনিই, ঠাট্টার ছলেই আমার কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া।'

সামান্য দ্বিধা করে সোনা বলল, 'চিঠিটার নাম—সই নেই। তবু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একে জানো। কে?'

একটু ভেবে বললাম, 'ও বোধহয় আমারই এক সত্তা। অতীত থেকে লিখে পাঠাচ্ছে।'

'কবিতা!' সোনা হেসে বলল, 'এ কবিতা হয়ে গেল, রাজা।' হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তো তোমার কাছে শুনেছিলাম যে আমি তোমার এক সত্তা। তোমার এরকম আর ক—টা সত্তা আছে, রাজা?'

হিংসুক। সোনা ভীষণ হিংসুক। ঘরে ওর রাজতন্ত্র। আমি ওর রাজা। ওকে এখন কিছুতেই বোঝানো যায় না যে একদিন আমি কুণালের ছিলাম প্রিয় মধুবন।

না, কুণালের প্রিয় মধুবন হওয়ার জন্য আর—একবার পিছু—হাঁটার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। এখন আমি বেশ আছি। ফাঁকা, খোলামেলা শান্ত একটি ঘরের মতো শূন্য মাথা। মাঝে মাঝে এক—আধটা শালিক কী চড়ুইয়ের আনাগোনা। এক—আধটা স্মৃতি। তার চেয়ে বেশি কী দরকার। এখন আমার আলো বাতাস ভালো লাগে, ছুটির দিন ভালো লাগে, অবসর আমার বড়ো প্রিয়। আমার প্রিয় সেলাই—কলের আওয়াজ, আমার শিশুছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। আর বুকের মধ্যে সেই টিকটিকির ডাক। যেয়ো না। যেয়ো না।

তবু মাঝে মাঝে যখন ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় চলি তখন হঠাৎ বড়ো দিশেহারা লাগে। কিংবা যখন মাঝরাতে হঠাৎ কখনো ঘুম ভেঙে যায় তখন লক্ষ করে দেখি পাথর হয়ে জমে আছে আমার অনেক আক্ষেপ। আয়নায়

নিজের মুখ দেখে কখনো চমকে উঠি। মনে কয়েকটা কথা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কোনো অলীক শূন্য থেকে এসে পড়ে। তুমি যে এসেছিলে কেউ তা জানলই না। হায়, মধুবন!

সত্য বটে এ সবই আবেগের কথা। নইলে আমার মনে স্পষ্ট কোনো আক্ষেপ নেই। না আছে পিছু—হাঁটার টান। খুব একটা স্মৃতিচারণও নেই আমার। মাঝে মাঝে সোনা যখন আমাদের ছেলেটাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যায়, বা বাপের বাড়িতে থেকে আসে একটি দুটি দিন, তখন কখনো—সখনো সন্ধেবেলায় বা রাত্রে আমি ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। একটি—দুটি কথা অন্ধকারে মশা ওড়ার শব্দের মতো অন্ধকারে গুন গুন করে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাচ্চচা ছেলেটার কান্নার শব্দ মনে মনে ডেকে আনি, সোনার গলার স্বরের জন্য নিস্তব্ধতার কাছে কান পেতে রাখি। আস্তে আস্তে সব আবার ঠিক হয়ে যায়। যদি কখনো হঠাৎ মনে হয় যে এরকম শান্ত জীবন হওয়ার কথা ছিল না আমার, আরও দূরতর, ভিন্ন অনিশ্চয় এক জীবন আমার হতে পারত, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি হাতের কাছে যা পাই— হয়তো ওষুধের শিশি, ফাউন্টেন পেন কিংবা অন্য কিছু না পেলে হাতের আংটির পাথরের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মনকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসি। অতীত এবং ভবিষ্যৎ থেকে ফিরিয়ে নিই আমার মুখ। আস্তে আস্তে বলি, এরকমই ভালো। এরকম থাকাই আমাদের ভালো। তখন মাথা অনেক শূন্য লাগে। অনেক বেশি শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর।

অনেকদিন আগে কুণালের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হওয়ার কিছু পরে ওইরকম লাল কালিতে লেখা বেনামি আর—একখানা চিঠি এসেছিল আমার সঠিক ঠিকানায়। তাতে লেখা 'জীবনে সৎ হওয়াই সব হওয়া নয়! আদর্শই সব! আদর্শ না থাকলে পুরোপুরি সৎ হওয়াও যায় না!' প্রতিটি বাক্যের পর একটি করে বিস্ময়ের চিহ্ন। আসলে ওগুলো সকথিত জিজ্ঞাসা। ছুঁচের মুখের মতো ওই চিহ্নগুলো আমাকে বিঁধেছিল। আমারই বলা কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া। সেই তার প্রথম বেনামা চিঠি। তারপর আমার বিয়ের কিছু পরে আরও একখানা। এইরকম : 'বৃষ্টি হলেই মিছিল ভেঙে যাবে! দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে গাছতলায়। মাথা বাঁচাতে।' কী জানি সে গাছতলায় বলতে এক্ষেত্রে ছাদনাতলায় বুঝিয়েছিল কি না। চিঠিটা আমি সোনাকে দেখাইনি। শুধু মনে মনে বুঝতে পেরেছিলাম, সে আমার সব খবর রাখে, হদিশ রাখে সঠিক ঠিকানার। সে আমাকে ভোলেনি। সামান্য ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। কী জানি, আমি তাকে আরও কত কী শিখিয়েছিলাম। সে যদি সব মনে রেখে থাকে। তারপর ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম যে তা নয়। এ তার আমাকে নিয়ে খেলা। আসলে পুরোনো পুতুলের মতো ভেঙে সে আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবন থেকে। মাঝে মাঝে সে কেবল দূর থেকে আমাকে ওইভাবে স্পর্শ করে দেখতে চায় আমি কতটা চমকে উঠি।

বলতেই হয় খেলাটা চমৎকার শিখেছে কুণাল। সে খেলতে জানে। গতকাল আমি সামান্য অন্যরকম হয়ে গেলাম। আজ সকালে তাই আমার মুখের দিকে ঘুমচোখে চেয়ে সোনা প্রথম প্রমাণ করল, 'আজও ওই ভূতুড়ে চিঠিটার কথা ভাবছ।' চমকে উঠলাম। বস্তুত তা নয়। চিঠিটার কথা আমি ভাবছিলাম না, কুণালের কথাও না।

হেসে বললাম, 'দুর।'

সোনা হাসল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ করে ছেলের কাঁথা বিছানা গুটিয়ে রাখল, মশারি চালি করল, তারপর এক সময়ে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'কেন ভোরে উঠে জানলার কাছে বসে আছ। এত সকালে ওঠা বুঝি তোমার অভ্যাস।'

সে কথা ঠিক। ভোরে ওঠা আমার অভ্যাস নয়। কেন যে আজ অত ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কে জানে। তারপর আর ঘুম আসছিল না। শীতকাল, তবু লেপের ওম ছেড়ে উঠে গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে এসে আমি জানলার ধারে বসলাম। খুব কুয়াশা ছিল, জানালার নীচের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল আবছায়ায় নিঃশব্দে নদী বয়ে যাচ্ছে। আর দূরের কলকাতা খুব উঁচু গাছের অরণ্যের মতো জমে আছে হিমে। সিগারেট ধরাতেই

একটি—দুটি পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে সেগুলো ঠেকানোর চেষ্টা করছিলাম। ঠেকানো গেল না। খুব ভোরে একদিন এক আশ্রমের ঋত্বিককে দেখেছিলাম ডান হাতখানি ওপরে তুলে চোখ বুজে আহ্বানী উচ্চচারণ করতে 'তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান পুরুষ, ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত, যদবিদা চরণে তদুপসানাতেই ব্রতী হই। জাগ্রত হও, আগমন করো। আমরা যেন একেই অভিগমন করি...।' গান নয়, শুধু টেনে—টেনে উচ্চচারণ করে যাওয়া। কবেকার কথা। তবু গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা যেন একেই অভিগমন করি। ভোরের শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমার মনে হয়েছিল— হায়, মধুবন! হায়, কুণাল!

আমি আমার আংটির মদরঙের গোমেদ পাথরটার দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আবছা অন্ধকারেও পাথরটা চিকমিক করছিল। আমি আস্তে আস্তে আংটির গোমেদ পাথরটায় আমার মনকে স্থির করার চেষ্টা করছিলাম। তখন হঠাৎ— খোলা জানলা দিয়ে যেমন ঘরের মধ্যে আসে পোকামাকড়— তেমনি হঠাৎ অনেকদিন আগে শোনা কয়েকটা শব্দ বিদ্যুৎবেগে আমার মধ্যে খেলা করে গেল। প্রথমে আমি কিছুক্ষণ ভেবেই পেলাম না এই শব্দগুলি কী, কিংবা কোথা থেকে এল চেনা শব্দ। বড়ো চেনা। কয়েকটি মুহূর্তের পর মনে পড়ে গেল, এ আমার বীজমন্ত্র নাম, কৈশোরে শেখা। এতকাল বীজমন্ত্রের শব্দগুলি নিয়ে মনে মনে খেলা করতে করতে সেই কৈশোরের ধ্যান অভ্যাস করার কথা মনে পড়েছিল। একটা সাদা—কালো চক্রের ছবির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতাম। তারপর চোখ বুজতেই সেই চক্রটা অমনি চলে আসত দুই ভ্রূর মাঝখানে, নাসিকার মূলে যাকে বলা হয় আজ্ঞাচক্র। অনেক শিখেছিলাম আমি। পইতের পর আমাকে শিখতে হয়েছিল পুজো পাঠ আহ্নিক। দণ্ডী ঘরে কয়েকটা কষ্টের দিন কেটেছিল, যার মধ্যে চুরি করে খেয়েছিলাম রসগোল্লা। মনে পড়ে এক শীতের খুব ভোরে দণ্ডী ভাসাতে যাচ্ছি ব্রহ্মপুত্রে, সঙ্গে জ্ঞাতিভাই তারাপ্রসাদ। হাফপ্যান্ট পরা তারাপ্রসাদ নদীর উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। আমি তার দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ঢালু বেয়ে জলের কাছে নেমে গেলাম। আমার পায়ে লেগে একটা মাটির ঢেলা আস্তে গড়িয়ে গিয়ে টুপ করে জলে ডুবে গেল। বিবর্ণ মেটে রঙের জলে ভেসে যাচ্ছিল আমার গেরুয়া ঝোলা আর লাঠি। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম মাথার ওপর ফিকে নীল আকাশ, আর চারদিকেই মাটির নরম রং। কোথাও এতটকু আবেগ বা অস্থিরতা নেই। সব শান্ত ও উদাসীন, আর বাতাসে মিশে থাকা সামান্য কুয়াশার মৃদু নীল আভা। জলে আমাকে ঘিরে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙার শব্দ। খুব সামান্য স্রোতে ধীরে ধীরে দুলে দুলে ভেসে যাচ্ছে গেরুয়া ঝোলা সুদ্ধ আমার দণ্ডী। খুব দূরে তখনও নয়। বড়ো অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাকে। যেন ডুবন্ত এক সন্ন্যাসীর গায়ের কাপড় ভেসে যাচ্ছে জলে। মনে হয়েছিল আর দু—এক পা দূরেই রয়েছে জন্ম—মৃত্যু ও জীবনরহস্যের সমাধান। আর মাত্র দু—এক পা দূরে। আমার চারিদিকে বিবর্ণ মাটি রঙের জলস্থল বৈরাগীর হাতের মতো ভিক্ষা চাইছে আমাকে। তার ইচ্ছে হয়েছিল আমার ওই দণ্ডী যতদূর ভেসে যায়, নদীর পাড় ধরে আমি ততদূর হেঁটে যাই। ফিরে গিয়ে কী লাভ? অনেকক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে জলে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে তারাপ্রসাদ আমাকে জোর করে তুলে এনেছিল। তার পরও বহুদিন আমার সেই ঘোর কাটেনি।

সেই কথা মনে পড়তেই আমি প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম আজ ভোরে। বীজমন্ত্রের যে শব্দগুলি মনে এসেছিল আমি সেগুলো নিয়ে খেলা করছিলাম। আর আমার আংটির গোমেদ পাথরটায় স্থির করার চেষ্টা করছিলাম আমার সমস্ত অনুভূতি। বহুদিন বাদে কৈশোরের সেই ধ্যান করার ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল আমাকে।

কুণাল জানে না তার চেয়ে আমি অনেক বেশি ফেরারি।

অফিসে বেরোনোর সময়ে সোনা মনে করিয়ে দিল, 'আজ আমাদের বিয়ের বার্ষিকী। মনে থাকে যেন।'

মনে ছিল না। চার বছর হয়ে গেল। এখন আমার বত্রিশ, আর সোনা বোধহয় আঠাশ পেরিয়ে এল। ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির তলা থেকে সোনাকে একটু দেখলাম, আমার দিকেই চেয়ে আছে। হাসলাম। ও হাসল। পরস্পরকে বোঝার চেনা পুরোনো হাসি। রাস্তার রোদে পা দিতেই সরগরম কলকাতার উত্তপ্ত ভিড়ের মধ্যে মন হালকা হয়ে যাচ্ছিল। একটা বেনামি চিঠির জন্য কাল আমার অফিস কামাই একথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল।

মিডলটন স্ট্রিটে আমার অফিস। দরজায় পা দিতেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ো দারোয়ান, রিসেপশন কাউন্টারের চঞ্চল মেয়েটি মৃদু হেসে নড করল, 'মর্নিং স্যার' বলে, জুনিয়র একটি অফিসার হলের আর—একদিকে চলে গেল। আমি লিফট নিলাম না। অনেকদিন পর একটু হালকা লাগছে আজ। আমি জুতোর শব্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে এলাম আমার চারতলার অফিসে। টাইপিস্টের ঘর থেকে অবিরাম টাইপ মেশিনের শব্দ ভেসে আসছে। আমার ছোটো অফিস ঘরটার বাইরে অপেক্ষা করছে আমার ছোকরা চটপটে স্টেনোগ্রাফার। আমি তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ঢুকে গেলাম ঘরে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঠান্ডা নিস্তব্ধ ছোট্ট ঘরটা আমার। সবুজ কাচে ঢাকা টেবিল, গভীর গদিওয়ালা চেয়ার আর পিছনে প্রকাণ্ড কাচের জানালা। দূরে ময়দানের চেনা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কোট খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি কাচের শার্সি খুলে দিলাম। হু হু করে ঠান্ডা বাতাস বয়ে এল। পাতা—পোড়ানো ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ। উদাস রোদ হাওয়া আর মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ আমি আমার অন্তরে গ্রহণ করে নিচ্ছিলাম। বেশ নিশ্চিন্ত জীবন আমার। একটি—দুটি ছোটোখাটো অভাববোধ এবং কখনো—সখনো সামান্য একটু একঘেয়েমি ছাড়া কোনো গোলমাল নেই। আমি সুখী। একটি ছোটো শ্বাস ছেড়ে আমি চেয়ারে ফিরে এলাম।

দুপুরে হঠাৎ এল সোনার টেলিফোন। তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠে বললাম, 'কী হয়েছে।'

'কই! কিছু না!' বলে ও হাসল, 'তোমাকে উল আনার কথা বলেছিলাম, রাজা! মনে আছে? মনে করিয়ে দিলাম। তোমার কোটের ডানদিকের পকেটে নমুনা দিয়ে দিয়েছি। চার আউন্স এনো।'

'দুর।' আমি পারব না। আবার অফিসের পর দোকানে ছোটাছুটি। তা ছাড়া উলের রং মেলানো বড়ো ঝামেলা।'

'পারবে।' বলে হাসল, 'তুমি না পারলে চলবে কী করে? তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর?'

মৃদু হাসলাম। আমাকে পটাতে সোনা ওস্তাদ।

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ বিকেলের কথা মনে আছে তো?' বলেই আবার হাসি, 'বলো তো আজ কী?'

'আজ?' আমি একটু ভাবনার ভান করে বললাম, 'আজ তো খোকনের জন্মদিন।'

'বদমাশ!'

'তাই না!'

'ঠিক আছে। তাই। শুধু সময়ে এসো।'

তারপর একটু চুপচাপ। টের পেলাম ও ফোন তখনও ছাড়েনি। আমিও ছাড়তে দ্বিধা করছিলাম। তখন হঠাৎ ও বলল, 'রাজা, আমার ফোন পেয়ে তুমি চমকে উঠলে কেন?'

সামান্য গোলমালে পড়ে বললাম, 'কই!'

'ভয় পেয়েছিলে?'

'কীসের ভয়!'

ও হাসে—'কীসের ভয় তার আমি কী জানি! বউ—ছেলে চুরি যাওয়ার ভয় হতে পারে, ঘরে আগুন লাগার ভয় হতে পারে। কত ভয় আছে মানুষের!'

'বদমাশ' বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

সত্য যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। সোনা যেভাবে বলল সেভাবে নয়। তবে অনেকটা ওরকমই অস্পষ্ট একটা ভয়।

বিকেলে আমি অনেক ঘুরে—ঘুরে ওর ফরমাশি উল কিনলাম, আর আজকের দিন উপলক্ষ্যে ওর জন্য কিনলাম কালো জমির ওপর হলুদ আর সুরকি রঙের এমব্রয়ডারি করা একটা কার্ডিগান, কিছু ফুল, গোটা দুই বাংলা উপন্যাস। বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পা দিয়েছি, সে সময়ে— কোথাও কিছু ছিল না— তবু হঠাৎ মনে হল যদি এই অবস্থায় কোনোদিন কুণাল আমাকে দেখে! কে জানে বাইরের এত অচেনা লোকজনের মধ্যে গা—ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ করছে কি না! সে দেখছে তার প্রিয় মধুবনকে। পরনে স্যুট মধুবনের, উলের প্যাকেট, কাগজে মোড়া বউয়ের কার্ডিগান, হাতে ফুল আর উপন্যাস। কী জানি কেমন অস্বস্তি এল মনে, রজনীগন্ধার ডাঁটিতে অকারণে বোকার মতো আমার মুখ আড়াল করলাম।

পরমুহূর্তেই হেসে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম আমি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে কয়েক পলকের জন্য আমার দুর্বলতা এসেছিল।

সন্ধেবেলায় আমাদের অনুষ্ঠান জমল খুব। আমার অনেককালের বন্ধু অতীশ এসেছিল তার বউকে নিয়ে, আরও দু—একজন বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন।

যখন সবাই চলে যাচ্ছে তখন সিঁড়ির গোড়ায় সতীশ আমাকে আলাদা ডেকে নিল, 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার রে? শুনলাম তোর কাছে বেনামা একটা চিঠি এসেছে?'

মাথা নাড়লাম— হ্যাঁ। বললাম, 'কে বলল?'

'তোর বউ।' ও হাসল, 'ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছিল কাল থেকে তুই নাকি কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। কেঁদেছিস।'

হাসলাম, 'দুর।'

অতীশ নীচু গলায় প্রশ্ন করল, 'কে লিখেছে?'

বললাম, কুণাল। কুণাল মিত্র।'

'ও!' বলে ভাবল অতীশ, 'বছরচারেক আগে সে আর—একবার তোকে চিঠি দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। আমার বিয়ের ঠিক পরেই।'

'এবার কী লিখেছে সে?'

আমি বললাম, 'অনেকদিন আগে আমি তাকে শিখিয়েছিলাম : সাবধান! বিপ্লবের পথ কিন্তু কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসীও ফিরে আসে ঘরে! সেই কথাই ফেরত পাঠিয়েছে আমাকে।'

হাসল অতীশ, 'তোকে টিজ করছে, না?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম— হ্যাঁ।

ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতীশ, 'ওর বেশি আর কিছুই কুণালের করার নেই।'

আমি চেয়ে রইলাম অতীশের মুখের দিকে।

অতীশ ম্লান হাসল, 'মধুবন আমি কুণালের খবর রাখি। বছরখনেক আগে তার খবর পেয়েছিলাম। হাওড়া জেলার মফসসলে একটা কারখানায় সে চাকরি করছে। দুঃখে কষ্টে আছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে তোর কাছে আসতে বলেছিলাম। তুই বড়ো চাকরি করিস। সে মাথা নেড়ে জানাল আসবে না। বলেছিল, আমার খবর মধুবনকে দেবেন না। আমি কথা দিয়েছিলাম। আজ কথা ভাঙতে হল মধুবন, নইলে হয়তো তোর শান্তি থাকত না।'

একটু চুপ করে থেকে অতীশ আবার বলল, 'ভাবিস না মধুবন। এইসব ছোটোখাটো চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ওর জীবনে তো আর কিছু এখন করার নেই। ওরই ছেলেপুলে নিয়ে বড়ো সংসার, তোর খোঁজখবর রাখার সময় তেমন নেই। তবু মাঝে মাঝে ওইসব চিঠি পাঠায়, পাঠিয়ে মজা পায়।'

কুণালকে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে অতীশ চলে গেল। আমি নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এলাম। দেখি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সোনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে ফিরে একঝলক হেসে বলল, 'কী গো কুণাল মিত্রের বন্ধু, ভূতপূর্ব বিপ্লবী? এবার একটু হেসে কথা কও।'

হাসলাম। বুঝলাম অতীশ চিঠিটা আন্দাজ করে সোনাকে সব বলে গেছে। তবু কী করে আমি সোনাকে বোঝাব যে আমি এখনও সুখী নই।

কুণাল কতদূর বিপ্লবী ছিল, সঠিক ফেরারি ছিল কি না তা নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি স্বেচ্ছায় সরে এসেছি অনেক দূরে। এখন নিশ্চিন্ত জীবন আমার। তবু মাঝে মাঝে একজন ফেরারির কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে। রাজনীতির জন্য নয়, বিপ্লবের জন্যও নয়, এসব কোনো কিছুর জন্যই এখন আর আমার একটুও ব্যস্ততা নেই। এখন আমার প্রিয়— সেলাইকলের আওয়াজ, আমার শিশু ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। কেবল মাঝে মাঝে এসবের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিমনা হয়ে ভাবতে ভালো লাগে আমারই এক সত্তা পালিয়ে ফিরছে মাঠে জঙ্গলে, খেতে খামারে,পাহাড়ে পর্বতে। কুণালের কথা শুনে তাই আমি একটু খুশি হইনি, অবাকও নয়। আমি তো জানতাম বিপ্লবের পথ গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে। আমি তো তা জানতাম!

রাতে শুয়ে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সোনা বলল, 'কষ্ট পাচ্ছ?'

চমকে উঠে বলি, 'কই! কীসের কষ্ট?'

'আমি জানি। পাচ্ছ।'

'কেন?'

'কী জানি!' বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, বোধহয় তোমার মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছা করে, না? এমন উদ্দেশ্যহীন নিস্তেজ জীবন তোমার ভালো লাগে না। আমি জানি।'

'দুর।' বলে জোরে হেসে উঠলাম। তবু সোনার মুখ সামান্য বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

'বড়ো ভয় করে গো।' ঘুমের আগে আমার আদরে তলিয়ে যেতে—যেতে সোনা বলল। অমনি আমার বুকের মধ্যে টিকটিক টিকটিক। যেয়ো না। যেয়ো না।

নিঃসাড়ে ঘুমের ভান করে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে আমি গভীর রাতে উঠে লেখার টেবিলে ছোটো বাতিটি জ্বেলে বসলাম। কুণালকে একটা চিঠি লেখা দরকার। চেনা কুণালকে নয়। এ আর—এক কুণালকে, যাকে আমি চিনি না।

সারারাত ধরে আমি লিখলাম আমার চিঠি সিগারেটের পর সিগারেট জ্বেলে। তারপর টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ভোরবেলা সোনা আমাকে ডেকে তুলল। তার চোখে—মুখে ভয়, ঠোঁট কাঁপছে কান্নায়, 'কী করছিলে তুমি রাজা? সারারাত... সারারাত ধরে।'

আমি সুন্দর করে হাসলাম। তারপর ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম চিঠিটা। ও প্রথমে বুঝতেই পারল না।

বললাম, 'সারারাত ধরে আমি এ চিঠিটা লিখেছি সোনা। বেনামি একটা চিঠি।

'ওমা!' ও অবাক হয়ে বলল, 'এ তো মাত্র একটা লাইন!'

আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ও শব্দ করে চিঠিটা পড়ল, 'ওরে কুণাল, বনের সন্ন্যাসীর চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি!'

উত্তরের ব্যালকনি

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উলটোদিকের ফুটপাথে বকুলগাছটায় অনেক ফুল এসেছে এবার। ফুলে ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধুলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রং ঘন নীল। পরনে একটা খাকিরঙের ফুলপ্যান্ট— লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে। মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগগে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দু—চারটি সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু—পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিকল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দু—হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে— সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধী জরদা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাতের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফেলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক—ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দেখে। পাগল। তবুও চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা এখনও কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফরসা রং, ভোঁতা নাক, বড়ো চোখ— এইরকম কতকগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল— সেই যোগফলটাই একটা মানুষ— সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ— সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু তুষারের মনে হয়, এখনও অরুণকে চেনা যায়। কিন্তু আসলে বোধহয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে অরুণ ওই গাছতলায় বসে আছে। ওইখানে বসে থেকে থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল— এই সব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে দেখে সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের। তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজ অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম প্রথম তুষার ওই চোখে ঘৃণা, আক্রোশ, প্রতিশোধ— এই সব কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই।

কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনো ভয় নেই।

পাগল মাতাল আর ভূত— অনেক ভয়ের মধ্যে তিনটেয় ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজগিজ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমণ্ডল তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা ঘরে দেখা দেয়।

কোনো পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনো তাকায়নি। এখন তাকায়। ভয় করে না কি? করে। তবু অভ্যাসে মানুষ সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাসমতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। পরপর এক গ্লাস ঠান্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যান্ট শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যাসমতো বলে— সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ লতাপাতা আঁকে। আর আঁকে খোঁপাসুদ্ধ মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালোই। তার আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একই রকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে। সারাদিন।

আজও লম্বা নিম পাতার মতো পাতাওয়ালা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল— স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ওই এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ওইসব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল— বিভোর সোমা জবাব দেয়।

—সামনের বছর স্কুলে ভরতি হবে যখন তখন দেখবে। সময়মতো স্নান খাওয়া, সময়মতো সবকিছু। এইসব তখন চলবে না—

বলতে বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনো কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুলগাছের নিবিড় ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না। কী করে। তবু অভ্যাস। পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ওই বকুলগাছের তলায়। পাঁচবছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ করছে ও। ভয় করলে কী চলে।

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিং থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুল ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছ্যাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধ মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীল মাছি।

ওই ঠোঁট জোড়া ছ—সাত বছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ওই একবার। তাও জোর করে। এখন ওই নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড়ো ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্নাঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম গলায় বলে— ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ওই গাছতলায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চিৎকার করত, আকাশ বাতাসকে গাল দিত। চিৎকার করে হাত তুলে বলত টেলিগ্রাম... টেলিগ্রাম...! তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড়ো অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনো ভালোবাসেনি কল্যাণী, সে ভালোবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার—কল্যাণীর সংসারের দোরগড়ায়। চৌকি দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা—জানালা খুলত না।

—চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার—কল্যাণীর সংসারে দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশি এগোল না। চিৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চচারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল— ওকে কিছু খেতে দিয়ো। সারাদিন বসে থাকে।

—কেন?

—দিয়ো। ও তো কোনো ক্ষতি করে না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন!

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দু—বেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে উড়ে নামে, চেঁচায়, নীল মাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। এক ধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত কুলকুল করে তার মাথার ভিতর বয়ে যায়। চোখ বুজে সে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত— আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে— হাভাতে, পাগল, রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা! কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজ কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়।

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেইসব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে দেওয়া মাছের টুকরা, নিজের ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গত বছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের জুনিয়র থেকে। এখন সে সিনিয়র একজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানির দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানালার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকন্ডিশন করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মতো আবছা দেখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিব। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় প্রায়ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ—আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায় আটকে থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এঘর—ওঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে। কোনো কোনো দিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনো কোনো দিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে! দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইট কাঠ বালি আর নুড়িপাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রিট মিক্সার, ক্রেন হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চচা ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বিমের গায়ে টং—টং করে ছুড়ে মারছে। ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ওই তুচ্ছ শব্দটি— ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম— তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে—ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিক আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইট কাঠ পাথরের স্তূপ। ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ওই শব্দ যেন কখনো শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতকগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে— ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কীসের ছুটি! কেন অবসর! সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা— এ তার ভালোই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়— কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন—তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চচা ছেলে অদৃশ্যে এখনও পাথর ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে।

চৌরঙ্গির ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে— সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফেরা— সেই একঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে— সামনের বাঁদিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাব। কোথায়। তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে মোড়ে এসে যায়। এবার? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনও কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো— লোহার বিমে নুড়ি ছুড়ে মারার শব্দ— তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়— কেবলই মনে হয়— কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবনে।

সে আবার বলে— বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরোনো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার বাড়িটাকে দেখল। কী একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ—সাত বছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরোনো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য কেনা এক প্যাকেট দামি সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরোনো বাড়ির তিন তলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে— এখনও নিনি আছে কি এখানে? আছে তো!

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ—সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখনও আছে কি না সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে—ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে।

চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরিজিতে বলল— কাকে চাই?

তুষার হাসল— চিনতে পারছ না?

নিনি ওপরের দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডানদিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রং মেলেনি। পাঁচ বছরে এইটুকু পালটেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়— আঃ, তুমি কি সেই রকম দুষ্টু আছ। বুড়ো হওনি?

—আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছ কি না! তোমার স্বামী পুত্র হয়নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকে বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উলটে বলল— আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখনও সেন্ট— পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিয়ো আর গিটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল— তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের তীব্র ইচ্ছাটা এখনও অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে! সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামি বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে— এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ওই যে গোপনতার ভান করে দামি বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে নিনি বারবার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত— মনে রেখো এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হয়ো না, হুল্লোড় করো না।

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতায় একটা গৎ গিটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওত পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরে তীব্র ইচ্ছেটা গিটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বিমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ ইচ্ছা আনন্দময় আবরণ উন্মোচন, তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি— থামো, থামো, আমার বড়ো ব্যথা—

তুষার থামে— কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে— এইখানে বড়ো ব্যথা—

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে— গত বছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেন্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সবকিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল, তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটে ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনোন নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরের ব্যালকনি, উলটোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো—মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন এক রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিকল পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচ্ছে।

পুরোনো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। কখনো নির্জন শেক্সপিয়র সরণি, কখনো চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গি রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনও মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে, নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে। তার মন বলছে, এখানে নয় এখানে নয়। চলো সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে। ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভূতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কি চাকরি করতে করতে ক্লান্ত? সে কি সংসারের একঘেয়েমি আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারি বিরক্ত হয় তুষার— কাঁদছ কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না? আমাদের যা স্ট্রেইন হয় তাতে না খেলে চলে না—

কাঁদতে—কাঁদতেই হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী— শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে যাওনি? তোমার ঠোঁটে গালে শার্টে লিপস্টিকের দাগ— তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ— যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেক রাত হল আরও। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুলগাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে — অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কোই হ্যায়।

সে ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল— পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেব। রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয় বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল— তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুলগাছটার তলায় গেল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটুদূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ওইখানে, ওই ব্যালকনিতে মাঝে মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দ্যাখো না? তার বাঁ গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনও মাছির মতো বসে থাকে— দ্যাখো না? এখনও আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনও তেমনি উজ্জ্বল রঙ। চেয়ে দ্যাখো না অরুণ?

পাগল গ্রাহ্য করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল। পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনো গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনো নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছ অরুণ। তোমার মুক্তি নেই?

ডাল তরকারিতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঁঝুকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বিমের গায়ে নুড়ি পাথরের টুং—টুং শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কীসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে— কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে— এসো তো, এসো তো কল্যাণী।

তারপর সে নিজের হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দ্যাখে তুষার, চুমু খায়, তীব্র আগ্রহে রিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে— কেন তোমার জন্যে ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান। আমাকে দিতে পারো তা?

বৃথা। সব শেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু। আর কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভিতরটা ধক ধক করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দু—হাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কীসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা—একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো,তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন হ্যামার। অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে— চলো সমুদ্রে। চলো পাহাড়ে! চলো ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দ্যাখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে সে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চারধারে। অনেক দূর হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। হেঁটে হেঁটে চলে যায় বহু দূর। কী একটা কাজ বাকি রয়ে গেল জীবনে! করা হল না! এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনো বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নীচে বকুলগাছ। তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট—এর মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চচা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাসুদ্ধু একটা মেয়ের মুখ, নীচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিন্ত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে আস্তে বলে— কী করে ঘুমোও?

* * * *

—চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি। এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি। দার্জিলিং শিলং—ও দেখা।

—অন্য কোথাও। অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে মনে মনে, ঠিক জানে— যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে— না নাঃ। বলেই চমকায়। কীসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরি ডিকটেশন দিতে দিতে বলে ওঠে— নাঃ—নাঃ। স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারিদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী একটা ঘিরে আছে চারদিকে। ওটা কী! ওটা কেন! কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপিয়ার সরণি ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে—দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরের কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে— জোরে চালাও ভাই। আরও জোরে— আরও জোরে...

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে— আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বিমে নুড়ি ছুড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চচা একটা ছেলে।

এক—একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।
—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে?
পাগল খায়। উত্তর দেয় না।
—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার কাছ থেকে দেখতে?
পাগল খায়। কথা বলে না।
—জানতে চাও না সে কেমন আছে?
ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।
—একদিন তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের ঘরে! যাবে অরুণ?
একজন প্রতিবেশী পথ চলতে চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে— আপনার বড়ো দয়া। রোজ দেখি দু—বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারও জন্য! আমরা আমাদের ছেলে—মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।
কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার— কী বলেন?
বলি, ওইরকম মহাপ্রাণ হয়ে ওঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন— এটাই আমাদের বড়ো লাভ।
তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!
কিন্তু ভাবে তুষার! ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে— না নাঃ। চমকায়! জালবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনও মাঝে মাঝে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।
এত রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুলগাছটার তলায়।
—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনো দিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।
বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।
কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল!
সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।
—কল্যাণী, দ্যাখো কাকে এনেছি।
—কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিনঠিন শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।
—মা গো! চিৎকার করল সে।
নরম গলায় তুষার বলল— ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।
নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল। তুষারের হাতে—ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।
এত কাছ থেকে অরুণকে অনেকদিন দ্যাখেনি কলাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসিদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা—ফালা। খাকি প্যান্টের রং পালটে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনও অকৃপণ, সুন্দর বকুল ফুলে ছেয়ে আছে ওর মাথায় জটায় ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নীচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে তুষার বলছিল— খাও অরুণ, খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দ্যাখো আমার ঘরদোর। ওই যে মশারির নীচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দ্যাখো, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দ্যাখো ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ওই ড্রেসিং টেবিল। এই দ্যাখো, আরও কত কী—

ঘুরে ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে— এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না এই সব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বউ? সোমার মতো মেয়ে।

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার— বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না!

—অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়— কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে।

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ। থাকো থাকো। থেকে দ্যাখো।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার!

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুলগাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্যলগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বকুলগাছের তলায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ? বকুলগাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে। হায় পাগল, ভালোবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনো সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড়ো শীত পড়েছে এবার। বকুলগাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়েছে পাগলের গায়ে? ছেঁড়া জামা দিয়ে হু—হু করে উত্তরের হাওয়া লাগছে শরীরে। বড়ো দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরোনো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী। পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে মাঝে কলাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালোবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালোবাসে এখনও! কে জানে? মাঝে মাঝে উগ্র হিংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনো দিনের পর দিন থাকে নিঃস্পৃহ। আর ওই যে ভালোবাসার জন্য পাগল অরুণ— ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী। বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সব সময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি! কখনও যে ধম করে নেমে আসে। অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে উঠে তুষার।

ঠিক সকাল ন—টায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুলগাছটার গোড়ায় পাগলকে দ্যাখে। দু—জনে দু—জনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানি এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে! ক্লান্তি বাড়ে। দিন শেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দেয়, নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি বিস্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনো ফুল, বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।

পাগল বসে থাকে।

ঘণ্টাধ্বনি

সাঁঝবেলাতে গোয়ালঘরে ধুনো দিতে গিয়ে কালিদাসী শুনতে পেল, রামমন্দিরে খুব তেজালো কাঁসি বাজছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

গুন্টু দুপুর থেকে বাড়ি নেই। আলায় বালায় সারাদিন ঘোরে। মাথাগরম ছেলে। যখন তখন হাফ—পেন্টুল খুলে পুকুরে ঝাঁপায়। চৌপর দিন জলে দাপাদাপি করে। কবে জলের ঠাকুর টেনে নেয় ছেলেটাকে! তবে ভরসা এই, গুন্টুর প্রাণে ভক্তি আছে। সন্ধে হলেই রামমন্দিরে গিয়ে বুড়ো বাজনদার আফিংখোর গোবিন্দর হাত থেকে কাঁসি কেড়ে নিয়ে নেচে নেচে বাজায়। ওই বাজাচ্ছে এখন। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

কেলে গোরুটার নাম শান্তি। ভারি নেই—আঁকড়া। কালিদাসীকে পেয়ে গলা এগিয়ে দিল। ভাবখানা— একটু চুলকে দাও। তা দেয় কালীদাসী। অনেকক্ষণ তুলতুলে কম্বলের মতো গলায় আঙুলের কাতুকুতু দিতে থাকে। অন্য গোরু শিপ্রা ফোঁসফোঁস করতে থাকে। শিং নাড়া দেয়; কালিদাসী বলে— রোসো মা তোমাকেও দিচ্ছি। এ মুখপুড়ীর আর কিছুতেই আরাম ফুরোয় না।

মন্দিরের আরতি হচ্ছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের এই সময়ে প্রায়দিনই ভাব হত। ভাব হলে হাত—পা টানা দিয়ে চিত হয়ে পড়ে মুখে গাঁজলা তুলে নানা কথা বলত। সে সব কথা স্বয়ং ভগবানের। একবার কালিদাসীকে বলেছিল— ও কালী, ভুরের পায়েস খাব, এনে দিবি?

তা ভুরে গুড় দিয়েছিল কালিদাসী। একটু—আধটু নয়, আধ মণেরও বেশি হবে। তাই দিয়ে সেবার বিরাট পায়েস ভোগ লাগানো হল মন্দিরে।

চক্কোত্তিমশাই এখন বয়সে পঙ্গু হয়ে টিনের চারচালার দাওয়ায় চৌকি পেতে বসে থাকে দিন রাত। তামাক খায়। সেজোছেলে মনোরঞ্জন এখন মন্দিরের সেবাইত। কালিদাসীর এখন আর যাওয়ার সময় হয় না। প্রায়ই ভাবে একদিন গিয়ে বসে আরতি দেখবে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার গোয়ালঘরে কালিদাসীর ভালো করে ঠাহর হয় না কিছুর। টেমি হাতে এগিয়ে গিয়ে খড়ের গাদা গোছ করতে হাত বাড়িয়েই মধ্যের আঙুলে কাঁকড়াবিছের হুল খেয়ে উঃহুঃ করে ওঠে।

ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম কাঁকড়াবিছের হুল খেয়েছিল কালিদাসী তখন যন্ত্রণার চোটে সে কী দাপাদাপি! হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল! পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সে বিষ—ব্যথা থানা গেড়ে ছিল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে।

তারপর মাসটাক যেতে—না—যেতে ফের একদিন হুল দিল। আবার দাপাদাপি। আবার হাসপাতাল। কিন্তু কাঁকড়াবিছেরা কালিদাসীকে সেই থেকে কেমন যে পেয়ে বসল। কাছে পেলেই হুল দেয়। এই ত্রিশ বছর ধরে মাসকে দু—তিনবার দিচ্ছে। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন, তেমন লাগে না।

কালিদাসী টেমি রেখে খানিক কাঁচা গোবর বাঁ—হাতের মাঝের আঙুলটায় বসাল ঠিক যেমন গোলাপগাছের ডগায় লোকে গোবরের ঢিবলি দেয়।

কালিদাসীর শরীরটা কাঁকড়াবিছের বিষে ভরে গেছে। এখন বিষে বিষক্ষয় হয়ে যায়।

আশ্চর্য এই বাচ্চচা দেওয়ার সময়ে মেনি বিড়ালটা গোয়ালঘরে এসে ওই খড়ের গাদায় বাসা বাঁধে। ফুলি কুকুরটা তো ফি—বছর খড়ের মাচার নীচে গর্ত করে চার—পাঁচটা ছানা বিয়োয়। গোরু দুটো সম্বচ্ছর এই ঘরে রাত কাটায়। এগুলোকে কোনোদিন হুল দেয়নি পোড়ারমুখোরা। মানুষের ওপর যত ওদের রাগ। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঘেন্নার হল ওদের কালিদাসী হতভাগী।

আঙুলে—গোবরে করে টেমি হাতে কালিদাসী গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঠের কপাটটা টেনে দিতে দিতে আপনমনে বকবক করছিল— ঝ্যাঁটাখেকো, কেলো ঘেন্না, খালভরাগুলো কোথাকার! কালিদাসীর কাছে বড়ো জো পেয়েছিস।

নীচের তলার নতুন ভাড়াটে হেম ঘোষ, নতুন বিয়ে করেই মা—বাপ—ভাই ছেড়ে আলাদা বাসা করে উঠে এসেছে। তার বউ রেবা নাকি বড়োঘরের মেয়ে, কাজকর্ম করতে পারবে না। শ্বশুরবাড়িতে শুয়ে বসে থাকত বলে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া বেধে পড়ল। হেম ঘোষ বউয়ের পক্ষে। বাড়ি ছেড়ে উঠে এল। চাকরি তার তেমন কিছু নয়। দাশনগরে এক তালা তৈরির কারখানায় চাবির খাঁজ কাটে। ত্রিশ টাকার ঘর ভাড়াও দু—মাস বাকি ফেলেছে। তবু বউয়ের সুবিধের জন্য সবসময়ে কাজ করার বাচ্চচা ঝি বহাল করেছে, তার ওপর ঠিকে কাজের লোক তো আছেই।

দাওয়ায় বসে লুঙ্গি পরে হেম বিড়ি খাচ্ছিল। কালিদাসীর বকবকানি শুনে বলল— কী হল দিদিমা? কাঁকড়াবিছে কামড়াল বুঝি?

কালিদাসী বলল— তা কামড়াবে না কেন বাবা? কালিদাসী যে ভালোমানুষের মেয়ে হয়ে শতেক পাপ করেছে।

হেম ঘোষ বিড়িটা ফেলে একটু তটস্থ হয়ে বলে— এ তো বড়ো মুশকিলের কথা হল দিদিমা! এ—বাড়িতে বড্ড দেখছি কাঁকড়াবিছের উৎপাত। রেবাকে যদি কামড়ায় তো রক্ষে নেই।

কালিদাসী মনে মনে বলে— বউকে তাজমহলে নিয়ে গিয়ে রাখো গে যাও। দেখালে বটে তোমরা বাপ! আজকালকার রত্তি মেয়েরা কী করে যে গোটাগুটি পুরুষমানুষগুলোকে হজম করে বসে থাকে!

ওপরের বারান্দায় উঠে আসতে আসতে কালিদাসী ফের মন্দিরের শব্দ শোনে। গুন্টু কাঁসি বাজাচ্ছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

টেমি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় কালিদাসী। বুড়ো বয়সের ভুল। মন্দার মা বারান্দায় বসে উনুন সাজাচ্ছে, এক্ষুনি দেশলাই চাইবে। টেমিটা না নেবালে, দেশলাইয়ের কাঠি বাঁচত। ছাদে গিয়ে উনুন ধরাতে মন্দার মা না হোক চার—পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবে।

এসবই কালিদাসীর জ্বালা। সংসারে আছে এক উড়নচণ্ডী ছেলে, আর মেয়ের ঘরের নাতি ওই গুন্টু। তবু সংসারের হাজার চিন্তায় কালিদাসীর ডুবজল।

দুই

কানাই মাস্টারের আজ সারাদিন বড়ো হতভম্ব লাগছে।

এমনিতে কানাই বড়ো নিরীহ লোক। তিন বছর হল তার দশ বছর বয়সি ছেলেটা এক দুরারোগ্য বাধিতে শয্যাশায়ী প্রায়। শরীরের সবকটা হাড়ের জোড়ে বিষযন্ত্রণা। হাঁটু, কনুই, কবজি সব ফুলে আছে। শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঠারেঠোরে বলেছে, ভালো হওয়ার রোগ নয়।

কানাই মাস্টারের একটাই ছেলে, আর মেয়ে দুটো। তার নিজের বয়স বেশি নয়, চল্লিশ—টল্লিশ হবে। কিন্তু এ বয়সেই বড়ো বুড়োটে মেরে গেছে কানাই। ছেলের চিন্তা উদয়াস্ত ভিতরটা কুরে খায়। তার ওপর ক—টা টিউশনি করে রসকষ আরও মরে যাচ্ছে ক্রমে।

আজ হল কী, ইস্কুলের আর্ট ক্লাসে থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস নিচ্ছে। মদন নামে ধেড়ে ছেলে আছে একটা। তার গলায় আবার কালো তাগায় বাঁধা রুপোর তক্তি। রাঙামুলো চেহারা। কোনোকালে পড়াশুনোর ধার মাড়ায় না। পড়া জিজ্ঞেস করলে শুভদৃষ্টির সময় নববধূ যেমন চোখ নামায় তেমনি নতচোখে চেয়ে থাকে মেঝের দিকে। তার বাপ বড়ো কারবারি, তাই মাসকাবারে ইস্কুলের বেতন কখনো বাকি পড়ে না। সেই কারণে কেউ বড়ো একটা ঘাঁটায়ও না মদনকে। আচ্ছা মদন, থাকো মদন, গোছের ভাব করে সবাই তাকে এড়িয়ে যায়। প্রতি ক্লাসে তিন—চার বছর করে থাকলে মদনের বাবদ ইস্কুলের একটা স্থায়ী আয় তো বহাল রইল। এমনিতে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ষাট—সত্তরজনই ডিফলটার। কারও সাত—আট মাসের বেতন বাকি পড়ে আছে। ধমক চমক করলে গারজিয়ানরা এসে হেডস্যারের হাতে পায়ে ধরে। সেই সব গারজিয়ানরাও 'দিন আনি, দিন খাই' গোছের। কেউ বিড়ি বাঁধে, কারও তেলেভাজার দোকান, একজন গামছা ফিরি করে ময়দানে। এইরকম সব। তাদের মধ্যে মদনের বাবা হচ্ছে নৈবেদ্যর কলা।

মদনা ক্লাস এইটে পড়লেও তো আর ছেলেমানুষ নয়। বয়সের ডাক দিয়েছে। শরীর জাম্বুবানের মতো বড়োসড়ো।

বয়সের দোষই হবে। রোজই ইস্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে বীণাপাণি ইস্কুলের মেয়েরা যায়। ইস্কুলের বড়ো ক্লাসের ধেড়ে ছেলেরা এই সময়টুকুতে রাস্তার মোড়ে, সামনের বারান্দায়, পাশের মাঠে জমে থাকে। কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট টানে, কেউ সাইকেলে করে বোঁ চক্কর মারে। যার যা আছে সব দেখায় মেয়েদের। হাসি—টাসি তো আছেই। ছেলেদের এইসব বোকামি দেখে মেয়েদের কেউ—কেউ হাসিতে ঢলাঢলি করে যায়, কেউ গম্ভীর মুখে দৌড়—হেঁটে পালায়, দু—একজন 'জুতো মারব, লাথি মারব' গোছের কথা বলে শাসিয়েও গেছে। নিত্যিকার ঘটনা, কারও গায়ে লাগে না। আজ হল কী, থার্ড পিরিয়ডে যখন কানাই ক্লাস নিচ্ছে তখন টুকটুক করে একটা ফুটফুটে বছরদশেকের মেয়ে সোজা সরল পায়ে ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পাখির কণ্ঠে বলল, মাস্টারমশাই!

কানাই অবাক। মেয়েটার পরনে ইস্কুলের সাদা ইউনিফর্ম, হাঁটু পর্যন্ত বাহারি মোজা। মুখচোখ ভারি তিরতিরে সুন্দর।

কানাই মাস্টার মুগ্ধ হয়ে বলল, এসো মা। কী হয়েছে বলো তো?

মেয়েটা ক্লাসে ঢুকে একটা ভাঁজকরা কাগজ কানাইয়ের সামনের টেবিলে রেখে বলল, মাস্টারমশাই একটা দুষ্টু ছেলে আমি ইস্কুলে যাওয়ার সময় আমার হাতে এটা দিয়ে বলল,এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পোড়ো। কীসব বাজে কথা লেখা আছে দেখুন। ওই ছেলেটা। বলে মেয়েটি মদনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—

কানাই চিঠিটা খুলে দেখে তাতে লেখা— প্রীয়তম রোজী আমি তোমাকে ভালোবাসে আমার মোনের কথা তুমি কী বুঝতে পারো না? কিস জানিবে। তোমার প্রীয় মদন।

চিঠির ওপর শ্রীকালী লিখতেও ভুল হয়নি।

কানাই দুটো কারণে চটে গিয়েছিল। এক তো মেয়েদের চিঠি দেওয়া সাঙ্ঘাতিক বেয়াদবি। তার ওপর এইটুকু একটা চিঠিতে এতগুলো বানান ভুল।

—তুমি এসো মা, আমি দেখছি। এই বলে কানাই মাস্টার রোজিকে বিদায় করে মদনকে ডাকল। যখন ডাকল তখনই একটা বেসামাল রাগ পেটের ভিতর থেকে উঠে আসছিল তার। সেই রাগে হাত থরথর করে

কাঁপে, মাথাটা ঘোলা লাগে, দাঁতে—দাঁতে বাতাস পেষাই হয়।

মদন কাছে আসতেই বিনা প্রশ্নে প্রথমে চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ঠক করে টেবিলে ঠুকে দিল কানাই। সেই সঙ্গে পিঠে যত জোরে সম্ভব এক কিল। বোঝা গেল মদনের চেহারাটা বড়োসড়ো হলেও গাটা নরম। কিলটা নরম চর্বির থাকে এমন পড়ল যেন জলে কিল মারবার মতো মনে হল।

মদন এমনিতে ঠান্ডা ছেলে, সাত চড়ে রা কাড়ে না। আজও কাড়ল না। তাইতেই কানাইয়ের মাথাটা আরও বিগড়ে গেল। হারামজাদা, গিদ্ধড়, পাজি, বদমাশ, নরাধম ঠিক নামতার মতো মুখে বলে যাচ্ছে কানাই আর মারছে। সে কী মার! মারের চোটে একবার গিয়ে দেয়ালে পড়ল, একবার ব্ল্যাকবোর্ডে ফার্স্ট বেঞ্চের ডেস্কের কোণায় লেগে কপালটা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সমস্ত ক্লাস পাথরের মতো নিশ্চল। শুধু সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বেধড়ক ঠ্যাঙানি চলেছে তো চলেইছে। ডাস্টারটা দিয়েও কানাই মাস্টার মদনের চোয়াল, মাথা কান ফাটিয়ে দিয়েছিল আজ।

এরকম মার বড়ো একটা দেখা যায়নি স্মরণকালে। আর কানাই মাস্টার নিজের ছেলের অসুখ হওয়ার পর থেকেই মারধর করা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের খ্যাপা মার দেখে আশপাশের ক্লাস ফেলে মাস্টারমশাইরা ছুটে এসে দরজার কাছে ভিড় করে ফেললেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে বা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। শেষপর্যন্ত হেডস্যার এসে মাঝখানে পড়ে সেই আসুরিক ব্যাপার থামালেন। মদন তখন রক্তমাখা মুখে, ফাটা ঠোঁটে, ফোলা গাল, ছেঁড়া চুল আর তোবড়ানো জামাকাপড়ে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে— স্যার, আমাকে মেরে ফেলুন স্যার আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! জুতো মারুন স্যার, আমি আজই সুইসাইড করব স্যার।

মদন এত কথা কখনো বলে না। মার খেয়ে আজ তার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। মার খাওয়ার পরও তার চেঁচানি আর থামে না। কেবল কাঁদে আর আরও মারতে বলে, সুইসাইড করবে বলে চেঁচায়। নিজের ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে সে সারা ইস্কুলময় দৌড়োদৌড়ি করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

কানাই মাস্টারের কুপিত বায়ু যখন ঠান্ডা হল তখন সে মদনের আচরণ দেখে ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। ছেলেটার হল কী?

টিচার্স রুমে কানাই মাস্টারকে সবাই ধরে এনে পাখার তলায় বসিয়েছে। ইস্কুলের সামনে পাবলিকের ভিড় জমে গেছে। এই অবস্থায় মদন দৌড়ে গিয়ে মাস্টারমশাইদের পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে বলছে, লাথি মারুন স্যার, জুতো মারুন স্যার। আবার উঠে গিয়ে আর একজনের পায়ে পড়ে ওরকম বলে।

হেডমাস্টারমশাই এসে কানাই মাস্টারের কানে—কানে বললেন,—ছেলেটার ব্রেনটা বোধহয় ড্যামেজ হয়েছে। আপনি আর স্পটে থাকবেন না, বাড়ি চলে যান।

শুনে কানাইয়ের শরীর হিম হয়ে এল। আর বুকের কী ধড়ফড়ানি! শশী বেয়ারা রিকশা ডেকে দিল। কানাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই শয্যা নিয়ে রইল। সারাদিন ভাবছে— এ আমার আজ কী হয়েছিল? এ আমি করলাম কী?

বিকেলের দিকে একবার উঠে এসে নিজের ছেলের বিছানায় বসল কানাই। কৃশ করুণ মুখ তুলে ছেলেটা চাইল বাবার দিকে। একটু হাসল। সে হাসিকান্নার ওপরকার সরের মতো। বড়ো সহ্যশক্তি ছেলেটার। কত সহ্য করছে! কানাই ভাবে, ওর ব্যথাগুলো কেন আমার হয় না?

ভাবতে ভাবতে বিছের হুলের মতো মদনের কথা মনে পড়ে। বড়ো যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে। এত পাপ কি ভগবান সইবেন? মদনের যদি ভালোমন্দ কিছু হয় তো তার কর্মফল কানাইতেও অর্সাবে। যদি সেই পাপ ছেলেটার ওপর এসে পড়ে?

বাইরে কে ডাকছে। কানাইয়ের বউ দিনরাত কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে আজকাল বড়ো রোগা হয়ে গেছে। চেনা যায় না! সে এসে বলল, ইস্কুলের ছেলেরা এসেছে।

বুক কেঁপে গেল। তবু নিজেকে শক্ত করে উঠে এল কানাই।

বড়ো ক্লাসের কয়েকটা ছেলে গম্ভীরমুখে বাইরে দাঁড়িয়ে। একজন মাতব্বর গোছের ছেলে বলল, স্যার মদনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—হাসপাতাল! বলে কানাই হাঁ।

অন্য একটা ফচকে ছেলে বলল, আপনি ঘাবড়াবেন না স্যার। কয়েকটা স্টিচ পড়েছে মাত্র। আর কিছু নয়।

ছেলেরা চলে গেলেও হতভম্ব ভাবটা যায়নি কানাই মাস্টারের। ঘর থেকে কয়েকদিন না বেরোনোই ভালো। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই খেপে আছে। কে কোথা থেকে আধলা ছুড়বে হয়তো। না হলে ধরে ঠ্যাঙালেই বা কী করার আছে! সবচেয়ে চিন্তির হয় যদি মদনের বাবা পুলিশের কাছে যায়। যায়নি কি আর! গেছে। পুলিশ বোধহয় এতক্ষণে রওনা হওয়ার জন্য কোমরের কষি বাঁধতে লেগেছে। রক্তপাতে ফৌজদারি হয় সবাই জানে।

ছেলের মা এসে বলল, বাজারে যাও। তেল মশলা কিছু নেই।

শ্বাস ছেড়ে কানাই ওঠে। সন্ধের মুখে রামমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। সঙ্গে ঠনঠন কাঁসির আওয়াজ রোজ ভালো লাগে না। আজ লাগল। ঘণ্টা ডাকছে।

কানাই বেরিয়ে পড়ে। চোখে জল আসছে। বুকটা কেমন করে। কোনোকালে মন্দিরে যায় না কানাই মাস্টার। আজ ভাবল একবার যাবে। বুড়ো চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। সবাই বলে লোকটা খুব বড়ো মানুষ। এককালে তাঁর ভর হত। জিজ্ঞেস করবে— আমার পাপ কি ছেলেতে অর্সাবে ঠাকুর?

তিন

রেবার গানের মাস্টারমশাই এসেছে। লোকটা ছোকরা, তার ওপর গান শেখায়। এসব লোক বড়ো বিপজ্জনক হয়।

তাই প্রথম প্রথম গানের মাস্টার এলেই হেম গিয়ে ঘরে মোড়া পেতে বসে সব লক্ষ করত। গানের আড়ালে আবডালে, দু—জনের কোন হেলন—দোলন নজরে পড়ে কি না।

একদিন রেবা ধমক দিল মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর। বলল, সুরের কিছু বোঝো না, তবু সামনে গিয়ে অমন হাঁ করে বসে থাকো কেন বলো তো? তুমি সামনে থাকলে আমার গাইতে বড়ো লজ্জা করে। আর কখনো ওরকম করবে না বলে দিচ্ছি।

কপাল এমনই যে হেমের বউ রেবা বেশ সুন্দরীই। সাদাটে রং, লম্বাটে গড়ন, মুখখানা মন্দ নয়, তার ওপর চোখ দু—খানা ভারি মিঠে। এমন করে তাকায় যেন সবসময় বড়ো অবাক হয়ে আছে। এইরকম বউ যার থাকে তার বড়ো জ্বালা।

হেমের আজকাল বারবার ডাইসে হাত পড়ে যায়। লোহার ছেঁকাও বিয়ের পর থেকে বড্ড বেশি খাচ্ছে হেম। কারখানায় কাজের সময়ে অন্যমনস্ক থাকলে আরও কত বিপদ হতে পারে। রেবার মতো সুন্দরী বউ জুটবে এমন ভরসা তার ছিল না কখনো, তবু কোন পুরুষ না বিয়ের আগে সুন্দরী বউয়ের কথা ভাবে। হেমও ভাবত। কিন্তু এ জ্বালা জানলে বিয়েতে বসবার আগে আর একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখত সে।

বিয়ের পর একদিন হাওড়ার খুরুট রোডের কাছে সিনেমা দেখতে গেছে। টিকিট কাটবার পর শো শুরু হতে দেরি আছে দেখে হেম রেবাকে নিয়ে লেমোনেড দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি খেল। রেবার বড়ি খাওয়ার দৃশ্যটা হাঁ করে দেখছিল হেম। দেখতে গিয়ে এত মজে গিয়েছিল যে সে নিজেও রেবার মতো ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে বড়ি গেলার মতো ভাব করে ফেলেছিল নিজের অজান্তে। তারপর যখন রেবা লেমোনেডের ঝাঁঝে মুখচোখ কোঁচকালো তখন তাই দেখে হেমেরও কোঁচকালো। আর এইসব হওয়ার

সময়ে দোকানের চওড়া আয়নায় হেম হঠাৎ দেখতে পায় তিন—চারটে বখা ছেলে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রেবার দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি বলাবলি করছে।

ভ্রূ কুঁচকে খানিক চেয়ে থাকে সে। মাথা বিগড়ে গেল। সে গুন্ডা নয়, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, হলে ভালো হত। তার বউয়ের দিকে না হয় লোকে তাকাবে— এ কেমন কথা?

হলে ঢুকবার পর গণ্ডগোলটা পাকাল। সেই তিনটে ছোঁড়া একেবারে পিছনের সিটে। হেম ছবি দেখবে কী, বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখছে। নিউজরিল শেষ হয়ে ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলবার সময়ে দেখল এক ছোকরা রেবার সিটের পিছনে হাত রেখেছে। আর যাবে কোথায়!

—কীরকম ভদ্র লোক হে তুমি? ভদ্রমহিলার একেবারে ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছ? এই বলে খেঁকিয়ে উঠেছিল সে।

ছেলেগুলো আচমকা ধমক খেয়ে প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপরই তেড়েফুঁড়ে উঠে তারাও তড়পাতে থাকে— কে মেয়েছেলের ঘাড়ে হাত রেখেছে? আপনি তুমি—তুমি করে বলছেন কেন? অত ছুঁচিবাই থাকলে মেয়েছেলে সিন্দুকে ভরে রেখে আসবেন। লেডিজ সিটে গিয়ে বসবেন এবার থেকে।

হেম হাতফাত চালিয়ে দিত ঠিক। রেবাই তাকে সামলায়। পরে বাড়ি ফেরার সময় বলেছিল— ওরা কিছু তো করেনি, তুমি রেগে গেলে কেন?

রাগ যে কেন হয় হেমের, তা কারও বোঝার নয়। এই জীবনটা এইরকম জ্বলে পুড়ে যাবে।

ছোকরা গানের মাস্টার ঘরে সন্ধের আলো জ্বালাবার মুখটাতেই এসে হাজির। রেবা প্রায় দুপুর—দুপুর বেলা থেকে খুব সেজে বসে আছে। কোলে খোলা গানের খাতা নিয়ে বিছানায় আসন পিঁড়ি হয়ে বসে তখন থেকে 'তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায় কেউ বা সিরাজি মাগে' লাইনটায় সুর লাগাচ্ছে। হেমকে দেখেও দেখছে না।

হেম ঘোষের গলায় এক সময়ে সুর ছিল। না ঠিক গানের গলা নয়! তবে সিনেমা বা রেডিয়োর গান গুনগুন করতে করতে প্রায় সুরটা এনে ফেলত।

আচ্ছা, এমন হতে পারে না কি যে, হেম খুব গোপনে কোনো বড়ো ওস্তাদের কাছে গিয়ে গান শিখে খুব বড়ো গাইয়ে হয়ে গেল একদিন। রেবা টেরও পেল না এত কাণ্ড। তারপর কোনোদিন হয়তো রেবার মাস্টার গান শেখাতে এসে সুর তুলতে গলদঘর্ম হচ্ছে, এমন সময়ে সাদামাটা চাবির কারিগর হেম ঘোষ হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত সুরে গানটা গেয়ে দিল! রেবা তখন যা অবাক হয়ে তাকাবে না। সেই দিনই মাস্টারকে অহঙ্কারের সঙ্গে বলে দেবে— আর আপনাকে দরকার হবে না প্রভাসদা। তারপর হেমের সঙ্গে যখন একা হবে রেবা তখন দু—হাতে গলা জড়িয়ে হেমের কালো মোটা ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলবে— তোমার ভিতর কত জাদু আছে বলো তো! তখন হেম খুব হাসবে। খুব হাসবে। একেবারে হেঃ হেঃ করে পেট ভরে হেসে নেবে একচোট।

দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ এইসব ভাবল সে। ঘর থেকে গান আসছে, গোয়াল থেকে মশা আর শুকনো গোবরের গন্ধ। কাঁকড়াবিছের চিন্তাটাও বড্ড পেয়ে বসেছে হেমকে। চক্কোত্তিমশাই অনেক ওষুধ জানেন। দিনেকালে কত শক্ত রোগ ভালো করেছেন বলে শোনা যায়। একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে গিয়ে কাঁকড়াবিছে কামড়ালে কী ওষুধ দিলে আরাম হয় তা ফাঁকমতো জেনে আসবে হেম। রেবার যা সুখের শরীর, একবার বিষবিচ্ছুর কামড় খেলে ফুলের মতো শরীরটা নীলবর্ণ হয়ে নেতিয়ে পড়বে না? ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

'...কেউ বা সিরাজি মাগে— এ এ' গানের মাস্টারের ভরাট গলার সঙ্গে ডুয়েটে রেবার কোকিলস্বর জড়ামড়ি করছে। সইতে পারে না হেম ঘোষ। বিড়িটা নিবে গিয়েছিল, আর ধরাতে ইচ্ছে হল না। ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরোবে।

হেমের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর জামাটা চড়িয়ে নিলে হত। কিন্তু এ সময়টায় ঘরে ঢুকতে সাহস হয় না। রেবা রেগে যাবে ঘরে ঢুকলে।

উঠোনে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের গায়ে বেরোনোর দরজা। ঠিক দরজার চৌকাঠে মুখোমুখি কালিদাসীর ছেলে অভয়পদর সঙ্গে দেখা। অভয়পদর হাতে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি। ঝালের চোটে শিস টানছিল। হেম ঘোষকে দেখে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরল। হেম হাত পাতলে ঠোঙা উপুড় করে দেয় অভয়। তলানি মুড়িতে যত কুঁড়ো মিশে আছে। তাই মুখে ফেলে হেম ঘোষ বলে— খবর কী?

—আর খবর! অভয়পদ বলে— আজও মোহনবাগানের একটা পয়েন্ট গেল।

হেম ঘোষ খেলার মাঠের খবর রাখে না। তবু অভয়পদকে তোয়াজ করবার জন্য বলল, এঃ হেঃ! একটা পয়েন্ট চলে গেল?

অভয়পদর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাওড়ার বিখ্যাত মাতব্বর জ্ঞান সরকারের শাগরেদ। জ্ঞানদা ওর মাথাটা খেয়ে রেখেছে। ঘুমে জাগরণে সবসময়ে ওর মুখে জ্ঞানদা আর মোহনবাগানের কথা। কবে জ্ঞানদা ডেকে অভয়পদর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেছে, কবে যেন বলেছে— অভয়, আমার বাড়িতে একটা বাচ্চচা চাকর ঠিক করে দিস তো, কবে হয়তো জ্ঞানদার গাড়িতে উঠে বড়োবাজারের লোহাপট্টিতে গেছে, এসবই অভয়পদর বলবার মতো কথা। আজকাল অভয়পদকে দেখলেই লোকে সটকাবার তাল করে। কাঁহাতক জ্ঞানদার বৃত্তান্ত শোনা যায়!

হেম ঘোষের সেই ভয়। তবে কিনা অভয়পদর আর কোনো দোষ নেই। বরং জ্ঞানদার শাগরেদি করে সে চিরকুমার রয়ে গেছে, মেয়েমানুষকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে, লোকের বেবিফুড জোগাড় করে দেয়, ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসে পাঁচজনের। মড়া পোড়াতে যায়। বাড়ি ভাড়ার টাকা তুলে, দুধ আর ঘুঁটে বেচে মা কালিদাসী সংসারটাকে কষ্টেসৃষ্টে টেনে নেয়। নিষ্কর্মা অভয়পদ তাই বড়ো সুখে আছে।

অভয়পদ বলল— আজ একটা মিটিং আছে জ্ঞানদার বাড়িতে, বুঝলে? চা—টা খেয়েই বেরোব।

—খুব ভালো। বলে হেম বেরিয়ে আসছিল।

মানুষ যে কেন খামোকা মিটিং করে মরে আজও হেম বোঝে না। যতসব ফালতু কারবার। দশটা মাথা এক হয়ে যত সব গুজুর—গুজুর, ফুসুর—ফুসুর।

সিঁড়ির মুখ থেকে অভয়পদ ফিরে এসে বলল— ও হেম, শোনো।

হেম ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। মিটিং—এর কথা না ফেঁদে বসে। ওসব কথায় বড্ড মাথা বিগড়ে যায় তার।

অভয়পদ গলার স্বর নামিয়ে বলে— তোমার বউ কি সিগারেট—টিগারেট টানে নাকি! রাতে ওপরের বারান্দা থেকে যেন দেখলুম উঠোনে রেবা সিগারেটে টান মারতে মারতে পায়চারি করছে।

কী কেলেঙ্কারী! হেমের ভিতরটা যেন লজ্জায় গর্তের মতো হয়ে যায়। কাল তখন অনেক রাতে তারা স্বামী—স্ত্রী জোছনা দেখতে উঠোনের দিকে দাওয়ায় এসে বসেছিল একটু। এমনিতে হেম ঘোষ সিগারেট খায় না, রেবার চাপাচাপিতে ইদানীং খেতে হচ্ছে। কাল রাতেও খাচ্ছিল। সদ্য ধরানো সিগারেটটায় দু—টান দিতে—না—দিতেই রেবা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল— আমি খাব।

হেম অবাক। দেখে, রেবা দিব্যি ফসফস টান মারছে। কাশিটাশি নেই, চোখে জলও এল না ধোঁয়ায়। বলল — আগে খেতেটেতে নাকি?

—কত! বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে অনেক খেয়েছি। বেশ লাগে।

বলে রেবা সিগারেট টানতে টানতে উঠোনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেসময়ে বাড়ির কারও জেগে থাকবার কথা নয়। তারাও কিছু টের পায়নি। রামচন্দ্র হে ! অভয়পদ দেখে ফেলেছে তবে!

হেম ঘোষ হেসে আমতা আমতা করে বলে— ওই শখ করে দুটো টান দিয়েছিল আর কী! তাপর কেশে —টেশে ফেলে দেয়।

অভয়পদ আদর্শবাদী লোক। মুখটা কেমনধারা করে বলল— দেশটা যে একেবারে সাহেব হয়ে গেল হে হেম! ভারতবর্ষের কত সম্পদ ছিল!

কথাটা ভালো বুঝল না হেম। অভয়পদও বুঝিয়ে বলল না। চলে গেল।

রেবাকে সিগারেট খেতে অভয় দেখেছে, লজ্জা শুধু সেজন্যই নয়। হেম ঘোষ আর—একটা কথা ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে জিভ কাটল। কী কেলেঙ্কারী! কাল জোছনায় তাদের দু—জনেরই বড়ো রস উসকেছিল। নিরিবিলি নিশুতি জোছনায় পরির মতো বউটাকে দেখে খুব দু—চারটে দেহতত্ত্বের কথা হেসে হেসে বলে ফেলেছিল হেম। রেবাও দু—চারটে ভালো টিপ্পনি ঝেড়েছিল। দোষের কথা নয়। স্বামী—স্ত্রী একা হলে এরকম কত কথা হয়! কিন্তু সেসবই যে শুনে ফেলেছে অভয়পদ! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

এই জিভ কাটা অবস্থায় হেম ঘোষ যখন দাঁড়িয়ে ঠিক তখনই একজোড়া মাঝবয়সি স্বামী—স্ত্রী ভুঁইফোঁড়ের মতো তার সামনে কোত্থেকে হাজির হয়ে আচমকা বলল— আচ্ছা মশাই, গুন্টু কি বাড়িতে আছে?

আর—এক দফা লজ্জা পেয়ে হেম বলে— না, সে মন্দিরে কাঁসি বাজাতে গেছে।

চার

গুন্টু যখন কাঁসি বাজায় তখন সে নিজেই শব্দ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কীরকম হয়, কাঁসি বাজাতে বাজাতে শব্দটা আস্তে আস্তে বড়ো হতে থাকে। কাঁইনানা—কাঁইনানা হয়ে বাজতে বাজতে কানে তালা ধরে আসে, শরীর ঝিমঝিম করে। তারপর শব্দটা যেন তার চারধারে লাফাতে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে বহুদূর চলে যায়। আবার ফিরে আসে। তারপরই সে পরিষ্কার টের পায় শব্দটা আকাশ বাতাস সব হাঁ করে গিলে ফেলল। প্রকাণ্ড হয়ে গেল। দুনিয়াভর হয়ে গেল। আকাশভর হয়ে গেল। তারপর আর গুন্টু নিজেকে টের পায় না। বড়ো মজা হয় তখন। গুন্টু শব্দ হয়ে যায়।

মাস দুই আগে গুন্টু চৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাগানে পেয়ারা চুরি করতে ঢুকেছিল দুপুরবেলা। কোথাও কিছু না, হঠাৎ একটা শিরীষগাছে এক হনুমানকে দেখতে পেল সে, বুকে বাচ্চচা নিয়ে বসে আছে।

যেকোনো কিছুকে লক্ষ করে ঢিল ছোড়া গুন্টুর স্বভাব। বে—খেয়ালে কত সময় কত মারাত্মক জায়গায় ঢিল ছুড়েছে সে। চলন্ত গাড়ির হেডলাইট ফাটিয়েছে একবার, রাস্তার আলো ভেঙেছে কতবার, জ্ঞান সরকারের বাইরের ঘরের দেয়ালঘড়িটা রাস্তা থেকে ঢিল ছুড়ে ভেঙেছিল।

সেই স্বভাববশে হনুমানটার দিকেও খামোকা একটা মুঠোভর ঢিল কুড়িয়ে ছুড়ে মেরেছিল। হনুমানটার তেমন লাগেনি তাতে। কিন্তু হঠাৎ খেপে গিয়ে সেটা হড়হড় করে গাছ থেকে নেমে এসে তাড়া করল গুন্টুকে। গুন্টু দৌড়—দৌড়। জংলা বাগানটার মাঝ বরাবর পুরোনো পুকুর, তাতে সবুজ শ্যাওলা থিকথিক করছে, বড়ো—বড়ো মাছ। অন্যদিকে পথ না পেয়ে গুন্টু সেই পুকুরে ঝাঁপ খায়।

গুন্টু সাঁতরায় ভালোই। কিন্তু ত্যাঁদড় হনুমানটার জ্বালায় কিছুতেই আর জল ছেড়ে উঠতে পারে না। যেদিক দিয়ে উঠতে যায় সেদিকেই সেটা গিয়ে হুপহুপ করে হাঁক ছাড়ে। সেই হাঁকডাকে আরও কয়েকটা হনুমান কোত্থেকে এসে জুটল। অথৈ জলের মধ্যে গুন্টুকে সারাক্ষণ হাত—পা নেড়ে ভেসে থাকতে হয়েছিল। ফলে পচা আঁশটে গন্ধ, শ্যাওলার লতা বারবার পায়ে হাতে জড়াচ্ছে, বড়ো—বড়ো জাহাজের মতো মাছ মাঝে মাঝে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘষটে যাচ্ছে। কয়েকবার লেজের ঝাপটা খেলো। এক হাত তফাত দিয়ে সাঁতরে চলে গেল একটা জলঢোঁড়া। পায়ের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ডুব দিয়ে বহুবার থই খুঁজে পেল না গুন্টু। তার কচি বুকে দম বেশি ছিল না তো। তাই এক সময়ে হঠাৎ চোখের সামনে সূর্য নিবু—নিবু হয়ে গেল, বুকে বাতাসের টান, হাতে পায়ে খিল। সে তখন বিড়বিড় করে বলেছিল— আমি যে রোজ সন্ধেয় তোমার মন্দিরে আরতির সময়ে কাঁসি বাজাই!

তারপরই হঠাৎ যেন এক পাতালপুরীর হাত এসে গুন্টুকে টেনে নিল জলের তলায়।

সেইখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। মরলে তো সবাই তাঁর দেখা পায়। গুন্টু গিয়ে দেখে আরেব্বাস! সেখানে পেল্লায় চৌকি পেতে বুড়ো চক্কোত্তিমশাই বসে তামাক খাচ্ছেন। তাকে দেখে বলে উঠলেন— গুন্টু রাজার গালে হাত! গুন্টু রাজার গালে হাত!

তা গালে হাত দেওয়ারই দাখিল। যা অবাক হয়েছিল। তবু গুন্টু চক্কোত্তিমশাইকে অচিন জায়গায় পেয়ে ভারি খুশি। প্রণাম করে ফের ভালো করে তামাক সেজে দিল। চক্কোত্তিমশাই বললেন— তা শব্দ হওয়া ভালো। দুনিয়াটা হলই তো শব্দ থেকে। যেখানে সেখানে ভালো করে যদি শুনিস তো দেখবি, দুনিয়ায় সব শব্দ। তুইও শব্দ, আমিও শব্দ। মনে করিয়ে দিস, তোকে ভালো দিন দেখে একটা শব্দ দেব'খন। সে এমন শব্দ যে কাঁসির শব্দ তার কাছে কোথায় লাগে। এখন যা।

ডোবার আধঘণ্টা পর গুন্টু ফের ভেসে উঠেছিল। পেটে জল, মুখে গাঁজলা, চোখের মণি ওলটানো, জ্ঞান নেই, মৃত্যুক্ষীণ নাড়ি চলছে না। তাই দেখে হনুমানগুলো এমন হাল্লাচিল্লা ফেলে দিয়েছিল যে চৌধুরীবাগানের বুড়ো মালি এসে পড়েছিল দুপুরের ঘুম ভেঙে। সেই তোলে গুন্টুকে। পেটের জল বার করে সেঁক তাপ দেয়। ডাক্তার—বদ্যি করতে হয়নি, হাসপাতালেও যেতে হয়নি। কেউ তেমন টেরও পায়নি ঘটনা।

বেঁচে গিয়ে তেমন অবাক হয়নি গুন্টু। কেমন করে যেন মনে হয়— মরলেই হল আর কী! চক্কোতিমশাই সব জায়গায় পাহারা দিচ্ছে না। যেখানেই যাও গিয়ে দেখবে ঠিক বুড়ো মানুষ আপদবিপদের দোর আগলে চৌকি পেতে বসে তামাক খাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

রাম মন্দিরে আরতির সময় এখনও বেজায় ভিড় হয়। নতুন ঠাকুরমশাই আরতিও করেন ভালো, তবে কিনা চক্কোত্তিমশাইয়ের আরতি যারা দেখেছে তাদের চোখে অন্য কিছু আর লাগে না। তবু অভ্যাসবশে মানুষ এসে দাঁড়ায় খানিক।

এখান থেকে চারচালাটা বেশি দূর নয়। নাটমন্দিরের পর একটা মাঠ তারপর একটা কাঁচা রাস্তা, সেটা পেরিয়েই বাগানের বাঁশের বেড়ার গায়ে কাঠের ফটক। কয়েকটা ফুলগাছের ঝোপ, জোনাকি পোকার আলো, একটু অন্ধকার। খোলা দাওয়ায় একটা চৌকি পাতা, সাদা বিছানা, মেঝেয় চটি জোড়া নিখুঁতভাবে রাখা, একপাশে গড়গড়া। বিছানায় চক্কোত্তিমশাই দুটো বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে থাকেন। গুড়ুক—গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ হয়।

আউন্তি যাউন্তি মানুষজন দু—দণ্ড দাঁড়ায় এসে সামনে। বলে— চক্কোত্তিমশাই, মন্দিরের পুজোয় আর যে যান না!

বুড়ো মানুষটা একগাল হেসে বলেন— রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মেয়েরা ততদিন এই পুতুল খেলে যতদিন বে না হয়। বিয়ে করে আসল ঘরসংসার পেলে আর পুতুল খেলে কে রে?

লোকে একটু—আধটু বোঝে না যে তা নয়।

গুন্টু বোঝে। আরতির পর গুন্টুর অনেকক্ষণ সাড় থাকে না। মগজে তখন কেবল ঘণ্টার শব্দ, কেবল কাঁসির আওয়াজ।

একদিন বলে ফেলেছিল গুন্টু— আরতির পর আমি এক অন্যরকম ঘণ্টার শব্দ শুনি। সে আওয়াজ মন্দিরের নয়, অন্য জায়গা থেকে আসে।

চক্কোত্তিমশাই সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন— খুব মনপ্রাণ দিয়ে শুনবি। কাউকে বলিস না।

গুন্টুর মায়ের কথা মনে নেই। সে মায়ের পেট থেকে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মারা যায়। সেই থেকে সে দিদিমার কাছে। তার বাবা আবার বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে ঝাড়গ্রাম থেকে বাবা তাকে দেখতে আসে। ভারি নিরীহ, ভীতু মানুষ, দ্বিতীয় পক্ষের দাপটে অস্থির। দ্বিতীয় পক্ষ আসতেও দেয় না বড়ো একটা। কিন্তু বাবা এসে গুন্টুকে দেখে ভারি খুশি হয়। একগাল হাসে, বড়ো চোখে হাঁ করে এমনভাবে দেখে যেমন লোভী লোক খাবারের দোকানের দিকে চায়।

বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল— বলো তো বাবা, তোমার কে কে আছে?

গুন্টু ভেবেচিন্তে বলেছিল— দিদিমা, মামা আর চক্কোত্তিমশাই।

বাবা অবাক হয়ে বলে— চক্কোত্তি আবার কে?

—সে আছে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল— আর আমি?

গুন্টু তখন লজ্জা পেয়ে বলে— হ্যাঁ বাবা, তুমিও। আর সৎমা।

—ছিঃ বাবা, সৎমা বলতে নেই। লোকে খারাপ ভাববে। শুধু মা। আরও বলি বাবা, তোমার কিন্তু আর দুটি বোন আছে। তারা তোমাকে ভারি দেখতে চায়। তোমার মা—ও বলে, এবার গুন্টুকে নিয়ে এসো।

গুন্টুর যেতে অনিচ্ছে তা নয়। কিন্তু দিদিমা ছাড়তে চায় না। কথা উঠল বলে, আঁতুড় থেকে মানুষ করছি, ওর নাড়ি আমি ছাড়া আর তো কেউ চিনবে না। অন্যের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মুশকিল হল, গুন্টু শুনেছে, তার সৎমায়ের দুটি মাত্র মেয়ে, আর নাকি ছেলেপুলে হবে না। কিন্তু সৎমায়ের খুব ছেলের শখ। তাই এখন প্রায়ই গুন্টুর বাবাকে বলে, সতীনপোকে নিয়ে এসো, তাকে নিজের ছেলে করে নেব।

তাই বাবা আজকাল খুব ঘন ঘন আসে। গুন্টুও জানে, একদিন তাকে হয়তো ঝাড়গ্রামে চলে যেতে হবে। সৎমাকে সে দ্যাখেনি। তবে 'মা' বলে কাউকে ডাকতে খুব ইচ্ছে করে তার। আবার এ জায়গা ছেড়ে, দিদিমা, মামা আর চক্কোত্তিমশাইকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছেও করে না। গুন্টুর আজকাল তাই মনটা দু—ভাগ হয়ে গেছে।

মামা প্রায়ই গুন্টুকে বলে— তোকে যা একটা লিডার তৈরি করব না গুন্টু, দেখে নিস। একটু বড়ো হ, তখন জ্ঞানদার কাছে নিয়ে গিয়ে এমন ট্রেনিং দেওয়াব। জ্ঞানদার হাতে কত লিডার তৈরি হয়েছে।

গুন্টুর লিডার হতে খুব ইচ্ছে।

আরতির শেষে আজ বড়ো একা—একা লাগছিল গুন্টুর। কাঁসি বাজানোর সময় আজ তিনধা নাচন নেচেছে। এখন তাম্রপাত্র নিয়ে নাটমণ্ডপের ধারে বসে হাজারটা হাতের পাতায় তামার কুশি দিয়ে চরণামৃত দিচ্ছে। কত হাত! হাতগুলোতে ভয় লোভ হিংসে মাখানো। এক—আধটা হাত ভারি ঠান্ডা। দেখে দেখে আজকাল বুঝতে পারে সে।

একটা সাদা কাঁপা কাঁপা হাত থেকে খানিক চরণামৃত চলকে পড়ে গেল। মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই গুন্টুর। কিন্তু সে ঠিক টের পায় এ হাতটা হল কানাই মাস্টারের। কানাই স্যারের প্রাণে আজ বড়ো কষ্ট।

একটা ছ্যাঁকা খাওয়া, কড়াপড়া বিদঘুটে হাত দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল গুন্টু, এ হল হেম ঘোষ। হেম ঘোষের হাতটা কাকে যেন খুন করতে চায়।

একবার চক্কোত্তিমশাই একটা কচি বেলগাছ দেখিয়ে গুন্টুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— বল তো কত পাতা আছে গাছটার।

ভেবেচিন্তে গুন্টু বলে— হাজার দুই হবে।

—দেখ তো গুণে।

সে বড়ো কষ্ট গেছে। এক মানুষ সমান উঁচু গাছটার নীচে টুল পেতে তার ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাতা গুণতে হল। দাঁড়াল চার হাজারের ওপর। তবু একটা আন্দাজ হল।

সেই থেকে চক্কোত্তিমশাই এরকম হরেক জিনিস আন্দাজ করতে শেখান গুন্টুকে। করতে করতে গুন্টুর আন্দাজ ভারি চমৎকার হয়েছে। খুব ঝুপসি গাছ হলেও তা দেখে টকাস করে বলে দিতে পারে তাতে পাতা কত। জানে, গুনে দেখলে ঠিক মিলে যাবে।

চক্কোত্তিমশাই শিখিয়েছেন, রোজ রাতে শোওয়ার আগে বিছানায় বসে সারাদিনের কথা ভাববি। সকাল থেকে কী করলি, কী খেলি, সব হুবহু মনে করা চাই। এ না করে ঘুমোবি না।

তাই করত রোজ গুন্টু। ছ—মাস পর তার বেশ তরতরে মন হল। টক করে সব মনে পড়ে যেতে থাকে। তখন চক্কোত্তিমশাই শেখালেন, এবার রোজকার কথা, আর তার সঙ্গে আগের দিন, আগের—আগের দিন এইভাবে মনে করবি। করতে করতে দেখবি একদিন তোর আর—জন্মের কথা মনে পড়ে যাবে।

—তাতে কী হয় চক্কোত্তিমশাই?

—তাহলে আর মানুষ মরে না। দেহ ছাড়ে, কিন্তু মরে না।

গুন্টুর দিকে আর—একটা হাত এগিয়ে আসে। হাতে শাঁখা, তাতে সিঁদুরের দাগ। গুন্টু যেন এ হাত চেনে। কুশি তুলেও গুন্টু থেমে থাকে। এ হাত কি চরণামৃত চায়? না এ হাত একটা ছেলে চায়। এ হাতের বড়ো আকুলিবিকুলি।

হাতটা ওই অত হাতের ভিড়ের ভিতর থেকে একটু ওপরে উঠে এসে গুন্টুর থুতনি ধরে মুখখানা ওপরে তুলল। আর তখন নাটমন্দিরের জোর আলোয় একজোড়া জল—টলটলে চোখ দেখতে পায় গুন্টু। ঘোমটার নীচে ফরসা মুখ। ঠোঁটে একটা কান্নায় ভেজা হাসি। পিছনেই বাবা দাঁড়িয়ে। ভারি তটস্থভাবে বাবা মহিলাটির কাঁধে হাত দিয়ে বলল— এখন না। ও এখন ব্যস্ত। বাড়িতে যাক ভালো করে দেখো।

চোখ বুজে মহিলাটি বলে— এ যে দেবতার মতো ছেলে। আমার সতীন বড়ো ভাগ্যবতী ছিল।

গুন্টু ভারি লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হাতে হাতে চরণামৃত ঢেলে দিতে থাকে সে। মাথা নীচু। কারও মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই।

পাঁচ

রেবা ঝুঁকে গানের খাতা দেখছিল। গানের মাস্টার প্রভাস খানিকক্ষণ তবলায় আড় চৌতাল তুলবার চেষ্টা করে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। নতমুখী রেবার দিকে চেয়ে রইল খানিক। বেশ দেখতে মেয়েটা। মাঝে মাঝে এমন করে তাকায় যে ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

প্রভাস অনেকদিন ধরেই বুঝবার চেষ্টা করছে, রেবার হাবভাবে কোনো ইঙ্গিত আছে কি না। মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, আছে। আবার কখনো মনে হয়, না, নেই।

আছে কি নেই সেটা বুঝবার জন্যও একটা কিছু করা দরকার। ধসা কানা হয়ে বসে থেকে কোনোদিনই তা বোঝা যাবে না।

ভাবতে ভাবতে প্রভাস একবার বাঁয়ার একটা টুম শব্দ তুলল। রেবা তাকাল না। বাঁ—হাতখানা হারমোনিয়ামের ওপর দিয়ে এসে ঝুলছে। কী চমৎকার আঙুল। এই মেয়ের বর কিনা হেম ঘোষ! কাকের মুখে কমলালেবু।

প্রভাস আন্দাজ করে, হেম ঘোষের বউ হয়ে রেবা নিশ্চয়ই খুব সুখী নয়। তাহলে রেবা প্রভাসকে একেবারে হ্যাটা করবে না।

ভেবেচিন্তে প্রভাস আজ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। একটা কিছু হোক। হয়ে যাক।

গানের সময়ে আজকাল ঘরের লোকজন তাড়িয়ে দরজা দিয়ে জানলার পরদা টেনেটুনে দিয়ে বসে রেবা। সেটাও কি একটা ইঙ্গিত নয়? কোন বোকা এসব ইঙ্গিত ধরতে না পারে?

খুব সাহস হল প্রভাসের। আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল।

একটু ঝুঁকে প্রভাস হঠাৎ রেবার ঝুলন্ত হাতখানা খপাত করে চেপে ধরে ডেকে উঠল— রেবা!

জানলার পরদার ওপাশে অভয়পদ একটা অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা শ্বাস ছেড়ে বেশ জোরে বলে উঠল — আগেই বলেছি কিনা মা, যে মেয়ে সিগারেট খায়, তার চরিত্র ভালো হতে পারে না! এসে দেখে যাও এখন স্বচক্ষে।

ঘরের ভিতরে প্রভাস তখন ছিটকে নেমে পড়েছে চৌকি থেকে। টর্চ জ্বেলে তাড়াহুড়ো করে চটি খুঁজছে। মনের ভুল। ঘাবড়ে গিয়ে ভুলে গেছে যে, চটি দরজার বাইরে ছেড়ে আসে রোজ।

রেবা সাদা মুখে প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল— কী করলেন বলুন তো প্রভাসদা! এখন এ বাড়িতে কি আর থাকা যাবে! কত কষ্টে বাপের বাড়ির কাছেই বাসা খুঁজে বের করেছি। এখন যদি ছাড়তে হয় তবে ও ঠিক আবার ওদের সংসারে নিয়ে গিয়ে তুলবে।

প্রভাস দরজার কপাট হাতড়ে ছিটকিনি খুঁজছে তাড়াতাড়ি।

রেবা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল— এ বাসায় কত সস্তায় ছিলাম জানেন! এ অঞ্চলে পঁচিশ টাকায় ঘর আর পাওয়া যাবে? বাড়িউলি মানুষটা কত ভালো ছিল। ছিঃ—ছিঃ, এ আপনি কী করলেন বলুন তো!

প্রভাস ছিটকিনি খুলে চটি খোঁজার জন্য আর ঝামেলা করল না। দুই লাফে উঠোন পেরিয়ে খালি পায়ে রাস্তায় নেমেই একটা রিকশায় উঠে পড়ল। বলল— জোরে চালাও ভাই।

রেবা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে সজল চোখে তাকিয়ে থাকল একটু। তারপর কেঁদে ফেলল। ইস, অভয়দা দেখে ফেলেছে। এখন ঠিক বাড়ি—ছাড়া করবে তাদের।

উঠোনের ওপাশের অন্ধকার থেকে কালিদাসীর গলা আসছিল— তোরই বা উঁকি মারতে যাওয়ার কী দরকার! ওসব লোক ওরকমই হয় বাবু। তুই নিজের কাজে যা!

—যাচ্ছি।

—গুন্টুকে ডেকে দিস তো। দুপুর থেকে ছেলের টিকি নেই।

রেবার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল— মাসিমা, আমাদের বাসা ছাড়তে বলবেন না। আমি গানের মাস্টারকে ছাড়িয়ে দেব।

কিন্তু তা আর বলা হল না। সিঁড়িতে শব্দ করে কালিদাসী উঠে গেল।

গুম হয়ে বসে রইল রেবা। এ বাড়িতে যে কত সুবিধে! খুব সস্তায় কালিদাসীর কাছ থেকে ঘুঁটে কেনে রেবা। আড়াই টাকা সের দরে খাঁটি গোরুর দুধ কেনে।

প্রভাসের জন্য সব গেল।

ছয়

নাটমন্দিরের নীচে নেমে এসে কানাই মাস্টার হাজার জোড়া জুতোর মধ্যে নিজের জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। জায়গাটা একটু অন্ধকার মতোও বটে।

হেম ঘোষ নেমে এসে বলল, কী খুঁজছেন মাস্টারমশাই, জুতো? বলে ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরল।

কানাই জুতো খুঁজে পেয়ে হেম ঘোষকে বলল, যাবেন নাকি বাজারের দিকে?

একা চলাফেরা করতে আজ কানাইয়ের ঠিক সাহস হচ্ছে না। মারাটা বড়ো খারাপ হয়েছে মদনকে। একবার যাবে চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে, ফাঁকমতো।

হেম ঘোষ উদাস গলায় বলে— সকালেই বাজার করেছি। তা আমার আর কাজ কী, চলুন বরং বাজার থেকে ঘুরেই আসি একটু। বাজার জায়গাটা ভালো।

হেমের মনে একটা পোকা কামড়াচ্ছে তখন থেকে। একা ঘরে রেবা আর গানের মাস্টার। চোখে—চোখে কথা হচ্ছে না তো! কিংবা হারমোনিয়ামের রিডে একজনের আঙুলে অন্যজনের আঙুল ছোঁয়া লাগে যদি! এর চেয়ে নিজেদের সংসারে বেশ ছিল। দশ জোড়া পাহারা দেওয়ার চোখ ছিল সেখানে। কাঁকড়াবিছের কথাও ভাবে হেম ঘোষ। ওষুধটা চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

মনের কথা মনে রেখে দু—জনে অন্য সব কথা বলতে বলতে বাজারপানে যেতে থাকে।

সাত

কালিদাসী ডাক শুনে বারান্দায় এসে দেখে উঠোনে জামাই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে বউ আর দুটো মেয়ে।

কালিদাসী শ্বাস ছাড়ে। জামাই আসবে জানাই ছিল। গুন্টুকে বুঝি এবার নিয়ে যায়।

—এসো। বলে নীরস গলায় ডাকে কালিদাসী।

ওরা উঠে আসে।

জামাই প্রণাম করতে করতেই বলে— গুন্টুকে নিয়ে যেতে এলাম মা। অনেকদিন হয়ে গেল। আপনারও কষ্ট বুড়ো বয়সে।

কালিদাসী মন্দার মাকে মিষ্টি আনতে পাঠায়। তারপর গম্ভীরমুখে এসে সামনে বসে। বলে— যার ধন সে তো নেবেই। ঠেকাবো কোন আইনে। এই বুঝি মেয়ে দুটি? বেশ মিষ্টি হয়েছে দেখতে। আর এ আমার নতুন মেয়েটিও বেশ।

এসবই মুখের ভদ্রতা। বুকটা ভিতরে ভিতরে জ্বলে যায়। কাঁকড়াবিছে কোন ফাঁকে পাঁজর কেটে বুকের ভিতর সেঁধিয়েছে। এ হুলের বড়ো জ্বালা।

খানিকক্ষণ বসে গল্পগাছা করে ওরা চলে গেল। কাল সকালে গুন্টুকে নিতে আসবে।

কালিদাসী একটা চাদর গায়ে নীচে নেমে এসে ডাকল— রেবা। ও রেবা!

রেবা শুয়ে ছিল বিছানায়। ডাক শুনে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। এই বুঝি বাড়ি ছাড়বার কথা বলতে এসেছে!

কিন্তু না। কালিদাসী বলল— আমাকে একবার ছক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে যেতে হবে। মন্দার মা বাড়ি গেল, তা তুমি যদি একটু সঙ্গে চলো মা। আমার তো চোখে ভালো ঠাহর হয় না রাতবিরেতে।

—যাচ্ছি মাসিমা। বলে রেবা তক্ষুনি চটি পায়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে অবশ্য জিভ কাটল রেবা। চটিজোড়া তার নয়, প্রভাসের। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় বুঝতে পারেনি। এখন আর কিছু করার নেই।

রেবা বলল, মাসিমা, আমার কী দোষ বলুন। লোকটা যে ওরকম তা কি জানতাম!

কালিদাসীর বুকভরা তখন গুন্টুর চিন্তা। বলল, সে জানি বাছা। আজকালকার লোক বড়ো ভালো নয়। সাবধানে থাকবে।

রেবা কালিদাসীকে ধরে খুব যত্নে কাঁচা ড্রেনটা পার করাল। মনে মনে বলল,চক্কোত্তিমশাই, দ্যাখো বুড়ি যেন আমাদের না তাড়ায়।

আট

গুন্টুকে নিয়ে রেলগাড়ি হাওড়া ছেড়েছে অনেকক্ষণ। জানলার ধারে বসে সে এখন বাইরে গ্রাম আর খেত দেখছে। গা ঘেঁষে ছোটোবোন দুটি বসে। মা একটু তফাত থেকে মাঝে মাঝে মুগ্ধচোখে তার মুখের দিকে চাইছে। আর বার বার জিজ্ঞেস করছে, খিদে পেয়েছে বাবা তোমার? কিছু দিই। সন্দেশ আছে, রসগোল্লা, লুচি। কত এনেছি দ্যাখো! বাবা একবার কানে কানে জিগ্যেস করেছিল— মাকে তোর পছন্দ হয়েছে তো গুন্টু?

গুন্টু ঘাড় নাড়ল। বেশ মা। বোন দুটিও বড়ো ভালো। এরকম মা বোন তার ছিল না তো এতদিন! দিদিমা বড়ো কেঁদেছে ভুঁয়ে পড়ে। মামা স্টেশন পর্যন্ত শুকনো মুখে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসেনি। মনটা বড়ো খারাপ লাগে। আবার ভাবে, নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে না জানি কত ফুর্তি হবে! কত খেলা!

নয়

দিন ফুরোয়। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। কানাই মাস্টার টিউশনিতে বেরোল। হেম আজ গেল রেবাকে নিয়ে সিনেমায়। অভয়পদ পরোটা খেয়ে পুজো কমিটির মিটিং—এ যাওয়ার সময় বলে গেল— মা, যাই। কালিদাসী শুনতে পেল না, সে তখন গোয়ালঘরে গোরু দুটোর সঙ্গে রাজ্যের কথা ফেঁদে বসেছে।

দিনটা গেল, যেমন যায়।

পরপুরুষ

করালী গোরু খুঁজতে বেরিয়েছিল। আর তারক বেরিয়েছিল বউ খুঁজতে। কালীপুরের হাটে সাঁঝের বেলায় দু—জনে দেখা। বাঁ—চোখে ছানি এসেছে, ভালো ঠাহর হয় না। তবু তারককে চিনতে পেরে করালী বলল, তারক নাকি?

আর বলো কেন দাদা। মাগি সকাল থেকে হাওয়া।

ঝগড়া করেছিস?

সে আর কোনদিন না হচ্ছে! আজ আবার বাগান থেকে মস্ত মানকচুটা তুলে নিয়ে বেরিয়েছে। আমি ভাবলুম কচু বেচতে যদি হাটে এসে থাকে।

বাঁধা বউ, ঠিক ফিরে যাবে। আমার তো তা নয়। গোরু বলে কথা, অবোলা জীব। হাটে যদি হাতবদল হয় তো মস্ত লোকসান।

গো—হাটা ঘুরে দেখেছ?

তা আর দেখিনি! পেলুম না।

ভেবো না। গোরুও ফিরবে। চল, পরানের দোকানে বসি।

পরাণ তাড়ির কলসি সাজিয়ে বসে, একখানা বারকোশে ভাঁড় আর কাচের গ্লাস সাজানো। আশেপাশে খদ্দেররা সব উবু হয়ে বসে ঢকাঢক গিলছে। দু—জনে সেখানে সেঁটে গেল।

কালীপুরের হাট একখানা হাটের মতো হাটই বটে। দশটা গাঁ যেন ভেঙে পড়ে। জিনিস যেমন সরেস দামও মোলায়েম। এই সন্ধের পরও হ্যাজাক, কারবাইড, টেমি জ্বেলে বিকিকিনি চলছে রমরম করে। হাটেবাজারে এলে মনটা ভালো থাকে তারকের। পেটে তাড়ি টাড়ি গেলে তো আরও তর হয়ে যায়। তবে কিনা বউটা সকালবেলায় পালিয়ে যাওয়ায় আজ সারাদিন হরিমটর গেছে। রান্নাটা আসে না তারকের। ছেলেবেলায় এই কালীপুরের হাটেই এক জ্যোতিষী তার মাকে বলেছিল, বাপু, তোমার ছেলের কিন্তু অগ্নিভয় আছে। আগুন থেকে সাবধানে রেখো। তাই মা তাকে গা ছুঁইয়ে বাক্যি নিয়েছিল, আগুনের কাছে যাবে না। মায়ের কথা ভাবতেই চোখটা জ্বালা করল। মা মরে গিয়ে ইস্তক কিছু ফাঁকা হয়ে গেছে যেন। দুপুরে গড়ানো বেলায় মুকুন্দর দোকানে চারটি মুড়ি—বাতাসা চিবিয়েছিল। এখন খিদেটা চাগাড় মারছে।

করালী যেন মনের কথা টের পেয়েই বলল, নন্দকিশোরের মোচার চপ খাবি?

খুব খাব।

পয়াসা দিচ্ছি, যা নিয়ে আয়।

নন্দকিশোরের মোচার চপের খুব নামডাক। সারা দিনে দোকানে যেন পাকা কাঁঠালে মাছির মতো ভিড়। এখন সন্ধেবেলায় ভিড় একটু পাতলা হয়েছে। সারা দিনে না হোক কয়েক হাজার টাকার মাল বিক্রি করে নন্দকিশোরের হ্যাদানো চেহারা। চারটে কর্মচারীও নেতিয়ে পড়েছে যেন।

নন্দকিশোর মাথা নেড়ে বলল, মোচা কখন ফুরিয়ে গেছে। ফুলুরি হবে। তবে গরম নয়।

আহা একটু গরম করে দিলেই তো হয়।

উনুন ঝিমিয়ে পড়েছে বাপু। এখন আঁচ তুলতে গেলে কয়লা দিতে হবে। শেষ হাটে আর আঁচ তুলে লোকসান দেব নাকি দু—টাকার ফুলুরির জন্য?

তা বটে। তারক এধার—ওধার খুঁজে দেখল। শেষে মুকুন্দ দলুইয়ের দোকানে গরম চপ পেয়ে নিয়ে এল।

খালি পেটে ঢুকে চপ যেন নৃত্য করতে লাগল। তার ওপর তাড়ি গিয়ে যেন গান ধরে ফেলল। ভিতরে যখন নাচগান চলছে তখন তারক বলল, কালীপুরের হাট বড়ো ভালো জায়গা, কী বলো করালীদা!

জিবে একটা মারাত্মক কাঁচালঙ্কার ঘষটানি খেয়ে শিসোচ্ছিল করালী। এক গাল তাড়িতে জ্বলন্ত জিবটা খানিক ভিজিয়ে রেখে ঢোঁক গিলে বলল, সেই কোমরে ঘুনসি—পরা বয়সে বাপের হাত ধরে আসতুম, তখন একরকম ছিল। এখন অন্যরকম।

তারকের বাঁ—পাশে একজন দাঁত উঁচু লোক তখন থেকে দু—খানা সস্তা গন্ধ সাবান বাঁ—হাতে ধরে বসে আছে। ডান হাতে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাবান দু—খানা দেখছে বারবার।

পেটের মধ্যে নৃত্যগীত চলছে, মেজাজটা একটু ঢিলে হয়েছে তারকের। লোকটার দিকে চেয়ে বলল, সাবান বুঝি বউয়ের জন্য?

লোকটা উদাস হয়ে বলল, বউ কোথা? ঘাড়ের ওপর দু—দুটো ধুমসি বোন, মা—বাপ। মুকুন্দ বিশ্বেস সাফ বলে দিয়েছে, আগে পরিবার থেকে আলগা হও, তারপর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।

তা আলগা হতে বাধা কী? হলেই হয়। আজকাল সবাই হচ্ছে।

ভয়ও আছে। মুকুন্দ বিশ্বেসের ছেলের সঙ্গে তার ঝগড়া। মেয়ের বিয়ে দিয়েই মুকুন্দ আর তার বউ আমার ঘাড়ে চাপবার মতলব করছে।

ও বাবা! সেও তো গন্ধমাদন।

তাই আর বিয়েটা হয়ে উঠছে না।

করো কী?

ভ্যানরিকশা চালাই। নয়াপুর থেকে কেশব হালদারের মাল নিয়ে এসেছি। হাটের পর ফের মাল নিয়ে ফেরা। আর সাবানের কথা বলছ! সে কি আর শখ করে কেনা! লটারিতে পেলুম।

বাঃ। লটারি মেরেছ, এ তো সুখের কথা।

ছাই । ওই যে লোহার রিং ছুড়ে—ছুড়ে জিনিসের ওপর ফেলতে হয়। রিং—এর মধ্যিখানে যা পড়বে তা পাবে। ফি বার দু—টাকা করে। তিরিশখানা টাকা গচ্চা গেল। তার মধ্যে একবার এই সাবান দু—খানা উঠল। যাচাই করে দেখেছি, এ সাবান চার টাকা পঞ্চাশ পয়সায় বিকোয়।

লটারি মানেই তো তাইরে ভাই। তুমিই যদি সব জিতে যাও তাহলে লটারিওয়ালার থাকবে কী?

দাঁত—উঁচু লোকটা এক চুমুক খেয়ে বলল, সবারই সব হয়, শুধু এই ভ্যানগাড়িওয়ালারই কিছু হয় না, বুঝলে! মা একখানা ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছিল, ট্যাঁকে আছে এখনও। সেসব আর নেওয়া হবে না। ক—টা বাজে বলো তো!

তারকের হাতে ঘড়ি নেই। আন্দাজে বলল, তা ধরো সাতটা সাড়ে—সাতটা হবে।

উরেব্বাস রে! কেশব হালদার মাল গোটাতে লেগেছে। যাই।

করালী শিসোচ্ছিল।

উঠবে নাকি গো করালীদা।

করালী একটা হাই তুলে বলল, গোরুটার কথাই ভাবছিলুম।

কী ভাবলে?

বাঁজা গোরু। পুষতে খরচ আবার বেচতেও মন চায় না। কিনবেই বা কে বল!

তাই বলো, বাঁজা গোরু। তা গেছে আপদই গেছে। ভাবনার কী?
আছে রে আছে। আমার ছোটোমেয়ে পদীর বড়ো ভাব গোরুটার সঙ্গে।
পাল খাইয়েছ?
কিছু বাকি রাখিনি। আর দুটো গোরু বিয়োয়, দুধও দেয়। এটাই দেয় না।
এত বড়ো হাটে বউ খোঁজা মানে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার শামিল। এসে থাকলেও এত রাত অবধি তো আর হাটের মাটি কামড়ে সে নেই। বউ যদি রাতে না ফেরে তাহলে রাতেও হরিমটর। তারক ভাবছিল আরও কয়েকখানা চপ সাঁটিয়ে নেবে কি না। তারপর এক ঘটি জল খেয়ে নিলেই হল। কিন্তু পয়সার নেশাটা চৌপাট হয়ে গেলে মুশকিল।

২

পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষের সম্পর্ক নাকি চিড়েতন। আ মোলো। সম্পর্কের আবার চিড়েতন, হরতন, ইস্কাপন, রুইতন হয় নাকি? হলেও বাপু, যমুনা কি সেসব বোঝে! তবে কিনা নরেনবাবু ভদ্রলোক, মেলা জানেশোনে। নরেনবাবুর কথা তো আর ফ্যালনা নয়।
একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, চিড়েতনটা আবার কী, বলো তো বাবু?
নরেনবাবু হেসেটেসে বলল, এই ধর তুই আর আমি। আমিও কারও কেউ নই, তুইও কারও কেউ নোস। যেমন জলের মাছ, কে কার মা—বাপ জানে ওরা? তবু তো ডিম ছাড়ছে, বাচ্চচা বিয়োচ্ছে। ব্যাপারটা ওরকমই আর কী। চিরন্তন মানে হচ্ছে আদি সম্পর্ক— বুঝলি না?
যমুনা বুঝি—বুঝি করেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। তবে এটা ঠাহর হল যে, ওই চিড়েতনের মধ্যেই প্যাঁচটা আছে।
প্যাঁচ বুঝতে যমুনার কেন— কোনো মেয়েমানুষেরই দেরি হয় না। যমুনার এই সতেরো বছর বয়স হল। এক বছর হল পুরুষমানুষ ঘাঁটছে। পুরুষটা হল তার বর তারক। একদিন মিটমিট করে হেসে বলেছিল, বাবুর বাড়িতে কাজে যাস, তা কখনো পিট—ঠিট চুলকে দিতে বললে দিস। নরেনবাবুর মেলা পয়সা। প্যাঁচ বুঝতে যমুনার দেরি হয় না।
আর একদিন বলল, আহা, বাবুর বউটা বোবা, পীরিতের কথা—টথা কইতে পারে না। পুরুষমানষ একটু ওসব শুনতে—টুনতে চায়।
প্যাঁচ। যমুনা বুঝতে পারে। চিড়েতনটা বুঝতেও তার অসুবিধে হয়নি।
নরেনবাবুর বউ মলয়া বোবা—কালা। তবে সে পয়সাওলা নিতাই রায়ের মেয়ে। নিতাই রায় পঞ্চাশ হাজার টাকায় নরেনবাবুকে কিনেছে। এ কথা সবাই জানে। নগদ ছাড়াও বাড়িঘর ঠিকঠাক করে দেওয়া, মেয়ের নামে জমিজমা লিখে দেওয়া তো আছেই। নরেনবাবুকে তাই আর কিছু করতে হয় না। শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটছিল। তবে বেকার জামাই বলে লোকে টিটকিরি না দেয় সেজন্য ইদানীং নয়নপুরের বাজারে একখানা ওযুধের দোকানও করে দিয়েছে নিতাই রায়। গাঁয়ের দোকান, সেখানে ওষুধ ছাড়াও নানা জিনিস রাখতে হয়। তা নরেন হল বাবু মানুষ। সকালের দিকে শ্রীপতি নামে এক কর্মচারী দোকান দেখে, সন্ধেবেলা নরেনবাবু গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে আসে। সেখানে কিছু ইয়ারবন্ধুও জোটে এসে। শোনা যাচ্ছে, নরেনবাবুর গদাইলশকরি চালে সুবিধে হয়েছে শ্রীপতির। সে দু—হাতে লুটে নিচ্ছে। তারকের তাই ইচ্ছে, শ্রীপতিকে সরিয়ে চাকরিটা সে বাগায়।
সোজাসাপটা ব্যাপার। এতে কোনো প্যাঁচও নেই। মানুষ কত কী চায়, আর চাইবেই তো! নেই বলেই চায়। কিন্তু চাইলেই তো হল না। দিচ্ছে কে? আর তখনই প্যাঁচটা লাগে।
মলয়ার দুটো মেয়ে। একটা সাড়ে তিন বছরের, একটা দু—বছরের। তারা কেউ বোবা—কালা নয়। বড়োটা পাড়ার খেলুড়িদের সঙ্গে খেলতে শিখেছে, আর ছোটোটা সারা বাড়িতে গুটগুট করে হেঁটে বেড়ায়।

এ দুটো মেয়ে হচ্ছে মলয়ার জান। যখন আদর করে তখন খ্যাপাটে হয়ে যায়। আর সারা দিনে মাঝে মাঝেই মেয়েদের আঁ আঁ করে ডাকে। মেয়ে দুটো মায়ের ডাক ঠিক বুঝতে পেরে ছুটে আসে। মেয়ে দুটোর দেখাশোনা করত উড়নচণ্ডী পটলী। ছোটোমেয়েটা তখন সবে হামা দেয়। পটলী তাকে বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে উঠোনে দিব্যি এক্কা—দোক্কা খেলছিল। মেয়েটা গড়িয়ে পড়ে হাঁ করে এমন টান ধরল যে দম বুঝি ফিরে পায় না। মাথা ফুলে ঢোল। শোনার কথাই নয় মলয়ার। তবু মায়ের মন বলে কথা। কোথা থেকে পাখির মতো উড়ে এসে মেয়ে বুকে তুলে নিল। তারপর সে কী তার ভয়ংকর চোখ আর ভৈরবী মূর্তি। পটলী না পালালে বোধহয় খুনই হয়ে যেত মলয়ার হাতে। বোবাদের রাগ বোধহয় বেশিই হয়। কথা দিয়ে দুরমুশ করতে পারে না, গালাগাল দিয়ে বুক হালকা করতে পারে না, তাই ভিতরে ভিতরে পোষা রাগ গুমরে ওঠে।

পটলীর জায়গায় এখন যমুনা। মেয়েদের দেখে শোনে, ধান শুকোয়, ঢেঁকি কোটে, গেরস্ত বাড়িতে তো কাজের আকাল নেই। আবার ছুটে গিয়ে ঘরের অকালকুষ্মাণ্ড ওই তারকের জন্যও রেঁধে রেখে আসতে হয়। তা বলে খারাপ ছিল না যমুনা। খাটনিকে তো তার ভয় নেই, চিরকাল গতরে খেটেই বড়োটি হল। কিন্তু ভয়টা অন্য জায়গায়। সে হল ওই মলয়া। বোবা কালা হলে কী হয়, যমুনার বিশ্বাস, মলয়া অনেক কিছু টের পায়। শুনতে না পেলেও টের পায়। মাঝে মাঝে কেমন যেন বড়ো—বড়ো চোখ করে তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। একটু ভয়—ভয় করে যমুনার।

নরেনবাবু ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। একদিন বলল, নারী আর নদীতে কোনো তফাত নেই, বুঝলি মেয়েছেলে হল বওতা জল, ডুব দিয়ে উঠে পড়ো। নদী কি তাতে অশুদ্ধ হল? এই যে গঙ্গায় কত পাপী—তাপী ডুব দেয়, গঙ্গা কি তাতে ময়লা হয় রে!

আগে যমুনা শুধু শুনত, কিছু বলত না। আজকাল বলে। সে ফস করে বলে ফেলল, তোমার কি কোনো কাজ নেই বাবু? সকালের দিকটায় দোকানে গিয়ে বসলেও তো পারো। শ্রীপতি তো শুনি দোকান ফাঁক করে দিচ্ছে।

নরেনবাবু একটা ফুঃ শব্দ করে বলল, দিক না, তাতে আমার কী? দোকান শ্বশুরের, শ্রীপতিও তার লোক। সে বুঝবে। আমার ওতে মাথা গলানোর কী? আমি খাব—দাব ফুর্তি করব । বোবা—কালা বিয়ে করেছি কি মাগনা?

শ্বশুর কি আর চিরকাল থাকবে? দোকান তো তোমারই হবে একদিন।

আমার নয় রে, আমার নয়। দোকান ওই বোবা—কালার নামে। ও আমি চাইও না। দু—টাকার জিনিস চার টাকায় বিক্রি করে পয়সা কামানোর ধাতই আমার নয়। আমাকে কি তাই বুঝলি?

আর—একদিন আরও একটু এগোল নরেনবাবু। কথা নয়, একখানা তাঁতের শাড়ি দিয়ে বলল, কাল সকালে পরে আসিস। তোকে মানাবে। এসে একটু ঘোরাফেরা করিস চোখের সামনে।

খুশি হল তারকও। বলল, বাঃ—বাঃ, এই তো কাজ এগোচ্ছে।

তার মানে?

নরেনটা তো ভিতুর ডিম। ভাবছিলুম আর বুঝি এগোবে না।

কী বলতে চাও তুমি বলো তো!

দোষ ধরিসনি। একটু মাখামাখি করলে যদি কাজ হয় তো ভালোই।

তাই যদি হবে তাহলে তো বাজারে গিয়ে নাম লেখালেই পারতুম।

চটিস কেন? পেটের দায় বলে কথা। শ্রীপতি শালা তো শুনছি, কৈলাসপুরে চার কাটা জমি কিনে ফেলেছে।

তাতে তোমার কী?

জ্বলুনি হয়, বুঝলি, বুকের মাঝখানটায় বড্ড জ্বলুনি হয়। ঘরামির কাজ করে করে হাতে কড়া পড়ে গেল, সুখের মুখ দেখলাম না। প্রথমটায় বাধো—বাধো ঠেকলেও পরে দেখবি ব্যাপারটা কিছুই না। আমিও যা, ওই

নরেনবাবুও তা।

তোমার মুখে পোকা পড়বে।

ওরে শোন, ও চাকরির মতো সুখের চাকরি নেই। মালিক চোখ বুজে থাকে, হিসেব চায় না। এমনটা আর কোথায় পাবি?

এই টানাপোড়েনের মধ্যে দিন কাটছিল যমুনার। একদিন বিকেলে ভিতরের বারান্দায় বসে মলয়ার চুল বাঁধছিল যমুনা। বেশ চুল মেয়েটার। দেখতেও খারাপ নয় কিছু। মায়াও হয়। খোঁপায় কাঁটা গুঁজে হাত—আয়নাটা মলয়ার হাতে যখন ধরিয়ে দিল তখন হঠাৎ আয়নাটা ফেলে ঘুরে বসল মলয়া। সেই বড়ো—বড়ো চোখ। দু—হাতের হঠাৎ যমুনার দু—কাঁধ খিমচে ধরে ঝাঁকায় আর বলে, আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ...

ভয়ে আত্মারাম, ডানা ঝাপটাচ্ছিল বুকে। কী জোর মেয়েটার গায়ে!

কী করছ বউদি, কী করছ? আমি তো কিছু করিনি।

মলয়া ঝাঁকানি থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল তার চোখের দিকে। তারপর সাপে ব্যাং ধরলে ব্যাং যেমন শব্দ করে তেমনি এক অবোধ শব্দ বেরোতে লাগল তার গলা থেকে। আর দু—চোখে জলের ধারা।

নরেনবাবু পরদিনই বলল, শহরে বেড়াতে যাবি দু—দিনের জন্য? শুধু তুই আর আমি। একটু ফুর্তি করে আসি চল।

ফুঁসে উঠতে পারল না যমুনা। তার কি সেই জোর আছে? জোর হল স্বামীর জোর। তার তো সেখানেই লবডঙ্কা। যমুনা সুতরাং অন্য পন্থা ধরে বলল, তোমার শ্বশুরকে যদি বলে দিই তাহলে কী হয়?

ও বাবা! এ যে আমার শ্বশুর দেখায়! কেন রে, শ্বশুরের কাছে কি টিকিখানাও বাঁধা রেখেছি? নিতাই রায়ই বা কম কীসে? পটলডাঙায় তার বসন্তকুমারীর ঘরে যাতায়াত কে না জানে? কী করবে সে আমার? তুই বড্ড বোকা মেয়েছেলে তো!

শোনো বাবু, বউদি কিন্তু সব টের পায়।

সোহাগের কথা আর বলিসনি। টের পায় তো পায়। কী করবে সে?

যমুনার ভাবনা হল। নরেনবাবুর সাহস বড়োই বেড়েছে, এবার তার বিপদ।

শুনে খ্যাঁক করে উঠল তারক, বিপদ আবার কী? তোকে তো কতবার বলেছি, ওতে কিছু হয় না। তোর আমিও রইলুম। কখনো কলঙ্ক রটিয়ে তোকে বিপদে ফেলব না। নরেনবাবুর সঙ্গে আমার পষ্টাপষ্টি কথা হয়ে গেছে।

কী কথা?

সামনের মাসে চাকরিতে জয়েন দেব।

নরেনবাবু অন্য মেয়েমানুষ দেখে নেয় না কেন?

যার যাকে পছন্দ। তোকে চোখে লেগেছে। ও বড়ো সর্বনেশে ব্যাপার। যাকে চোখে লাগে তার জন্য পুরুষমানুষ সব করতে পারে।

আমি কালই বাপের বাড়ি যাচ্ছি। লাথি—ঝাঁটা খাই, শুকিয়ে মরি, তাও ভালো। তবু নষ্ট হব না।

বিপদে ফেললি দেখছি। বলি, আমার মতো একটা মনিষ্যিকে যদি তোর সব দিয়ে থাকতে পারিস তবে নরেনবাবু দোষটা কী করল? সে দেখতে আমার চেয়ে ঢের ভালো। ফরসা চোখমুখে শ্রী—ছাঁদ আছে । আমি তার পাশে কী বল তো!

তুমি আমার স্বামী।

ওই তো তোর দোষ। স্বামীর মতো স্বামী হলেও না হয় বুঝতুম।

তুমি খারাপ লোক নও। তোমাকে লোভে পেয়েছে।

তোর মাথাটাই বিগড়েছে। আমি খারাপ নই? খুব খারাপ। কেউ আজ অবধি আমাকে ভালো বলেনি।

আমি বলছি। ভালো করে ভেবে দ্যাখো।

নরেনবাবু তোকে চায়। এমনকী এ কথাও বলেছে, সে তোকে বিয়ে করতেও রাজি।

বিয়ে! বলে এমন অবাক হয়ে তাকাল যমুনা যেন ভূত দেখছে।

ভয় পাসনি। তোর একটু ধর্মভয় আছে আমি জানি। আমি সাফ বলে দিয়েছি, বিয়ে—টিয়ে নয় মশাই। আমি বউ ছাড়ছি না। দু—দিন চার—দিন বড়ো জোর।

তোমার একটু বাধল না বলতে? নরকে যাবে যে!

সে দেরি আছে। নরকে মেলা লোকই যাবে। কলিকালে কি নরকযাত্রীর অভাব রে! আগে এ জন্মে কিছু জুত করে নিই। নরক তো আছেই কপালে।

যমুনা রাগ করে বলল, দেখ, আমি সাবিত্রী বেউলো নই, তবে যা বুঝেছি তাই বুঝেছি। আমাকে দিয়ে ও—কাজ হবে না।

তুই বোকাও বটে রে! নরেনবাবুর কী মেয়েছেলের অভাব? তোর কতবড়ো ভাগ্য যে এত মেয়েছেলে থাকতে তুই—ই ও শালার চোখে পড়েছিস। আমি বলি, সময় থাকতে এসব ভাঙিয়ে নে। রূপ—যৌবন সব ভাঙিয়ে মা লক্ষ্মীকে ঘরে এনে তোল আগে।

মা—লক্ষ্মী এমন ঘরে লাথি মারতেও আসবে না।

মনটা ঠিক করে ফেলেছিল যমুনা। এখানে থাকলে যে তার আর পরকাল বলে কিছু থাকবে না তাও বুঝেছে। কিন্তু যায় কোথা? বাপের বাড়ি বলতে তুলসীপোঁতা গাঁয়ে একখানা ঝুপড়ি। এন্ডিগেন্ডি অনেক ভাই—বোনের সংসার। তার বাবা দাদ আর হাজার মলম বিক্রি করে, মা বেচে ঘুঁটে।

৩

বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা তোলপাড় হচ্ছিল। ভোঁস ভোঁস শ্বাসের শব্দ, সেইসঙ্গে কে যেন আদাড়—পাদাড় ভাঙচে।

তারক ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল, ও কী গো?

করালী চাপা গলায় বলল, চুপ!

কান খাড়া করে শুনছিল করালী। বাঁশবনের মধ্যে দুটো চোখ চকচক করে উঠল হঠাৎ।

আহ্লাদের গলায় করালী বলল, ওরে পাজি মাগি, এখেনে সেঁধিয়ে রয়েছিস! আয় আয় বলছি শিগগির।

বাঁশবনে প্রলয়ের শব্দ তুলে আর ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে গোরুটা বেরিয়ে এল। গোরু না হাতি বোঝা ভার। বিশাল চেহারা।

উরেব্বাস রে! এই তোমার গোরু?

গোরুটা করালীর গা—ঘেঁষে দাঁড়াল, তার গলা এক হাতে জড়িয়ে ধরে করালী বলল, আহা, বাঁজা বলেই ওর মনে সুখ নেই কিনা। মনের দুঃখে মাঝে—মাঝে বনবাসে যায়। ফিরেও আসে। চ' চ' পা চালিয়ে চ'। মেয়েটা এতক্ষণে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে।

তারক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি কপালওলা মানুষ, গোরুটা দিব্যি পেয়ে গেলে। এখন আমার বউ কোথা পাই বলতে পারো? আমার কপাল তো আর তোমার মতো নয়।

পাবি পাবি। বাঁধা বউ যাবে কোথায়? মারধর করিস নাকি?

আরে না। সেসব নয়, নরম—সরম আছে, গায়ে হাত তোলার দরকার হয় না। তবে গোঁ আছে খুব। যেটা না বলবে সেটাকে হ্যাঁ করায় কার সাধ্যি।

রথতলার কাছ বরাবর করালী বাঁয়ের রাস্তা ধরল, তারক ডাইনে।

সামনেই মলয়া ফার্মেসি। আলো জ্বলছে। দিব্যি পাকা ঘর। দোকানও বড়োসড়োই। আজ নরেনবাবু নেই। শ্রীপতি একা বসে মাছি তাড়াচ্ছে।

তাকে দেখে শ্রীপতি বিশেষ খুশি হল না। হওয়ার কথাও নয়। মুখটা আঁশটে করে বলল, বাবু নেই।

আসেনি আজ!

না। সকাল থেকেই পাত্তা নেই। বাড়ি থেকেও লোক এসে খুঁজে গেছে।

অ্যাঁ। তবে তো—

শ্রীপতি চেয়ে আছে। বুকটা ধকধক করছিল তারকের। তাড়ির নেশাটা কেটে যাওয়ার উপক্রম।

গেল কোথায় নরেনবাবু?

শ্রীপতি ঠোঁট উলটে বলল, তা কে জানে। বলে যায়নি কিছু। বাড়ির লোকও খুঁজছে।

দুইয়ে—দুইয়ে তবে কি চারই হল? যমুনা আর নরেনবাবু যদি একসঙ্গেই হাওয়া হয়ে থাকে তো শ্রীপতির জায়গায় সামনের মাসে সে—ই জয়েন দেবে।

তারক বসে গেল।

দোকানে বিক্রিবাটা কেমন হে?

বিক্রি কোথায়? ওষুধের স্টকই নেই।

নেই কেন?

ওষুধ কি মাগনা আসবে? টাকাটা দেবে কে?

কেন, নিতাইবাবু দেবে।

দিচ্ছে কোথায়? অন্য সব কারবারে টাকা আটকে আছে। দোকান চলছে, নমো—নমো করে।

ইয়ে— তা উপরি—টুপরি কেমন?

উপরি! সেটা আবার কী? মাসমাইনেরই দেখা নেই তো উপরি।

তারক মৃদু—মৃদু হাসছিল। শ্রীপতি তো আর পাঁঠা নয় যে তার কাছে কবুল করবে।

নরেনবাবু বাড়িতে কিছু বলে যায়নি?

তা কে জানে। ঠসা—বোবা বউ, তাকে বলাও যা না—বলাও তা।

তারক উঠে পড়ল। নাঃ, এতদিনে যমুনার তাহলে সুমতি হয়েছে। নরেনবাবুর সঙ্গেই যদি গিয়ে থাকি—গেছেই— তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা। ওষুধের দোকান মানে কাঁচা পয়সা।

ঘরে ফিরে টেমি জ্বেলে বসে—বসে খানিক ভাবল তারক। খবর নিয়েছে, শ্রীপতির মাইনে মাসে তিনশো টাকা। কম কীসের? বসা চাকরি। তার ওপর উপরি তো আছেই।

মনটা বেশ ভালোই লাগছে তারকের। সে টেমি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

কত রাত হবে কে জানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙল তারকের। কোথা থেকে চেঁচামেচিটা আসছে তা প্রথমে ঠাহর হল না। কারও বিপদ—আপদ হল নাকি?

দরজা খুলে বেরিয়ে এল তারক। মনে হল পুরো গাঁ—ই চেঁচাচ্ছে। মেয়েপুরুষের গলা শোনা যাচ্ছে।

ডাকাত! ডাকাত!

তারক লাফ দিয়ে উঠোনে নামল। তারপর নরেনবাবুর বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। গণ্ডগোলটা ওখানেই হচ্ছে যেন!

নরেনবাবুদের পুরোনো ভাঙা বাড়ি সারিয়ে দালান তুলে দিয়েছে নিতাই রায়। বেশ বড়োসড়ো বাড়ি। উঠোনে ধানের মরাই, টিপকল, পিছনে গোয়াল, ঢেঁকিঘর। বাড়িটা হাতের তেলোর মতোই চেনে তারক।

চেঁচালেও পাড়ার লোক কেউ বেরোয়নি ভয়ে। বাইরের উঠোনে মশাল হাতে কালিঝুলি মাখা একটা লোক দাঁড়িয়ে। হাতে একখানা বড়োসড়ো ছোরা চকচক করছে। আর ভাঙা দরজা দিয়ে আর দু—জন টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে আনছে নরেনবাবুর বোবা—কালা বউটাকে। বউটার শাড়ি খুলে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে ঘর অবধি। তার মুখে কথা নেই, কেবল আঁ—আঁ চিৎকার।

তারক চেঁচিয়ে বলল, ডাকাতি করছ করো, বউটাকে ওরকম করছ কেন হে? অ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দাও। বোবা—কালা মানুষ।

উঠোনের ছোরা হাতে লোকটা একবার তার দিকে ফিরে দেখে একটা হাঁক মারল, ভাগ শালা শুয়োরের বাচ্চচা। পেট ফাঁসিয়ে দেব...

তারক থমকে গেল। হচ্ছেটা কী? ডাকাতি করবি কর। কিন্তু মেয়েছেলেটাকে টেনে বের করছিস কেন? অবোলা মানুষ।

হঠাৎ ঝাঁক করে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তারকের। এ শালারা ভাড়াটে খুনে নয় তো?

চুলের মুঠি ধরে ছেঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে মলয়াকে। একজন খেঁটে মোটা একটা লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে অমানুষিক জোরে। হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার কথা।

আঁ—আঁ—আঁ—আঁ চিৎকারটা চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সাইরেনের মতো। সেই চিৎকারে মড়া মানুষও শিউরে উঠবে। মশালের আলোয় তারক দেখতে পেল, মলয়ার মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

উঠোনের লোকটা ছোরা হাতে এগিয়ে যাচ্ছিল মলয়ার দিকে।

তারক জন্মে মারদাঙ্গা করেনি। সে ভিতু মানুষ। কিন্তু আজ মাথাটা যেন বড্ড তেতে গেল হঠাৎ। চারদিকে ঢেলা আর ইটের অভাব নেই। পুরোনো বাড়ির ভাঙা টুকরো চারদিকে ছড়ানো। তারক একখান ইটের টুকরো তুলে খানিক দৌড় দিয়ে টিপ করে মারল। একটা, দুটো, তিনটে...

মার শালাকে! মার শালাকে...বলে চেঁচাচ্ছিল তারক।

তার পয়লা ইটেই ছোরাওলা মাথা চেপে বসে পড়েছিল। আর ইটগুলো লাগল কি না কে জানে, তবে লোকগুলো ভড়কে ছিটকে গেল এদিক—ওদিক। তারক লাফ দিয়ে গিয়ে উঠোনে ঢুকল।

সামনে একটা খেঁটে লাঠি পড়েছিল। সেইটে তুলে নিল সে। তারপর বসা ডাকাতটা উঠতে যেতেই পাগলের মতো মারতে লাগল তাকে।

কে একজন চেঁচাল, পালা—পালা...লোক আসছে...

ডাকাতের জান বলে কথা। অত পিটুনি খেয়েও লোকটা হঠাৎ উঠে প্রাণভয়ে দৌড় লাগাল। কে কোথায় গেল কে জানে। তবে মেয়েটা বেঁচে গেল এ যাত্রা।

গাঁয়ের লোক বোধহয় তারকের সাহস দেখেই বেরিয়ে এল এতক্ষণে। লহমায় লাঠিসোঁটাধারী পুরুষ আর মেয়েছেলেতে উঠোন ভরতি। মেয়েদের কারও হাতে বঁটি অবধি। চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

মলয়াকে ধরে তুলতে হল। বোবা মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে, চোখে ভূতুড়ে দৃষ্টি। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। তারক পাঁজাকোলা করে তাকে ঘরে এনে শোওয়াল বিছানায়। মেয়ে দুটো চেঁচিয়ে কাঁদছে।

নরেনবাবু কোথায়? নরেনবাবু কি খাটের নীচে নাকি? নাকি পালিয়ে গেছেন? এসব নানাজন জিজ্ঞেস করতে লাগল।

একজন মুনিষ এগিয়ে এসে বলল, বাবু আজ সাতসকালেই একটু শহরে গেছেন। আজ ফিরবেন না।

তারকের গা জ্বালা করছিল হঠাৎ। নরেনশালাই মলয়াকে খুন করতে লোক লাগায়নি তো। শালার যে যমুনার ওপর দারুণ লোভ। তারকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব অবধি দিয়ে রেখেছে।

মাথাটা বড্ড গরম হচ্ছিল তারকের। সবাই এসে পিঠ চাপড়ে যত তার বীরত্বের প্রশংসা করছিল আর ততই তারকের গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাগে। ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার। ডাকাতি নয়, ডাকাতরা অকারণে খুন করে না। এরা খুন করতেই এসেছিল।

তপন হালদারের ছেলে মিতুল মোটরবাইকে করে কালীপুর থেকে মন্মথ ডাক্তারকে নিয়ে এল। গাঁয়ে হোমিওপ্যাথি জগন্নাথ কীসব ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল মলয়াকে। যাই হোক বউটার চোট তেমন মাত্রাছাড়া নয়। মন্মথ ডাক্তার দেখেটেখে বলল, হাড়—টাড় ভাঙেনি। তবে ভোগান্তি আছে।

তারক ভিড়ের বাইরে উঠোনের এক ধারে এসে দাঁড়িয়ে ওপরে চেয়ে আকাশটা দেখল। সে অমানুষ ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের অমানুষ তো পৃথিবীতে আছে দেখা যাচ্ছে।

কালীপুর থানা থেকে পুলিশও এসে পড়ল জিপে করে। জবানবন্দি দিতে দিতে রাত প্রায় ভোর। তারপর তারক বাড়িমুখো রওনা হল। মনটা খারাপ লাগছে। বউটা এঁটো হয়ে পড়ল!

বাঁশঝাড় পেরনোর সময়ে কে যেন বলে উঠল, আমি তো জানতুম তুমি খারাপ লোক নও।

তারক হাঁ।

কে? কে?

আমি।

অন্ধকারেও কি আর চিনতে ভুল হয়?

তুই! তুই নরেনবাবুর সঙ্গে যাসনি?

তোমার কি মুখে কিছু আটকায় না? তার আগে গলায় দড়ি দেব।

তাহলে কোথায় ছিলি?

কোথায় আবার! বউদি লুকিয়ে রেখেছিল নতুন গোয়ালঘরে। ডাকাত যখন পড়ল তখন বেরিয়ে এসে কাণ্ড দেখে খড়ের গাদার পিছনে লুকিয়ে পড়ি। তুমি না এলে আজ কী যে হত!

নরেনবাবু তাহলে কার সঙ্গে গেল?

তার আমি কী জানি! নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলেই তো পালিয়েছিলুম।

ও শালা মহা হারামি। একবার ভেবেছিলুম পুলিশকে বলে দিই, খুনটা ও শালাই করাচ্ছিল।

না—না, ওসব বলার দরকার নেই। আমাদের তো এ গাঁয়েই থাকতে হবে। আমরা গরিব মানুষ।

হুঁ।

আর আমাকে বেচতে চাইবে না তো!

তারক একটু হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে যমুনার একটা হাত ধরে বলল, সেই তারকটা ভেগে গেছে। এখন যে—তারকের হাত ধরে হাঁটছিস সেটা একটা পরপুরুষ।

তারকের হাতে একটা জোর চিমটি কাটল যমুনা।

আমি সুমন

আমি জানি ভিনি আমাকে ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই ভিনি বারবার আমার কাছে ধরা পড়ে যায়; নাকি ইচ্ছে করেই ধরা দেয় কে জানে। তার সঙ্গে প্রথম দ্যাখা সেই শিশুবয়সে। তখন ও ফ্রক পরে, লালচে আভার এক ঢল চুল আর ঠোঁটের ওপরে বাঁ—ধারে একটা আঁচিল, খুব ফরসা রং— ব্যস, আর কিছু মনে নেই।

প্রথম দিন, পনেরো—ষোলো বছর পর প্রথম দিন ভিনি আমার দিকে তাকালই না। কিংবা তাকিয়ে এক পলকেই সব দেখে এবং জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভালোমানুষ সেজে গেল নিজের মা—র সামনে, কে জানে। বসল খাটের ওপর জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

সুমন, এই হচ্ছে ভিনি। ওর মা বললেন, তাঁর চোখেমুখে অহংকার ঝলমল করছিল, আরও অনেক নিঃশব্দ কথা ছিল তাঁর মুখে যা তিনি বললেন না, আমি বুঝে নিলুম— দ্যাখো তো আমার ভিনি কী সুন্দর হয়েছে। দ্যাখো ওর আঙুল, ওর চুল, ওর মুখের ছাঁদ, কথা বলে দ্যাখো কী সুন্দর মিষ্টি ওর গলার স্বর, রাজপুত্রের যুগ্যি আমার ভিনি।

এইসব কথা ভিনির মায়ের মুখে লেখা ছিল কিংবা বলা ছিল। আমি বুঝে নিলুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নিজের জন্য লজ্জা হচ্ছিল আমার। আমি তেমন কিছু হলুম না কেন। ভিনির বয়স হয়েছে বিয়ের, তবু কোনোদিন ওর অভিভাবকেরা আমার কথা ভাববে না— আমি বুঝে গেলুম প্রথমদিনের প্রথম কয়েক মিনিটেই। মনে মনে বললুম— পালা সুমন, মনে মনে যোগী ঋষি হয়ে যা। ছেলেবেলায় তুই যে সুন্দর ছিলি একথা অনেকেই ভুলে গেছে। এখন কাঠুরের মতো চেহারা তোর, গুন্ডাদের মতো ছোটো করে ছাঁটা চুল, মুখের ভাব চোর চোর, কাঠ হয়ে বসে আছিস।

কতদিন দেখা নেই! ভিনির মা বলে— কী করে আমাদের ঠিকানা পেলে?

সেটা আমার গুপ্ত কথা। তাই বললুম না, হেসে এড়িয়ে গেলুম। বুঝলুম ভিনি যে আমাকে তিনটে চিঠি লিখেছিল পরপর তার কথা ওর বাড়ির কেউ জানে না। তার প্রতিটিতেই লেখা ছিল— একবার আসবেন। আপনাকে বড়ো দরকার আমার। আমারও প্রশ্ন— আমার ঠিকানা ভিনি পেল কোথায়?

দরকারটা আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেননা ভিনি জানালার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে ছিল। অথচ পনেরো—ষোলো বছর পর দেখা, তারও আগে দরকারের চিঠি দেওয়া!

চা খেয়ে আমি উঠে পড়লুম— চলি।

আবার আসবে তো? ভিনির মা বলল— আমরা আর তিন—চার মাস কলকাতায় আছি। উনি রিটায়ার করলেন, হেতমপুরে ওঁদের দেশেই আমাদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে, দু—তিনটে ঘরের ছাদ বাকি, ছাদ হলেই আমরা চলে যাব। এর মধ্যেই এসো আবার। মা—বাবা কেমন? বলে হাসলেন— কতদিন ওঁদের দেখি না।

হ্যাঁ আসব বলেই বেরিয়ে আসছিলুম, মনে মনে তাগাদা দিচ্ছিলুম নিজেকে— পালা সুমন, ভিতুর ডিম, আর আসিস না কখনো।

সিঁড়িতে পা যখন দিয়েছি তখনই গলার স্বর শুনলুম— আমি অহংকারী নই।

একঝলক ফিরে দেখলুম— পিছনে সেই লালচে চুলের ঢল আধো আলোতেও ঝলমল করছে মুখ। পাশে ওর মা দাঁড়িয়ে। তবু সংকোচ নেই, কেবল ওর মায়ের মুখে একটু শুকনো ভাব আর জোর করা হাসি।

পালালুম।

দুই

এতকাল আমি শান্তিতে ছিলুম। ছোট্ট একটা ঘর আমার। ছায়াময়, একটু গলির ভিতরের নির্জনে। সারাদিন প্রায়ই কথা না বলে কাটানো যেত। লোকে আমার নাম জানে না, খুব কম লোকেই আমাকে চেনে। আমি নিজের কাছেই নিজের সুমন। ভালোবাসার, আদরের সুমন।

বাড়িওলার বউ বলল— আপনার কাছে একজন এসেছিল।

—কে? অন্যমনস্ক আমি সিঁড়ি ভাঙতে—ভাঙতে ঘাড় না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

—সুন্দরমতো একজন।

চমকে মুখ ঘুরিয়ে দেখি বাড়িওলার বউয়ের মুখে একটু সবজান্তা হাসি। ওঁর অনেক বয়স তবু হাসিটা সুন্দর দেখাল— মায়ের মতো হাসি।

দুটো সিঁড়িতে দু—পা রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম।

—খুব সুন্দর। বাড়িওলার বউ বলল— কে?

বুঝতে পারছিলুম। তবু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করছিল— ছেলে না মেয়ে।

—ভাবসাব দেখে মনে হল আবার আসবে। বাড়িওলার বউ বলল— আমাদের ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম অনেকক্ষণ। চা করে খাইয়ে দিয়েছি। কথাবার্তা বেশি হয়নি, ভয় নেই।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললুম। অন্ধকারকে ডেকে বললুম,— ধরা পড়ে গেছ।

রাতে শুতে গিয়ে কষ্টটা টের পেলুম। বুকে পেটে কিংবা কোথায় যে একটা বিশ্রী ব্যথা ছোট্ট করে মাছের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুম আসছিল না। কেবল ভয় আর ভয়। কিছু একটা ঘটবে আমি টের পাচ্ছিলুম।

আমি এইরকম।

খুব বড়ো একটা বাড়িতে অনেক অপোগণ্ড ছেলে—মেয়েদের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা কেটেছিল। তারা সব আমার জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ভাই—বোন— অনাদরে রুক্ষ চেহারা তাদের, ঝাকড়—মাকড় চুল, গায়ে তেলচিটে ময়লা, ঝগড়াটে, হিংসুটে। প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেয় ঢালাও এজমালি বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় তাদের জায়গা নিয়ে ঝগড়া হত। বাড়িটাকে বড়ো বললুম। কিন্তু হিসেবে ধরলে বাড়িটার এলাকাই ছিল বড়ো, বড়ো উঠোন, ভিতরে, বাইরে বড়ো কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু একটা মাঠ। ভিতর বাড়িতে বড়ো উঠোন ঘিরে কয়েকখানা ঘর— যাদের নাম ছিল পুব পশ্চিম উত্তর বা দক্ষিণের ঘর। এক উত্তরের ঘর ছাড়া আর কোনো ঘরেরই পাকা ভিত ছিল না। আমাদের বাড়িটা যে লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিংবা আমাদের যে খুব অভাব ছিল তা নয়। বরং উলটোটাই আমাদের অনেক ছিল। শুধু আশ্রিত আত্মীয়স্বজন আর যৌথ থাকার চেষ্টায় যে ভিড় বেড়েছিল তাইতেই বাড়িটার মধ্যে সব সময়ে ছিল একটা দিশেহারা ভাব। অনেক ছেলে—মেয়ে ছিলুম আমরা, যাদের কেউ কেউ পরে অনেক বড়ো কিছু হয়েছে। কিন্তু অতগুলোর মধ্যে কখন কোনটার হাত—পা কাটল, কোনটা পড়ে মরল, কোনটা পুকুরে ডুবল এই চিন্তায় একটা 'গেল গেল' ভাব সবসময়ে আমাদের বাড়িটায় টের পাওয়া যেত। আমার দাদুর কোনো ঢিলেমি ছিল না— তিনি

সবসময়ে কৌটোর মুখ ভালো করে আটকাতেন, দরজার হুড়কো দিতেন ঠিকমতো, আর সন্ধেবেলা আমাদের গুনে—গুনে ঘরে তুলতেন। মা—বাবার কাছে শোওয়ার নিয়ম ছিল না, আমরা উত্তরের ঘরের মেঝেয় শুতুম একসঙ্গে, দাদু থাকতেন চৌকিতে, বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র বলতেন দাদু—ঠাকুমার সঙ্গে, ছোটোখাটো বচসা হত, আর ঘুম ভেঙে রাতে মাঝে মাঝে শুনতুম দাদুর গুড়ুক—গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ।

আমাদের পরিবারে নাম রাখার একটা রীতি ছিল। আমার আগের ভাইদের নাম রাখা হয়েছিল অনিমেষ, হৃষীকেশ, পরমেশ, অজিতেশ, সমরেশ ইত্যাদি। সব মিলিয়ে প্রায় উনিশজনের ওরকম নাম রাখা হয়েছিল। আমার বেলায় আর নাম পাওয়া যাচ্ছিল না। শোনা যায় অনেক ভাবনাচিন্তার পর আমার বড়দা রায় দিয়েছিলেন— মাত্র দুটি নাম বাকি আছে আর। সুটকেশ আর সন্দেশ। কোনটা পছন্দ বেছে নাও। আমার ধর্মবিশ্বাসী মেজোকাকা আমার নাম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ধর্মেশ। সেটা বাতিল করে দাদু আমার নাম রাখলেন সুমনেশ। ভালো মনের অধিকারী। কেউ মুখে কিছু বলেনি কিন্তু অনেকেরই পছন্দ ছিল না নামটা, আমার মায়েরও না। তাই কালক্রমে আমি শুধু সুমন হয়ে উঠেছিলাম।

আমি সুমন। ভালো মনের অধিকারী।

ওই বাড়িতে খুব বেশি বড়ো হয়ে উঠবার আগেই আমরা বাড়ি ছেড়েছিলুম। আমার বাবা চাকরি নিয়ে চলে গেলেন বিহারে। প্রকাণ্ড বাগানঘেরা বাংলোবাড়িতে এসে আমার সেই পাঁচ—সাত বছর বয়সে প্রথম হঠাৎ মনে হয়েছিল— আমার জীবন খুব একার হবে, না হঠাৎ নয়। সেই বাড়িতে প্রথম সকালবেলায় আমি বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখতে ছুটে বেরিয়েছিলুম। একা। সামনে পপি ফুলের বাগান, তারপর ছোটো মসৃণ লন, তারপর আগাছা আর রাঙচিতার বেড়া। আমি দৌড়োতে গিয়ে থমকে গেলুম— যত যাই ততই একা। কেবল একা। শিমুলগাছ থেকে হঠাৎ হুহু করে কেঁদে উঠল একটা কোকিল। ওরকম ডাক আমি আর কোনোদিন শুনলুম না। হাজার বছরে কোকিল বোধহয় ওরকম একবার ডাকে। আমি কি অনেক কোকিলের ডাক শুনিনি। তবু আমাদের দেশের এজমালি বাড়িতে অনেক অপোগণ্ড ছেলে—মেয়ের ভিড়ে কখনো আমি কোকিলের ডাক শুনেছিলুম বলে মনে পড়ে না। একা ভোরের ভেজা বাগানে দাঁড়িয়ে আমি প্রথম একটি কোকিলকে ডাকতে এবং কাঁদতে শুনলুম। সেই মুহূর্তেই একা একটি কোকিল আর তার ডাকের সঙ্গে আমার মিলমিশ হয়ে গেল। মনে হল আমার জীবন খুব একার হবে। সেই ভোরবেলাটির কথা আজও আমার খুব মনে পড়ে। ওইরকম একটি কোকিলের ডাক কিংবা আরও তুচ্ছ একটি দুটি ঘটনা থেকে আমরা আবার নতুন করে আমাদের যাত্রা শুরু করি। করি না! আমার এতদিনের বিশ্বাস ছিল— আমার জীবন খুব একার হবে।

আমি আমার বাবাকে সাদা জিনের প্যান্ট পরে ক্রিকেট টেনিস খেলতে দেখেছি। তবু বাবার ছিল সাধু—সন্ন্যাসী—জ্যোতিষ আর তুকতাকের বাতিক। খুব লম্বা সুন্দর সাদা চেহারার এক ভদ্রলোক, যার পরনে গেরুয়া আলখাল্লা আর চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, আমাকে দেখে বলেছিলেন— এ—ছেলের স্বাভাবিক ছবি আঁকার হাত আছে। এর মন একটু দার্শনিক। বলে তিনি চুপ থেকেছিলেন।

বাবা প্রশ্ন করলেন— আর?

উনি হেসে বললেন— একটু দেখে রাখবেন এ—ঘর ছেড়ে পালাতে পারে। সন্ন্যাসের দিকে খুব টান।

—আর? বাবার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। দরজার আড়ালে মা ছিল। হঠাৎ তার হাতের চুড়ির ঝনাৎ শব্দ হয়েছিল। আমি বুঝেছিলুম, আমি সেই বয়সেই বুঝেছিলুম, লোকটা ভুল কথা বলছে না।

উনি একটু ভেবে বললেন, ওকে খুব সবুজের মধ্যে রাখবেন। ওর পোশাক যেন হয় সবুজ, ওর খাবারের মধ্যে বেশিরভাগ যেন হয় সবুজ রঙের, ওর চিন্তায় সবুজের প্রভাব যেন বেশি থাকে দেখবেন।

তার পরদিনই রং সাবান কিনে এনে মা আমার সমস্ত পোশাক সবুজ করে তুলেছিল। রাশি—রাশি শাকপাতা অনিচ্ছায় খেতে হত আমাকে। লুডো খেলতে বসেছি, মা ছুটে এসে বলত— সুমন— বাবা, তুই

সবুজ ঘর নে। বাড়িতে পোষা বুলবুলি ছিল, তার পাশে এল একটা টিয়াপাখি। জন্মদিনে এক বাক্স জলরং কিনে দিয়ে মা বলল— কেবল গাছপালার ছবি আঁকবি।

তবু আমার জানা ছিল যে, আমার জীবন খুব একার হবে। সবুজ রঙের ভিতরেও একটি উদাসীন মমতা আছে। আমার মা কিংবা বাবা তা ধরতে পারেনি।

তিন

আমার চোখে চোখ রেখে শান্ত একটু হেসে ভিনি বলল— তারপর?

কী?

—তোমার চোখ দেখলেই মনে হয় কোথাও একটু বিপদের আভাস দেখলে তুমি হরিণের মতো ছুটে পালাবে। সুমন লক্ষ্মীসোনা, আমাকে ভয় পেয়ো না। তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট করেছি।

আমি হাসলুম। কী জানি!

আমি সুমন। ভালো মনের অধিকারী। তবু আমি জানি ভিনির জন্য আমাকে কেউ ভাববেই না। ছেলেবেলা থেকেই ভিনি এরকম কথা শুনেছে তার মা কিংবা আত্মীয়দের কাছে— সুন্দর ভিনি, তোমার জন্য এনে দেব সোনার রাজপুত্তুর।

কিন্তু আমি কেবল সুমন। কেবলমাত্র সুমন। নিজের কাছে আমি নিজে বড়ো প্রিয়। আমি বরং পালিয়ে যাব, লুকিয়ে থাকব, পা টিপে হাঁটব, লোকালয়ে যাব না, তবু কেউ যেন কোনো কিছুর জন্য আমায় অনাদর না করে, অপমান যেন না করে আমায়। বরং বলি— তোমাদের সুন্দর ভিনিকে নিয়ে যাও! আমি কিছুই চাই না। আমি আমার বড়ো আদরের সুমন, বড়ো ভালোবাসার। আমার সামনে আমার সুমনকে অনাদর করো না, বাতিল করে ফেলে দিয়ো না। বরং নিয়ে যাও তোমাদের সুন্দর ভিনিকে।

ভিনি আমার খুব কাছে এসে বলল— সুমন মনে নেই তোমার বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে একদিন আর এক রাত ছিলুম আমি। সন্ধেবেলা মায়ের কথা মনে পড়তে আমি খুব কেঁদেছিলুম। তুমি খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে আমার কান্না দেখে খুব খেপিয়েছিলে। মনে নেই? তখন তোমার দু— হাত তুলে নাচ, নকল কান্না আর মুখের কাছে মুখ এনে চোখ বড়ো করে তাকানো দেখে কান্না ভুলে আমি খুব হেসেছিলুম?

মনে নেই। হেসে বললুম— খেপিয়েছিলুম বলে আজও আমার ওপর রাগ পুষে রাখোনি তো ভিনি?

ও চোখ বুজে সোজা হয়ে বসে রইল, তারপর বলল— আমার গা দ্যাখো।

দেখলুম গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

ও চোখ বুজেই সামান্য হাসল, বলল— সেদিনের কথা মনে হলে আমার সমস্ত শরীর দিয়ে শিহরণ বয়ে যায়। ওরকম সুখ আমি আর কখনো পেলুম না।

শুনে একটু লজ্জা পেলুম। কখনো মানে ভিনি আজকের কথাও বলছে কি? কে জানে মনে সন্দেহ এল, আমাকে কিশোর বয়সে যতটা ভালো লেগেছিল ভিনির ততটা আজও লাগে কি না। কিংবা হয়তো আজও ভিনি সেই কৈশোরের ভালোবাসাই বহন করে চলেছে। কী জানি।

ভিনির দুই চোখ নিঃশব্দে কথা বলছিল— আমি তোমাকে ভালোবাসি সুমন। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ভিনি খুব সুন্দর। বড়ো ভালোবাসে। আমার বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল একটি বল। চোখে অকারণ জল আসছিল। মনে মনে বললুম— ভিনি সত্যি? তিন সত্যি? দিব্যি? আমার গা ছুঁয়ে বলো। দ্যাখো ভিনি আমি কিছুই জানি না। আমি কেবলমাত্র সুমন। তাও এ নাম জানে মাত্র কয়েকজন লোক। তুমি এই নাম বুকে করে রেখেছিলে এতকাল? কেন গো? তিনটি চিঠি দিয়ে তুমি ডেকেছিলে আমায়— কি সত্যি? সত্যি বটে তোমার খেলামাটির রান্নাঘরে মাঝে মাঝে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, পাথরকুঁচি পাতার লুচি আর কাদামাটির তরকারি আমি

জিভ আর ঠোঁটের কৌশলে চকচক শব্দ করে নকল খাওয়া খেয়েছি, সত্য বটে, তোমাকে আমি দেখিয়েছিলুম দু—হাত তুলে বাঁদরনাচ কিংবা চোখের পাতা উলটে ভয় দেখানোর খেলা। কিন্তু তারপর ক্রমে আমি তোমাকে ভুলেও গিয়েছিলুম। পনেরো—ষোলো বছর পরের এই তোমাকে আমি চিনিই না। ভিনি, মা—কালীর দিব্যি, সত্যি বলো। তিন সত্যি? আমার পা ছুঁয়ে বলো!

ভিনি চলে গেলে রাতে আমার ঘুম এল না। আমার শরীরের ভিতরে একটিমাত্র যন্ত্রণার মাছ একা খেলা করে ফিরছে। কখনো পেটে, কখনো বুকে, কখনো মাথায়। ঠিক কোথায় যে তা বুঝতে পারি না। ওই মাছ আমার সমস্ত শরীরে এবং চেতনায় একটিমাত্র কথাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে— সুমন, তোমার জীবন বড়ো একার হবে।

আমি জানি। আমি তা জানি। অন্ধকারে আমি আপনমনে মাথা নাড়লুম। তারপর চুপিচুপি আমার বালিশের কাছে বলে রাখলুম একটি নাম। ভিনি। ভিনি। ভিনি।

ছেলেবেলায় চেনা কিশোরীদের মুখগুলি আর মনে পড়ে না। কত নাম ভুলে গেছি। তবু মিতু নামে একটি মেয়ের সঙ্গে যে একটি—দুটি দুপুর আমি কাটিয়েছিলুম আমার কৈশোরে, তা মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে। আধো—অন্ধকার ছাদের সিঁড়িতে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম এক দুপুরে। ছাদের ওপর ঝড়ের মতো হাওয়ায় মড়মড় করে নুয়ে পড়ছে এরিয়ালের বাঁশ, কলতলায় এঁটো বাসনের ওপর কাকদের হুড়োহুড়ি, নীচের ঘরে শীতলপাটিতে শুয়ে ভাতঘুমে মা, আর তখন আমার বুক কেঁপে উঠছিল, আমরা কথা বলছিলুম না, মিতু খুব আস্তে আস্তে আমার আরও কাছ ঘেঁষে আসছিল। অনেক কাছে চলে এল মিতু, তার মুখ আমার মুখকে ছোঁয়—ছোঁয়। আমি সরে—সরে গিয়ে রেলিঙের সঙ্গে সেঁটে গেছি, আমার বুক কাঁপছে বুকের ভিতরে আমার সেই গলার স্বর— পালা সুমন, রেলিং টপকে দেওয়াল ডিঙিয়ে পালিয়ে যা, অনেক দূরে চলে যা। আমি টের পেয়েছিলুম তখন দেওয়াল কেঁপে উঠেছিল, কথা বলে উঠেছিল সিঁড়ি, মার—মার শব্দে ছুটে আসছিল ছাদের বাতাস। মিতু টেরও পায়নি। মিতু বলেছিল— তোর মুখে কেমন ভাত খাওয়ার গন্ধ! রোজ খাওয়ার পর লুকিয়ে পান খাবি, কিংবা মৌরি, তারপর ফিক করে হেসে সে বলল— আমার মুখে একটা লবঙ্গ আছে, খাবি?

দাঁত টিপে সে লবঙ্গর একটি কণা আমাকে দেখাল,— নে, তোর দাঁত দিয়ে কেটে নে। নে না! বলে সে আমাকে টেনে নিল। সেই সময়ে, সেই নিতান্ত কৈশোরেও আমার মনে হয়েছিল আমি এক চারাগাছ, মিতু শিকড়সুদ্ধ আমাকে উপড়ে ফেলল।

আমাদের একটা ছোট্ট পুরোনো জিনিসপত্র রাখার জন্য ঘর ছিল। সেই ঘরে ছিল সবুজ রঙের একটা তোরঙ্গ। আমি আর মিতু সেই তোরঙ্গ এক দুপুরে খুলেছিলুম। তাতে ছিল বান্ডিল—বান্ডিল পুরোনো চিঠি— সেগুলো সবই আমার বাবার লেখা মাকে, কিংবা মা—র লেখা বাবাকে। আমি আর মিতু হেসেছিলুম। সবজান্তা হাসি। কিন্তু মা—বাবার ওপর অকারণে আমার বড়ো রাগ হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল আমি ওদের আর ভালোবাসব না। মিতু বলল,— তুই আমাকে চিঠি লিখবি? লেখ না। বানান ভুল করিস না, আর চিঠির ওপর ঠাকুর দেবতার নাম লিখিস না। লিখবি তো? আমি বিকেলে এসে নিয়ে যাব। তারপর তোকেও দেব চিঠি।

সেই ঘটনার পর থেকে অনেক দিন আমি আমার বাবা—মার ওপর খুশি ছিলুম না। আমি বাগানে ঘুরে গাছেদের জিজ্ঞেস করতুম, আমি ঘরের দেওয়ালকে জিজ্ঞেস করতুম, রাতে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে বুকজোড়া অন্ধকারকে জিজ্ঞেস করতুম, কেন আমি তাদের আর ভালোবাসব না?

মনে মনে আমি নিজেকে ডেকে বলেছিলুম— সুমন তুই কখনো বিয়ে করিস না।

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই জ্যোতিষেরা আসত। তাদের মধ্যে একজন বাবাকে বলেছিল— সুমনের বউ যেন খুব সুন্দর হয়। কখনো কুচ্ছিত কিংবা চলনসই মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন না। সইতে পারবে না।

সেই জ্যোতিষ কী বলতে চেয়েছিল তা বুঝতে পেরে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছিল। বুঝতে পেরেছিলুম আমার ভিতরে অন্যকে ভালোবাসার ক্ষমতা কত কম! শিশুর মতো রঙিন খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে না রাখলে আমি সহজেই সব কিছুকে অবহেলা করব।

চার

মাঘ মাসের এক গোধূলি লগ্নে ভিনির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

সমারোহ কিছুই হল না। খুব আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না। প্রায় স্তব্ধতার ভিতরে আমি মন্ত্রোচ্চচারণ করলুম।

বাসরঘরেও আমরা ছিলুম একা। ভিনি চুপিচপি আমাকে বলল— বাব্বাঃ, বাঁচা গেল।

কেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

ভিনি পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজে বলল— কী জানি ভয় হচ্ছিল শুভদৃষ্টির সময়ে হয়তো দেখব অন্য লোক। তাহলে আমি ঠিক অজ্ঞান হয়ে পিঁড়ি থেকে পড়ে যেতুম।

হাসলুম— এত ভয়।

চোখ বুজে ভিনি একটা হাত বাড়িয়ে আমার বুকে রাখল, বলল— মন, তোমার বুকের ভিতরে পালিয়ে যাওয়ার দুরদুর শব্দ। বলেই হাসল ভিনি, তেমনি চোখ বুজে থেকে বলল— সেই কবে থেকে তোমাকে ভালোবেসে আসছি মন, ভয় ছিল যদি পালিয়ে যাও! জানো না তো তোমার জন্য মা—বাবার সঙ্গে কত ঝগড়া করলুম আমি।

আমার মাথার ভিতরে গুনগুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল ভিনির ওই কথাটুকু— কী জানি, ভয় হচ্ছিল শুভদৃষ্টির সময়ে হয়তো দেখব অন্য লোক।

আমি আস্তে—আস্তে ভিনিকে বললুম— ভিনি একটা কথা বলি।

—হুঁ।

—ছেলেবেলায় আমার মাকে কখন ভালো লাগল জানো? যখন রান্নাবান্না আর কাজ করতে করতে মা—র চুল এলোমেলো হয়ে যেত, মুখে জ্যাবজ্যাব করত ঘাম, সিঁদুর গলে নেমে আসত নাকের ওপর, যখন মা—র আটপৌরে শাড়িতে হলুদের দাগ, তখন মাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসতুম। আর মা যখন সাজগোজ করত, গায়ে পরত ফরসা জামাকাপড়, তখন মাকে বড়ো গম্ভীর আর রাগী দেখাত যেন ছুঁতে গেলেই বকে দেবে। কিংবা মা যখন দুঃখ পেত, চুপ করে বসে থাকত, অথবা হয়তো কোনো কারণে কাঁদত তখনই মা আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল, আমি কেবল মা—র আশেপাশে ঘুরঘুর করতুম। কেন বলো তো?

—কেন।

—আসলে একটু কষ্ট, একটু দুঃখের মধ্যেই মানুষকে দেখতে বোধহয় আমার ভালো লাগে।

—পাগল। বলে ভিনি হাসল।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম— আমার বাবাকে আমি সবচেয়ে বেশি করে ভালোবেসেছিলুম জানো?

—কবে?

—মফস্সল রেল কলোনির এক ক্রিকেট—ম্যাচে একটি লোক ছাব্বিশ রান করে আউট হয়ে গেল। বুড়ো স্কোরারের পাশে মাঠের ঘাসে বসে আমি দেখলুম সাদা পোশাক করা লম্বা চেহারার যুবকটি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, মাথা অল্প নোয়ানো, হাতের ব্যাটটা শূন্যে একবার আধপাক ঘুরে গেল হতাশায়, মাথার

টুপটা খুলে নিয়ে ম্লান হাসি মুখে বাবা প্রকাণ্ড মাঠটা আস্তে—আস্তে পার হয়ে প্যাভিলিয়নের তাঁবুর দিকে চলে যাচ্ছিল। সে জানত না যে সেই সময়ে মাঠের দর্শকদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাচ্ছিল তার জন্য, সে আমি। বাবা আউট হয়ে গেল বলে না, আসলে বাবার ওই হেঁটে ফিরে আসা, আধপাক ঘুরে যাওয়া ব্যাটটার হতাশা আর মুখের হাসিটুকুর জন্য আমি কেঁদেছিলুম। তারপর থেকে বাবাকে যে আমি কী ভীষণ, ভীষণ ভালোবাসি ভিনি। এখনও যে বাবাকে ভালোবাসি তার কারণ বোধহয় ওই মুহূর্তটি, বাবার আউট হয়ে ফিরে আসার ওই মুহূর্তটি। বাবা বলে ভাবতেই ওই দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। কেন বলো তো?

—কেন?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম— আসলে দু—একটিই ভালোবাসার মুহূর্ত থাকে আমাদের। না? বলেই হাসলুম— ছেলেবেলায় তুমি মাত্র একবারই ভালোবেসেছিলে আমায়।

শুনে ভিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— আমি জানি তুমি আমাকে তেমন ভালোবাসো না মন। তেমন মুহূর্ত তোমার কখনো আসেনি।

শুনে বড়ো চমকে উঠলুম। হেসে বললুম— পাগলি।

ও চুপ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল— তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।

আমি হেসে গলা নামিয়ে বললুম— ভিনি তোমার গায়ে জন্মদাগটা কোথায়?

অবাক হয়ে ভিনি বলল— কেন?

বললুম— তোমার গায়ের খোলা দাগটা খুঁজে পাইনি।

একটু চুপ করে থেকে ভিনি হঠাৎ লাল হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল—এঃ মাগো, বিচ্ছু কোথাকার...তোমার...তোমারটা কোথায়?

তারপর অনেক রাতে ভিনি আমাকে তার জন্মদাগ দেখতে দিয়েছিল।

তিন বছরে আমাদের দুটি ছেলে—মেয়ে হল। আর আমরা অল্প একটু বুড়ো হয়ে গেলুম। মাঝে মাঝে আমি ভিনিকে বলি— ভিনি, আমার মন ভালো নেই।

—কেন?

—কী জানি।

—শরীর খারাপ নয়তো? বলতে বলতে সে এসে আমার কপালে তার গাল ছোঁয়ায়, বুকে হাত দিয়ে দেখে গা গরম কি না।

—না, শরীর খারাপ নয়। আমি বলি।

—রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে?

—না।

—তবে কী?

—কী জানি! আমি বলি— মন ভালো নেই।

ভিনি হাসে— পাগল কোথাকার!

—আমার বড়ো একা লাগছে ভিনি।

ভিনি চমকে উঠে— কেন আমরা তো আছি।

আমি শূন্য চোখে চেয়ে থাকি। কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করি। পকেট হাতড়ে খুঁজি সিগারেট আর দেশলাই।

গত আশ্বিনে আমি আমার চৌত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে এলুম। আমি জানি আমি খুব দীর্ঘজীবী হব— আমার কুষ্ঠিতে সেই কথা লেখা আছে। ত্রিশের ঘরে বসে আমি তাই সামনের দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে অলস ও ধীরস্থির হয়ে আছি। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়ালেই যেমন টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, জলের গ্লাস কিংবা ঘড়ি ছোঁয়া যায়, মৃত্যু আমার কাছে ততটা সহজে ছোঁয়ার নয়। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাতে আমার জানালা খুলে চুপ করে বসে থাকি। হালকা বিশুদ্ধ চাঁদের আলো আমার কোলে পড়ে থাকে। ক্রমে—ক্রমে আমার রক্তের মধ্যে ডানা নেড়ে জেগে ওঠে একটি মাছ— ছোট্ট আঙুলের মতো একটি মাছ— শরীর ও চেতনা জুড়ে আর অবিরল খেলা শুরু হয়। আমার চেতনার মধ্যে জেগে ওঠে একটি বোধ, আমারই ভিতর থেকে কে যেন বড়ো মৃদু এবং মায়ার স্বরে ডেকে দেয়, 'সুমন, আমার সুমন।' অকারণে চোখের জল ভেসে যায়। আস্তে—আস্তে জানলার চৌকাঠের ওপর মাথা নামিয়ে রাখি। মায়ের হাতের মতো মৃদু বাতাস আমার মাথা থেকে পিঠ পর্যন্ত স্পর্শ করে যায়। তখন মনে পড়ে— সুমন, তোমার জীবন খুব একার হবে।

অতসীকায়া

'যদুবাবু, নমস্কার।'

'নমস্কার, আপনি কে বলুন তো!'

'আজ্ঞে, আমার নাম মোহনবাঁশি যশ।'

'বাঃ, আপনার নামটি তো বেশ! তা ইয়ং ম্যান, আজ এই সময়ে কি আমার সঙ্গে আপনার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল? কই, আমার লিস্টিতে তো আপনার নাম দেখছি না। আমার চেম্বারে ঢুকলেন কীভাবে? আমার সেক্রেটারি কী করে আপনাকে ঢুকতে দিল?'

'আপনার সেক্রেটারি আমার কাকা।'

'ওঃ, তুমি তা হলে কুসুমকুমারের ভাইপো?'

'যে আজ্ঞে।'

'কিন্তু তা কী করে হয় বলো তো! তোমার পদবি যশ, আর কুসুমকুমারের পদবি হল আশ। তা ছাড়া যতদূর শুনেছি কুসুমের কোনো ভাই—বোন নেই। সে একা, তাও বহু কষ্টে অনেক তাগা—মাদুলি, জলপড়া, ডাক্তার—বদ্যি, মানত, দণ্ডি কেটে তার মা—বাবার বিয়ের দশ বছর বাদে সে কোনোমতে জন্মায়। তা হলে তার ভাই আসছে কোথা থেকে? আর এ কথা কে না জানে যে, ভাই না থাকলে ভাইপোও থাকার কথা নয়।'

'যে আজ্ঞে। আপনি যথার্থই শুনেছেন। কুসুমকুমারের কোনো ভাই বা বোন নেই। তিনি বড়ই একা। তবে ভাইও নানারকম হয় কিনা। এই ধরুন খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো, মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো।'

'তাও তো বটে হে! আমারও অনেক তুতো ভাই—বোন আছে! তা হলে তুমি কুসুমের কীরকম ভাইপো?'

'আজ্ঞে, কুসুমকুমারের পিসতুতো ভাই হল গে রাখালরাজ যশ। আমি তারই বড় ছেলে।'

'বুঝেছি। তা, আমার সঙ্গে তোমার দরকারটা কী বলো তো? যদি চাকরি বা লাইসেন্স কিংবা টেন্ডারের জন্য এসে থাকো তা হলে...'

'আজ্ঞে না। আপনার কাছে আসার কোনো বৈষয়িক প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রয়োজনটা খুবই জরুরি। নইলে কাকাকে ধরাকরা করে আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা করার ইচ্ছে ছিল না। আপনি একজন ব্যস্ত মানুষ।'

'তা বটে। সকাল থেকে রাত অবধি আমি ফুরসত কম পাই।'

'সেটা কি ভালো?

'না, মোটেই ভালো নয়। ডাক্তার বলেছে আমার বিশ্রাম নেওয়া দরকার, এক্সারসাইজ দরকার, এন্টারটেনমেন্ট দরকার। কিন্তু লোকে আমাকে ছাড়লে তো!'

'লোকে আপনাকে ধরে রাখছে কেন? আপনি কি একজন গায়ক, অভিনেতা, না খেলোয়াড়! আজকাল শুনি এই তিন বস্তুর বাজারে খুব চাহিদা। কিন্তু আমি যত দূর জানি, আপনি একজন সমাজসেবক ছিলেন। একসময়ে আপনি সত্যিই গরিব, দুঃখী, অন্ধ, আতুরদের জন্য বিস্তর কাজ করেছিলেন। তারপর আপনি নিজের এনজিও তৈরি করে এখন কয়েকশো কোটি টাকার মালিক। কীভাবে, তা কেউ জানে না।'

'তুমি বেশ ঠোঁটকাটা লোক আছ তো বাপু! তা, সত্যি কথা বলতে কী, লোকসেবা দিয়ে জীবন শুরু করেছিলুম বটে, তবে দেখলুম, লোকসেবার মধ্যেও ব্যবসার বীজ লুকিয়ে রয়েছে। তখন ভাবলুম, ভালো রে ভালো, একই সঙ্গে যদি দুটো কাজই হয়, তা হলে খারাপটা কী? কত বড়ো এনজিও জানো? আমি প্রায় শ'পাঁচেক কর্মচারীর এমপ্লয়ার। কিন্তু বাপু মোহনবাঁশি, তুমি কি আজ আমার মুখোশ খুলে দেবে বলেই এসেছ?'

'না যদুবাবু, আমার তেমন কোনো উদ্দেশ্য নেই। আপনি তেমন কিছু খারাপ লোকও নন। আপনি তো চিট ফান্ড করে বড়োলোক হননি। আমার একটু অন্যরকম বক্তব্য আছে।

'ইয়ং ম্যান, আশা করি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে, আমার হাতে সময় খুব কম। বলতে কী, প্রতিদিনই আমাকে সময়ের সঙ্গে দৌড়তে হয়। আর তুমি তো নিশ্চয়ই জানো, সময়ের মতো দৌড়বাজ স্বয়ং উসেন বোল্টও নয়।'

'জানি যদুবাবু। বাইরে এখনও প্রায় জনা পঁচিশেক লোক আপনার দর্শনার্থী হয়ে বসে আছে। কেউ ঢুলছে, কেউ হাই তুলছে, কেউ উসখুস করছে। আপনার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। কিন্তু আমার প্রশ্নটাও আপনার এই ব্যস্ততা নিয়েই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। তুমি যখন এত জানো, তখন এটাও নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, অনেকের রুজি—রুটি এই আমার ওপরেই নির্ভরশীল। আর এত লোকের ভাগ্য আমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই আমার এত ব্যস্ততা, নইলে আমারও কি ইচ্ছে করে না যে, গিয়ে একটা সিনেমা দেখে আসি! কিংবা একটু ক্রিকেট ম্যাচ দেখি, কিংবা একটু কেদার—বদরী—কাশ্মীর ঘুরে আসি! কিন্তু কী করব বলো, আমাকে তিলেক না দেখলে যে মানুষ বড়ো অসহায় হয়ে পড়ে!'

'কিন্তু কিছু মানুষ যে দিনের পর দিন আপনার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য হা—পিত্যেশ করে বসে থাকে, তাদের কী হবে বলুন তো!'

'তাদের একটু ধৈর্য ধরতে বলো। তারা যেন কুসুমকুমারের খাতায় নাম আর টেলিফোন নম্বর লিখিয়ে রেখে যায়। আশা করি মাসখানেকের মধ্যেই তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবে।'

'সে চেষ্টাও তারা করেছে, তবে কাজ হয়নি। আমার কাকা খাতায় তাদের নাম তুলতে রাজি হননি।'

'না, না, এ তো কুসুমকুমারের ভীষণ অন্যায়! আচ্ছা, তুমিই আমাকে তাদের নাম বলো, আমি তাদের স্পেশ্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

'তা হলে বরং লিখেই নিন। একজনের নাম শ্রীমতী শচী রায়, আর—একজন বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, আর—একজন হল গিয়ে বিপুল মজুমদার।'

'ঠিক আছে, লিখে রাখলুম।'

'নামগুলো কি আপনার চেনা—চেনা মনে হচ্ছে?'

'দেখো বাপু, নাম এক আশ্চর্য জিনিস। এই যে আমার নাম যদুগোপাল রায়, খুঁজে দেখলে তুমি এরকম ষাট—সত্তরজন যদুগোপাল রায় খুঁজে পাবে। এই যেমন ধরো, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার বউয়ের নাম শচী রায়। তা বলে কি ধরে নেবো যে, শচী রায় আর কেউ হতে পারে না?'

'তা বটে। তবে এই শচী রায় কিন্তু আপনার স্ত্রী—ই!'

'স্ত্রী! বলো কী তুমি! সে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চায় কেন?'

'কারণ, গত এক মাসের ওপর আপনি আপনাদের সোনারপুরের বাড়িতে যাননি। এবং আপনি সরাসরি ফোন ধরেন না, ধরলেও 'সময় নেই' বলে কেটে দেন। অথচ আপনার মেজো মেয়ের বিয়ে আসন্ন এবং আপনার কিছু কর্তব্য আছে।'

'এই তো মুশকিলে ফেললে বাপু। আমার মেজো মেয়ের কি বিয়ের বয়স হয়েছে? হয়ে থাকলে তো আমার জানার কথা!'

'তা তো বটেই। এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, রাগ করতে পারবেন না কিন্তু!'

'না না, বলে ফেলো।'

'আপনার মেজো মেয়ের নামটা কি আপনার মনে আছে?'

'তার মানে! এ আবার কীরকম রসিকতা? আমার নিজের মেয়ে, তার নাম মনে থাকবে না?'

'থাকাই তো উচিত। তা হলে বলে ফেলুন দিকি!'

'দাঁড়াও বাপু, একটু জল খেয়ে নিই। সারাদিন রাজ্যের চিন্তায় মাথাটা গন্ধমাদন হয়ে থাকে তো! চট করে অনেক সহজ কথাই মনে পড়তে চায় না। তা, তুমি কি আমার মেজো মেয়ের নাম জানো?'

'জানি।'

'তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল! জানোই যদি, তা হলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করা কেন?'

'আপনাকে আপনার পরিস্থিতিটা বোঝানোর জন্য। আপনি স্ত্রীর নাম ভুলে গেছেন, মেজো মেয়ের নাম ভুলে গেছেন।'

'আহা, তা বলে আর কারও নাম ভুলিনি হে।'

'তা হলে বলুন দেখি আপনার বড়ো মেয়ের নাম কী?'

'এ তো সোজা। বড়ো খুকি।'

'স্কুল—কলেজে সবাই কি তাকে বড়ো খুকি রায় বলে চেনে?'

'না না, আমার তা মনে হয় না। বড়ো খুকি রায় বেখাপ্পা শোনাচ্ছে।'

'আমিও তাই বলি। বড়ো খুকির একটা পোশাকি নামও থাকার কথা।'

'আমার কী মনে হচ্ছে জানো?'

'কী বলুন তো?'

'তুমি আগে থেকেই আমাকে জব্দ করার প্ল্যান নিয়ে এসেছ।'

'আজ্ঞে না। তাতে আমার লাভ নেই। বরং আপনাকে একটু খুশি রাখতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

'তোমার উদ্দেশ্যটা কী?'

'সেটা রয়েসয়ে বলতে হবে। হুড়োহুড়ি করে বলার মতো নয়।'

'কিন্তু সময়ের কথাটা খেয়াল না রাখলে তো চলবে না।'

'যদুবাবু, লোকে যদি জানতে পারে যে,

আপনার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, আপনি ডিমেনেশিয়ায় ভুগছেন, তা হলে কাল থেকেই আপনার দপ্তরের ভিড় উধাও হবে।'

'আহা, আমার কি আর সত্যিই ওসব হয়েছে নাকি? আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম, রাষ্ট্রপতির নাম, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম, এমনকী আমার বাবার নামও বলে দিতে পারি।'

'শাবাশ! এই তো চাই! আচ্ছা, আপনার কি মনে আছে, আপনার তিন মেয়ের পর একটি ছেলেও হয়েছিল।'

'তা তো বটেই। এটা মনে না থাকার মতো কী হল?'

'ছেলের এখন কোন ক্লাস?'

'বাপু, এটাও তো দেখছি জামাই—ঠকানো প্রশ্ন! ছেলে—মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার কোথায়?'

'আপনার বড়ো খুকি তার শ্বশুরবাড়িতে আছে, তা শ্বশুড়বাড়িটা কোথায় তা কি মনে আছে আপনার?'

'অ্যাঁ! শ্বশুরবাড়ি! বড়ো খুকির আবার বিয়ে হল কবে? আমি জানি না তো!'

'আলবত জানেন। আপনি নিজে তাকে সম্প্রদান করেছেন।'

'তা হবে হয়তো।'

'আপনার স্ত্রীর মতোই আরও দু—জন আপনার নিকট আত্মীয় আপনার দর্শন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে। একজন বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, আপনার বেয়াই, আর বিপুল মজুমদার আপনার বড়ো শালা।'

'না হে, মোহনবাঁশি, তুমি আজ আমাকে ভারি বেকায়দায় ফেলে দিয়েছ! বলি, প্যাঁচ কষে কিছু আদায় করতে চাও নাকি?'

'যদি চাই?'

'বলতে নেই, তোমাকে দেখে আমার বেশ চোখা—চালাক বলেই মনে হচ্ছে। তুমি আমাকে নানাভাবে জব্দ করার চেষ্টা করলেও তোমার ওপর আমি অপ্রসন্ন হতে পারছি না। তুমি কী চাও সেটা এবার পষ্ট করে বলো তো!'

'বলছি, আমি একজন ডাক্তার। এমবিবিএস, হার্টে ডিপ্লোমা। আমার চেম্বার সোনারপুর স্টেশনের কাছেই। আর বলতে নেই, আমার প্র্যাকটিস বেশ ভালো। আপনার মতো না হলেও, আমার চেম্বারে সন্ধেবেলা অনেক রুগি হয়। সকালবেলা নার্সিংহোম থাকে। অবশ্য এসব অবান্তর কথা। আসলে সম্প্রতি আমি একটু বিপদে পড়েছি বলেই আপনার কাছে আসা।'

'আহা, লোকে বিপদে পড়েই তো আমার কাছে আসে।'

'সোনারপুরের একটি ক্লাবের ফাংশনে সম্প্রতি আমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেটা যোগশিক্ষা এবং ব্যায়ামের ক্লাব। যেখানে মঞ্চে একটি মেয়ের ব্যায়াম প্রদর্শনী দেখে আমার তাক লেগে গিয়েছিল। মেয়েটা নিজের যে—কোনো পা সটান নিজের মাথার ওপর তুলে দিতে পারে। দাঁড়িয়ে পিছনে মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে শরীর গোল করে, আবার নিজের দাঁড়ানো দুটো পায়ের ফাঁক দিয়ে মুণ্ডু বের করতে পারে। অমন ফিটনেস আমার দেখা নেই।'

'বলো কী হে! এ তো সাংঘাতিক মেয়ে!'

'যে আজ্ঞে, মেয়েটা দেখতেও বেশ ভালো। মনে মনে আমার একটু দুর্বলতা যে দেখা না—দিয়েছিল, তা নয়। তারপর কিছু ফিসফাস কানে এল যে, মেয়েটা নাকি একটু গুণ্ডা প্রকৃতির। শুধু ব্যায়াম নয়, কুংফু জানে, ক্যারাটে ব্ল্যাকবেল্ট। সে প্রায়ই ইভটিজার বা ফক্কড় ছেলেছোকরা বা বদমাশ লোককে পেটায়। তার নামে থানায় কয়েকবার এফআইআর—ও হয়েছে। কি প্রভাবশালীর মেয়ে বলে পুলিশ অ্যাকশন নেয়নি।'

আরে কে কত প্রভাবশালী তা আমার জানা আছে আমাকে নামটা বলো তো, আমি এক্ষুনি ফোন করে মেয়েটাকে অ্যারেস্ট করিয়ে দিচ্ছি।'

'করবেন। তাড়া কীসের? সবটা শুনে নিন না হয়। এই গত মাসেই আমি বাধ্য হয়ে আমার ভিজিট দু—শো থেকে বাড়িয়ে তিনশো করেছি। আর সেটা কি দোষের ব্যাপার, আপনিই বলুন! টাকার দাম তো রোজই দশ পয়সা, কুড়ি পয়সা করে কমে যাচ্ছে। তা ছাড়া রোগী সামলাতে ভিজিট বাড়ানো হল খুব কার্যকর দাওয়াই। কিন্তু দিন পনেরো আগেই সেই জোরালো চেহারার ব্যায়ামবিদ মেয়েটা আরও তিন—চারজন রোখাচোখা মেয়েকে নিয়ে আমার চেম্বারে হাজির। সোজা আঙুল তুলে কী বলল জানেন?'

'কী বলল?'

বলল, গরিব দেশের ডাক্তার হয়ে এত ভিজিট চাইতে আপনার লজ্জা করে না? কাল থেকে আগের মতোই দু—শো টাকা নেবেন। নইলে এখানে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। আমার রুগিদের সামনেই

আমাকে ওই অপমান হজম করতে হল। সোনারপুরে আমি নতুন মানুষ, কাজেই তেমন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। চুপ করে মুখ বুজে হেনস্থা সয়ে নিলুম।'

'কোন বাড়ির মেয়ে বলো তো? এ তো ভয়ংকর বেয়াদপি! আমি এক্ষুনি ওর বাবাকে বলে মেয়েটাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করছি। সোনারপুর এখনও আমার কথায় ওঠে বসে।'

'আজ্ঞে, এইসব দুঃখের কথা জানাতেই তো আপনার কাছে আসা। যেটুকু শুনলেন সেটাই তো সব নয়। রাত তিনটের সময় একদিন ফোন, ফোন তুলেই শুনি একটা মেয়ে ধমক—চমক করে বলছে, শুনুন ডাক্তারদের কিন্তু অমন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোলে চলে না। মানুষের মরণ—বাঁচন যাদের হাতে তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোলে তো হবে না! আপনি এখুনি দুখুদের বাড়ি চলে আসুন, দুখুর বাবার ভীষণ শ্বাসকষ্ট, খুব সিরিয়াস অবস্থা। আমি পাঁচ মিনিট বাদে আবার ফোন করব।'

'সেই মেয়েটাই নাকি মশাই?'

'যে আজ্ঞে। দুখুদের বাড়ি আমি যথারীতি সাইকেলে চেপে পৌঁছে যাই। একটুও দেরি করিনি। তবু সেই ব্যায়ামবীরাঙ্গনা মেয়েটি চোখ পাকিয়ে কী বলল জানেন! বলল, এত দেরি হল যে! রুজ পাউডার মাখছিলেন নাকি?'

'কী ভাষা! ছিঃ ছিঃ!'

'তবেই বুঝুন। যা হোক, আমার চিকিৎসায় রুগি ভদ্রলোক খানিক সামলে ওঠায় আমি তাঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে আসি। ভিজিটটা পর্যন্ত নিইনি। তবু কোনো কৃতজ্ঞতা কেউ প্রকাশ করল না!'

'নেমক হারাম! নেমক হারাম!'

'ডাক্তারদের কতটা চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তার ওপর মানুষের কটুকাটব্য সহ্য করাটা মাঝে মাঝে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন ইচ্ছে করে এসব ছেড়ে দিয়ে বরং বিবাগী হয়ে যাই। সিরিয়াসলি আমি একবার সংসার ত্যাগের কথা ভেবেওছিলুম, যেদিন কুশল ব্যানার্জির মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে হেনস্থা হতে হল। কুশল ব্যানার্জিকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন?'

'তা চিনব না কেন? সোনারপুরের মেলা লোককেই তো আমি চিনি।'

'ইনি সোনারপুরের লোক নন। রাজপুরের লোক। বিল্ডিং মেটেরিয়ালসের ব্যবসা। বিস্তর টাকার মালিক, তাঁর মেয়ে অয়নিকারই বিয়ে। অয়নিকা দেখতে তেমন সুবিধের নয়। মেয়েটা কালো। কিন্তু তার জন্য যে—পাত্রটি কুশলবাবু জোগাড় করেছেন তাকে রাজপুত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার ওপর ডাক্তার। ঘটনাক্রমে আবার সেই পাত্রটি আমার পূর্ব পরিচিত। কানাঘুষো শুনলুম, পাত্রকে একটি আস্ত নার্সিংহোমই উপহার দিতে চলেছেন কুশলবাবু। তা সে যাকগে, তো আমি পুরোনো বন্ধু পাত্রটিকে দেখে তার সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। এমন সময় সেই বীরাঙ্গনা মেয়ে তার কয়েকজন সঙ্গী—সাথী নিয়ে সেখানে হাজির।'

'ও বাবা, সেই ডাকাতে মেয়েটাও সেখানে নিমন্ত্রিত ছিল নাকি!'

'থাকারই কথা। সে পাত্রীর বন্ধু কিনা। কিন্তু আমি তাকে দেখে এমন আঁতকে উঠলাম যে, হাতের কফির কাপ থেকে চলকে গরম কফি খানিক আমার হাঁটুর প্যান্ট ভিজিয়ে দিল। আমার দিকে কটমট করে চেয়ে বলল, এই যে ডাক্তার যশ, নিজের বাজারদর যাচাই করছেন নাকি? আপনার কিলো কত করে বলুন তো?'

'বলল! বলতে পারল কথাটা!'

'আমি তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবে আমি ভেড়ুয়া হলেও দেশে পুরুষ সিংহের তো অভাব নেই। পাত্রপক্ষের বরযাত্রীদের মধ্যে একজন হেক্কোড় লোক ছিল। আপনি হেক্কোড় মানে জানেন কি?'

'জাপানি বা জার্মান শব্দ নাকি হে!'

'আজ্ঞে না। বাংলাই। যতদূর মনে হয়, হেক্কোড় মানে হল মাথামোটা গোঁয়ার গোবিন্দ বা চোয়াড়ে গোছের লোক। তার চেহারাও বেশ ষাঁড়ের মতো ঘাড়ে—গর্দানে। গিলে করা পাঞ্জাবির হাত গুটিয়ে সে তেড়ে এসে

বলল, মুখ সামলে কথা বলবেন ম্যাডাম! আপনি ডাক্তার যশকে উদ্দেশ্য করে বললেও আপনার ইঙ্গিত আমরা বুঝতে পারছি। ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না, বুঝলেন!'

'তারপর?'

'মেয়েটা একটুও গরম খেল না। দিব্যি হাসি—হাসি মুখ করে বলল, বাহ, বুঝতে পেরেছেন তা হলে। আপনার আইকিউ তো দারুণ! বলে চলে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর সন্ধে লগ্নেই বিয়ে হয়ে গেল। আজকাল হিন্দু বিয়েরও অনেক কাটছাঁট হয়েছে। বড্ড টপ করে হয়ে যায়। সেও একটা বাঁচোয়া, কী বলেন?'

'সে কথা ঠিক। আমার বিয়ের সময় তো যজ্ঞই চলছিল ঘণ্টা তিনেক। ধোঁয়ার আর পোড়া ঘি—এর উৎকট গন্ধে নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা।'

'বিয়ের কথা তা হলে আপনার মনে পড়ে?'

'তা আর পড়বে না! তখন তো আমি কেউকেটা হইনি!'

'বুঝলুম।'

'তা হলে সেদিন অল্পের ওপর দিয়েই বেঁচে গেলে তো!'

'বাঁচলে কি এতদূর দৌড়ে আপনার কাছে আসি মশাই! মেয়েটার গুন্ডামি সম্পর্কে আমার তখনও তেমন ধারণাই ছিল না। তবে মেয়েটা ভারি বিবেচক। বিয়ে মেটা পর্যন্ত কোনো ঝামেলা করেনি, কিন্তু গভীর রাতের দিকে যখন বরযাত্রীরা বাসে উঠতে যাবে, তখন মেয়েটা গিয়ে হেক্কোড়টাকে ধরল। পরিষ্কার বলল, এই যে মস্তানমশাই, তখন তো খুব তড়পাচ্ছিলেন, এবার বলুন তো পাঁঠাটাকে কততে বেচে গেলেন! এক কথায় দু—কথায় হেক্কোড়টা রেগে গিয়ে মেয়েটাকে একটা চড় বসিয়েছিল।'

'মেয়েদের গায়ে হাত! না না, এটা আমি সমর্থন করি না।'

'ঠিক। কেউই সমর্থন করে না। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন? মেয়েটা অতি ধুরন্ধর। সে ইচ্ছে করে হেক্কোড়টাকে উসকে দিয়ে ইচ্ছে করেই চড়টা খেয়েছিল, যাতে পাবলিক সিমপ্যাথি পাওয়া যায়। আর তারপর যা হল তাতে আমার চোখ ট্যারা।'

'কী হল?'

'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না মশাই। একটা ছিপছিপে চেহারার মেয়ে যে ওরকম একটা পাগলা ষাঁড়কে এমন আছাড়িপিছাড়ি করে পেটাতে পারে, তা স্বপ্নেরও আগোচরে ছিল মশাই। আমার তো আঁত শুকিয়ে গিয়েছিল।'

'মেয়েরা যে দিনকে দিন কী ডেঞ্জারাস হয়ে উঠছে তাই ভাবি! না, দিনকাল বড়ই খারাপ পড়েছে দেখছি।'

'তা, মেয়েটার ওপর দোষ চাপিয়ে তো লাভ নেই মশাই। বাপ—মা'র গাইডেন্স ঠিকমতো না পেলে মেয়েরা একটু বেপরোয়া হয়ে যেতেই পারে। যুগের হাওয়া। তার ওপর মেয়েটা আবার এক ভিআইপি—র মেয়ে। মেয়ের দিকে নজর দেওয়ার সময় তার বাবার নেই কিনা।'

'রাখো তো, ছোকরা। আমাকে ভিআইপি চেনাতে এসো না। কে কত দরের ভিআইপি তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। রোজ আমাকে গাদা গাদা ভিআইপি ঘাঁটতে হয়। সব শর্মাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। তা ছাড়া সোনারপুরে আমার ওপর আবার কোন ভিআইপি আছে বলো তো! তার নামটা কী?'

'দেখুন, আমি সামান্য মানুষ। ভিআইপি—তে ভিআইপি—তে বিবাদ বাধাতে তো আমি আসিনি। আমি বেঘোরে মারা যেতে চাই না।'

'তা, মেয়েটা হেক্কোড়টাকে পেটানোর পর পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াল সেটা বলবে তো!'

'আজ্ঞে, সেটাই বলছি। পাবলিক তো বটেই, বরযাত্রীরা অবধি কেউ মেয়েটার কোনো দোষ দেখল না। বরং সবাই উলটে ওই হেক্কোড়টাকেই হেনস্থা করল। আর মেয়েটার ভূয়সী প্রশংসা হতে লাগল চারদিকে। বুঝলেন?'

'বুঝলাম। কিন্তু তাতে তোমার সমস্যাটা কী?'

'আজ্ঞে, সেটাই বলছি। লোকে যতই প্রশংসা করুক, আমি কিন্তু মেয়েটাকে বেজায় ভয় খেতে শুরু করলাম। তার ধমক খেয়ে ভিজিট ফের দু—শো টাকায় নামাতে হয়েছে। রাত—বিরেতে কল এলে তড়িঘড়ি যাচ্ছি। ফোন সুইচ অফ রাখার জো নেই। ছেলেবেলায় যেমন জুজুর ভয় পেতাম, এখন তেমনই ওই মেয়েটাকে ভয় পাই। উপায় থাকলে সোনারপুর থেকে অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে পসার জমানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু প্র্যাকটিসটা বড় জমে গেছে বলে জায়গাটা ছাড়তেও মন চাইছে না।'

'আহা, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। তুমি মেয়েটার নাম, তার বাবার নাম আর ফোন নম্বরটা আমাকে দিয়ে যাও। আমি সব ঠিক করে দেব। এমন ব্যবস্থা করব, যাতে মেয়েটা আর তোমার ছায়াও মাড়াবে না।'

'অনেক ধন্যাদ। তবে কিনা আপনার কিছু পরেশানিও হতে পারে। কারণ, জল আরও একটু গড়িয়েছে।'

'তাই নাকি! কী ব্যাপার বলো তো?'

'দিন দশেক আগে হঠাৎ এক রোববারের সকালে আমি এক ভদ্রমহিলার ফোন পেলাম। ভারি আন্তরিক গলা। বলল, আমি অতসীকায়ার মা। আমার মেয়ে তোমার সঙ্গে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে তার জন্য আমি ভীষণ লজ্জিত। ক্ষমা চাইছি মেয়ের হয়ে। আর বাবা যদি কিছু মনে না করো, আজ সন্ধেবেলায় আমাদের বাড়িতে তোমাকে আসতে হবে। কোনো অজুহাত কিন্তু চলবে না, আসতেই হবে। আমি জানি তোমার মা নেই, আমি তো তোমার একজন মায়েরই মতন। আসতে হবে কিন্তু।'

'নেমন্তন্ন পেয়ে যে কারও এমন হৃৎকম্প হতে পারে, তা প্রথমে বুঝলুম।'

'মেয়েটার কী নামটা বললে যেন!'

'কেন বলুন তো! নামটা কি চেনা—চেনা ঠেকছে?'

'হ্যাঁ। কোথায় যেন শুনেছি। সাউন্ডস ফ্যামিলিয়ার।'

'মেয়েটির আরও দুই দিদি আছে। বড়োটি মাধবীমায়া, মেজো বিটপীছায়া আর ছোটোটি অতসীকায়া। এদের মামা একজন নামকরা কবি। তিনিই এসব কাব্যিক নাম রেখেছেন ভাগনিদের।'

'কবি! তাই বলো! কবিরা তো একটু মাথা—পাগলা, ছিটিয়াল গোছেরই হয়। তবে নামগুলো কেন যেন আমার বড্ড চেনা ঠেকছে। কোথাও শুনেছি। মনে হচ্ছে, এদের আমি চিনিও। তা, তুমি কি নেমন্তন্নে গেলে নাকি?'

'আজ্ঞে, না গিয়ে উপায় কী বলুন! ঘাড়ে আমার ক—টা মাথা! একে গুন্ডা মেয়ে, তার ওপরে বাবা ভিআইপি।' একটু ভেবে মোহনবাঁশি জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনি কি শরৎচন্দ্রের বইটই পড়েছেন?'

'শরৎবাবু! তা হঠাৎ শরৎবাবুর কথা কেন উঠছে বলো তো? তা পড়েছি বই কী! শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, রামের সুমতি, মহেশ...কিন্তু শরৎবাবুকে টানাটানি করতে হচ্ছে কেন?' মাথা চুলকে জানতে চাইলেন যদুবাবু।

'আজ্ঞে তার কারণ, শরৎচন্দ্রের লেখায় ভালো ভালো মেয়েদের কথা আছে। খুব নারীদরদি লেখক ছিলেন তো! আমি বুদ্ধি করে উপহার হিসেবে শরৎ রচনাসমগ্র নিয়ে গিয়েছিলুম। যদি ওসব পড়ে মেয়েটার মতিগতির বদল হয়। তা জন্মদিনে গিয়ে দেখি, বাড়ি বিয়েবাড়ির মতো সাজানো। এলাহি খাওয়া—দাওয়ার বন্দোবস্ত। সেদিন অবশ্য মেয়েটা বেশ ভালো ব্যবহারই করেছে। ধমক—চমক বিশেষ করেনি।'

'তা হলে তো ফাঁড়া কেটেই গেছে, কী বলো?'

'তাই যদি হবে, তা হলে আর আপনার কাছে আসা কেন? ব্যাপারটা তো ওখানেই শেষ হয়নি। মেয়ের মা দু—দিন পরেই আমার কাছে এসে হাজির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তাঁর নাকি পাত্র হিসেবে আমাকে ভারী পছন্দ। মেয়েরও নাকি অমত নেই। প্রথমে ঠোঁট ওলটালেও পরে নাকি বলেছে, কোনোরকমে চলে। তবে ঘষামাজা দরকার।'

'এও বড়ো সাহস।'

'তা হবে না কেন? আপনিও তো কম ডাকাবুকো নন!'

'আমি! আমি পিকচারে আসছি কী করে?'

'আসছেন, কারণ অতসীকায়া আপনারই ছোটো খুকি যে!'

'আমার ছোটো খুকি! তাই বলো! তা হলে এতক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছিলে কেন? তা বিয়েটা কবে বলো তো?'

'আজ্ঞে, সেটা নিয়ে কথা বলতেই আসা। আমি বিয়ে করে মৃত্যুবরণ করতে চাইছি না। তাই বলছি, আপনি আমাকে এই বিয়েটার হাত থেকে বাঁচান। আপনার ছোটো খুকি যদি কোনোদিন রেগে গিয়ে আমার ঘাড়ে একটা ক্যারাটে চপ বসায় বা কিক মারে, তা হলে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা, না হলেও সারাজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।'

'তাই তো হে! তোমার দিকটাও তো ভেবে দেখা দরকার। ছোটো খুকির এসব বাড়াবাড়ি তো মোটেই ভালো নয়। লোকে নিন্দে করবে। তা কী করা যায় বলো তো!'

'সেটা তো আপনিই বলবেন।'

'আমি! আমি শচীর মতামতের ওপর মতামত দেব? খেপেছ নাকি? আমি কি সাধ করে বাড়ি ছেড়ে অফিসে এসে ঘাপটি মেরে থাকি? থাকতে হয় বউয়ের ভয়ে।'

'সে কী!'

'আমি বলি কী বাপু, তুমি আর টালবাহানা না করে চোখ বুজে বিয়েটা করেই ফেলো। হাতের কাছে ফার্স্ট এড রেখো। আর যতদূর সম্ভব বউয়ের সঙ্গে একটা ডিসট্যান্স মেনটেন কোরো। রিস্ক নিতে যেয়ো না। বউয়ের মুখের ওপর কথা বলতে নেই।'

'আপনি কি কাপুরুষ?'

'না হে। আমি আদ্যন্ত কাপুরুষ নই। শুধু ওই একটা জায়গায়। তুমি কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভালো। ওতে অক্সিজেন ইনটেক বাড়ে।'

বৃষ্টি

দেখবেন, দুনিয়ায় যারা দুর্বল তারাই বেশি ভালবাসা চায়, মনোযোগ চায়। যাদের মনে অনেক জোর আছে, তারা ওসবের তেমন তোয়াক্কা করে না। আমি আবার দুর্বলের মধ্যেও দুর্বল। এতই দুর্বল যে কারও ভালোবাসা বা মনোযোগ চাইতে ভয় করত। বড়জোড় অনুকম্পা। সেটাই যথেষ্ট।

সেটা কি ছেলেবেলা থেকেই?

হ্যাঁ। আমরা চার বোন, এক ভাই। ভাই সবচেয়ে ছোট। বোনদের মধ্যে আমি মেজো। আমার যখন সাতবছর বয়স, তখন মা আর বাবা যুক্তি করে আমাকে একটা বাড়িতে দত্তক দিয়ে দেয়। বিজন আর সুমিতা নামের এক কাপল। তাদের সন্তান হয়নি। আমরা শুনেছি, তারা আমার মাকে কিছু টাকাও দিয়েছিল। কিন্তু আমি সেই বাড়িতে গিয়ে এত কান্নাকাটি করেছিলাম যে, মাস দুই বাদে তারা আমাকে ফেরত দিয়ে যায়। কিন্তু টাকাটা ফেরত পায়নি বলে তারা খুব ঝগড়া করত এসে, পুলিশের ভয় দেখাত আমার বাবা আর মাকে। আর তখন থেকেই আমি মা—বাবার চক্ষুশূল। মারধরের শুরু সেই থেকেই। বাড়িতে কোনো কিছু ঘটলেই মায়ের রাগ এসে পড়ত আমার উপর। বাবারও তাই। বাবা রাগী মানুষ, ট্রাক ড্রাইভাররা শুনেছি রাগী হয়। কারণে অকারণে মারধর খেতে খেতেই আমার মনটা বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভালোবাসা, অপত্য স্নেহ, মায়া—মমতা এগুলো বুঝতেই পারিনি।

একেবারেই না?

সেটাই বলতে চাইছি। কিন্তু কীভাবে যে বলা যায়, তা ঠিক বুঝতে পারছি না। লজ্জা—ঘেন্নারও তো একটা ব্যাপার আছে।

যাক, তবে বলবার দরকার নেই।

তা কেন? ভেবে দেখলে মনে, খোলা আলোর সামনে দাঁড়লে একটু হালকা হওয়া যায়। গোপনের যন্ত্রণা বেশি। এত লুকোতে—লুকোতে শঠ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সত্যি—মিথ্যে গুলিয়ে যায়।

আমার মায়ের একজন প্রেমিক ছিল। বাবা তো দূরপাল্লার ট্রাক চালাত, চার—পাঁচ সাতদিন বাড়িতে থাকত না। তখন একজন আসতেন, কমলমামা। বেশ হাট্টাগোট্টা চেহারা, আগে ফুটবল খেলতেন। ইনসিওরেন্সে ভালো একটা চাকরিও করতেন। আমার মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কি?

হ্যাঁ। আমার সবচেয়ে ছোট বোনটাকে যদি দেখতেন, তা হলে বুঝতে পারতেন। কমলমামার মুখ যেন কেটে বসানো।

আপনার বাবা সেটা লক্ষ করেননি?

তা কে জানে! তবে উচ্চবাচ্য করেনি। আর বাবা তো বেশ কিছুদিন পরপর ঝড়ের মতো বাড়িতে আসত, রাক্ষসের মতো খেত, পাথরের মতো ঘুমোত, রাতে নেশা করে ফিরত। ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে তাকানোর মতো সময় কোথায়? দু'দিন পরেই আবার উধাও হয়ে যেত।

বুঝেছি।

আপনি ভালোবাসার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। সত্যি কথা বললে বলতে হয়, ওই কমলমামাই আমাকে একটু—আধটু স্নেহ করেছেন।

তাঁর স্নেহটা কী করে বুঝতেন?

তাই তো! কী করে বুঝতাম বলুন তো! কিন্তু বুঝতাম। বোধ হয় চোখের দৃষ্টিতে একটা কিছু থাকে যা থেকে বোঝা যায়। কখনও—সখনও মাথায় হাত রাখতেন বা বেণীটা নেড়ে দিতেন। মাকে বলতেন, মধুরিমাই তোমার মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি। কী শান্ত স্বভাব। আর শুধু আমার হাতের চা খেতেই পছন্দ করতেন। এটা ঠিক ভালোবাসা না হলেও একটু পক্ষপাত।

কিছু মনে করবেন না, আপনার প্রতি তাঁর কোনো সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশন ছিল না তো!

দেখুন, পুরুষমানুষের দৃষ্টিতে একটু কামভাব থাকেই। ওটাই হয়তো পুরুষমানুষের বৈশিষ্ট্য। তাদের নিষ্কলুষ চোখই নেই। তা মা—মেয়ে—ছুঁড়ি—বুড়ি যাই হোক, পুরুষের চোখে ও জিনিস একটু—আধটু থাকবেই। শুধু কমলমামাকে দোষ দিয়ে লাভ কী? প্রকৃতিরও তো একটা নিয়ম আছে! মানুষ সমাজের মুখ চেয়ে প্রকৃতির নিয়মের উপর নিজের নিয়ম চাপিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু তার বায়োলজিতে প্রকৃতিই তো লুকিয়ে টু দিচ্ছে!

বুঝেছি।

আপনাকে আগেভাগেই বলে রাখা ভালো যে, কমলমামা কিন্তু আমার ব্যাপারে কখনও চৌকাঠ ডিঙোননি।

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। তবু জিজ্ঞেস করি, ডিঙোলে কী করতেন?

বলতে পারি না। আমার সেই বয়সের যে ভালোবাসার হ্যাংলামি ছিল, তাতে হয়তো বাধাও দিতাম না। হয়তো একটু অবাক হতাম। হয়তো একটা ধারণা পালটে নিতে হত।

আপনি সাহসী। বুকের পাটা আছে। এই স্বীকারোক্তি আপনাকে চিনতে আমাকে সাহায্য করবে।

দূর! এটা কোনো সাহসের ব্যাপার নয়। মেয়ে হলে আপনি বুঝতেন, পরিবারের গুরুজন পুরুষদের কারও কাছেই মেয়েরা নিরাপদ নয়। দাদা, কাকা, মামা, এমনকী বাবারও ধর্ষণের শিকার কত মেয়েকে হতে হয় জানেন? খবরের কাগজে আজকাল প্রায় রোজ এসব ঘটনার খবর থাকে। যেসব খবর বেরোয় তার চেয়ে বহুগুণ ঘটনা ঘটে যায়। সেগুলো জানাজানিও হয় না।

হ্যাঁ, সেকথা ঠিক।

তাই তো বলছিলাম, মানুষের সমাজে এগুলো অপরাধ বলে মনে করা হয়। আবার দেখুন, প্রকৃতির নিয়মে এগুলো অপরাধ নয়ও। পশুদের সমাজে যৌনমিলন অবারিত, সেখানে সম্পর্কের বালাই নেই, ইনসেস্ট বলে কিছু নেই। তাই না?

হ্যাঁ তাই। আপনি কি অবারিত যৌনমিলনের সমর্থক?

শুনুন, যৌনমিলনটাকে আপনি অত গুরুতর করে তুলছেন কেন? আমি যে ভুখা পরিবারের মেয়ে, সেই পরিবারের কোনও নীতিবোধ ধরে রাখাই শক্ত। ওই সমাজে একটা মেয়ে একটা লোভনীয় উপহারের জন্য দেহ দিয়ে দিতে পারে। একটা কালো কুচ্ছিত মেয়েও জানে তার কিছু না থাক, একটা যৌনাঙ্গ আছে, আর তারই যা কিছু দাম এ বাজারে পাওয়া যায়।

আপনি খুব অকপট।

অকপটকে কিন্তু মানুষ ভয় পায়, ভাল চোখে দেখে না।

অকপট হতে বুকের পাটা লাগে। মনে হল আপনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

হ্যাঁ। আপনার অকপট শব্দটা নিয়েই আমি একটু গোলমালে পড়ে গেলাম। বুঝতে পারছি না কথায় বা আচরণে বেআব্রু হওয়াটাই অকপটতা কি না। তাই যদি হয়, তা হলে নুডিস্টদের দেখুন। বেচারারা অকপট হতে গিয়ে জামাকাপড় খুলে ফেলল। কিন্তু উলঙ্গ হয়েও তেমন কিছুই করে উঠতে পারল না। ছোট—ছোট কলোনিতে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে রয়ে গেল। লোকে চিড়িয়াখানার জীবজন্তুর মতো তাদের গিয়ে দেখে আসে।

আপনি তো নিশ্চয়ই কপটতার সমর্থক নন।

তা কেন। কিন্তু ঢাকাচাপা দেওয়াই তো আর কপটতা নয়। শুধু উন্মোচন কিন্তু বুদ্ধির লক্ষণ বলে আমার মনে হয় না। আমাকে আপনার অকপট বলে মনে হলেও আমি সত্যিই কিন্তু তা নই। অর্থাৎ আমি তেমন বোকা নই।

অকপট মানে কি বোকা?

কী জানি! শব্দটা শুনতে ভালো, কিন্তু গোলমেলে। সেই সব শব্দই গোলমেলে যার নানারকম অর্থ করা যায়।

কিন্তু আমরা যে একটা শব্দেই আটকে আছি শ্যামা, শব্দটা বরং সরিয়ে রাখা যাক। নইলে আমাদের কথা এগোবে না।

ঠিক কথা। আপনি নিশ্চয়ই পশুপাখিদের জীবন লক্ষ করেছেন। তাদের ঢাকাচাপা দেওয়ার বালাই নেই, তারা খোদার উপর খোদগিরি করে না, আদ্যন্ত প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা তাদের জীবন। কিন্তু কয়েক হাজার বছর ধরে তারা যেমন ছিল তেমনই আছে। একহাজার বছর আগেকার একটা বাঁদরের সঙ্গে আজকের একটা বাঁদরের কোনও তফাত নেই। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির সব নিয়মই মেনে নেয়নি, সে কিছু কিছু এডিট করেছে। আর তাই মানুষ বদলে বদলে যায়। তাই না?

হ্যাঁ, তাই। কিন্তু কথাটা উঠছে কেন?

ওই অকপট কথাটা থেকেই এসব এল। ভাবছিলাম, সভ্যতা মানেই খানিকটা কপটতা কি না।

হতেই পারে। যার যেমন ব্যাখ্যা।

কিন্তু এত পরিবর্তনের পরও, এত ঋষিবাক্য, হিতোপদেশের পরও মানুষের ভিতরে আদিম রিপু এখনও শেষ কথা বলে। তা হলে আপনাকে পাগলুকাকার কথা বলি।

তিনি কে?

বাবার খুড়তুতো ভাই। একটু পাগলাটে গোছের এবং সবাই তাকে সাধুসন্তের মতো মানুষ বলে মনে করত। ভারী পরোপকারী ছিলেন। টাকাপয়সার প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। এককথায় একজন চমৎকার লোক। সবাই ভারী পছন্দ করত তাঁকে। আমাদের বাড়িতে মাঝে—মাঝেই আসতেন। কিন্তু সেই যে বলে না, কুসুমেও কীট! পুজোর আগে একদিন মা আমার সব ভাইবোনকে নিয়ে পুজোর জামাকাপড় কিনতে গেছে। বাড়ি পাহারা দিতে রেখে গেছে আমাকে। সেই সময়ে পাগলুকাকা এলেন। দিব্যি হাসি—হাসি মুখ, হাতে একটা শাড়ির প্যাকেট। সেটা খুলে ঝলমলে ভারী সুন্দর শাড়িটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, পুজোর সময় পরিস। আমি তো অবাক। পাগলুকাকা হঠাৎ আমাকে শাড়ি দিচ্ছে কেন, তাও আবার এত দামি। আমি অবাক তো বটেই, কিন্তু খুশিতেও ডগোমগো। কী ভাল শাড়িটা। পাগলুকাকু বললেন, বউদি আর পানুদা তো তোকে তেমন যত্ন করে না। ভাবিস না, আমি তোকে চাইনিজ খাওয়াতে নিয়ে যাব। এবার আপনিই কিন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

হ্যাঁ। এ হচ্ছে প্রাচীন বিনিময় প্রথা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও আপনাকে সেটাই বলতে চাইছি। আর আশ্চর্য এই যে, আমিও ঠিক তখনই হঠাৎ বুঝতে পারলাম, পাগলুকাকা আমার কাছে কী চায়। মানুষ যেসব সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে, গুরুজন—লঘুজন, অগম্যা—অগম্য, পিতৃবৎ—মাতৃবৎ—সন্তানবৎ ইত্যাদি, পাপ—পুণ্য, কর্মফল, সব কিছুই এত পলকা যে, হঠাৎ একটা প্যাশনের প্রলয়ঝড় খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। ওটাই হচ্ছে প্রকৃতির শক্তি। মানুষ শেষঅবধি ওই

শক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। সভ্যতার বিস্তর সেন্ট পাউডার মেখেও তার গায়ের বুনো গন্ধ ঠিকই ফুঁড়ে বেরোয়।

আপনি রুখে উঠলেন না?

উঠেছিলাম, কিন্তু ফণাটা খুব উঁচুতে উঠল না। তার কারণ ওই সুন্দর শাড়িটা আর চাইনিজের আশ্বাস আমাকে দুর্বল করে ফেলেছিল বোধ হয়। পাগলুকাকা সঙ্গে করে কন্ডোম এনেছিলেন। অর্থাৎ সব কিছুই আগে থেকে ছক কষা ছিল। টাইমিং, টোপ, অ্যাপ্রোচ এবং যা হওয়ার তা হয়েও গেল।

আপনার রিঅ্যাকশন?

ওই যে বললাম। খানিকটা অবাক। আর পুরোনো ধারণা ও বিশ্বাসের পরিবর্তন। একটু গা ঘিনঘিন।

এর পরও কি উনি...

না। ওই একবারই এবং বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ওঁর ভীষণ মনস্তাপ হয়েছিল। কয়েকদিন পর এসে আমার কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমাও চেয়ে যান।

আপনি কি ওঁকে ক্ষমা করেছিলেন?

আচ্ছা আপনিই বলুন তো, ক্ষমা ব্যাপারটা আসলে কী! ক্ষমা কীভাবে করা যায় আমাকে একটু শিখিয়ে দেবেন? যদি বলেন, ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই হল ক্ষমা, তা হলে বলি ভুলেই বা যাব কী করে? ইচ্ছেমতো কি ভুলে যাওয়া সম্ভব?

খুব কঠিন প্রশ্ন ম্যাডাম। আসলে ক্ষমা কথাটার প্রকৃত অর্থ আমারও জানা নেই।

আমি অনেক ভেবেছি। একবার মনে হয় ভুলে যাওয়াই বুঝি ক্ষমা, কখনও মনে হয়েছে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দেওয়াই ক্ষমা, কখনও মনে হয় মেনে নেওয়াটাই বোধহয় ক্ষমা। অনেক ভেবে যা বুঝেছি তা হল, আসলে ক্ষমা করার জন্য যতটা শক্তিমান হওয়া দরকার তা আমি নই। ক্ষমা করার জন্য দুর্জয় শক্তি আর ভীষণ বুকের পাটা লাগে। হয়তো দেবতাদের থাকে, যুধিষ্ঠিরের বা যীশুর ছিল। আমরা কাউকে ক্ষমা করার যোগ্যই তো নই। আপনি কি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন?

হ্যাঁ। আসলে দীর্ঘশ্বাসটা অনিবার্য ছিল, কারণ আপনি বোধহয় একটা অমোঘ সত্যের কথা বললেন। আমারও মনে হচ্ছে, আমরা আসলে সত্যিই কাউকে ক্ষমা করতে পারি না, শুধু সিচুয়েশনটার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিই।

ফলে আমি পাগলুকাকাকে ক্ষমা করেছি কি না তা আমি আজও বুঝতে পারি না। আর জীবন, সে যেরকমই হোক, একজায়গায় থেমে থাকে না, সে ঘটনার পর ঘটনা ঘটিয়ে চলতেই থাকে। আপনাকে আমি আগেই বলেছি, আমরা যে সমাজে বাস করতাম সেখানে মরালিটির মূল্য খুব বেশি নয়। অর্থাৎ সেক্স কোনো গুরুতর বিষয় নয়। তবু আমি এটা নিয়েও ভেবেছি যে, ওটা পাপ কিনা। যা মনে হয়েছে তা নিঃসঙ্কোচে বলতে গেলে বলতে হয়, শরীরের কোনো পাপ হয় না। পাপ মনের। আর শরীর হল মনের দাস।

সেটা তো ঠিকই।

তবু ধর্ষিতা মেয়ের ধর্মনাশ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। আমি বলি যদি ধর্মনাশের ভয় পাও, তা হলে ধর্ষণ হতে দাও কেন? নিজেরাই বা করো কেন? কই, কোনো মেয়ে তো কখনও কাউকে ধর্ষণ করতে যায় না!

আমি যুক্তিটা মানছি।

আপনি হয়তো একজন ধুরন্ধর পুরুষ। মুখে মেনে নিচ্ছেন, প্রতিবাদ করছেন না। ভিতরে—ভিতরে হয়তো কিছুই মানছেন না। হাসছেন কেন?

আবার সেই কপটতা, অকপটতার কথা উঠে পড়বে। অর্থাৎ আপনি আমাকে একজন কপট লোক বলে ভাবতে শুরু করেছেন!

কথাটা ভুল বলেননি। পুরুষদের বিশ্বাস না করাটাই আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

জীবনের নানা অম্ল—মধুর অভিজ্ঞতা থেকেই তো আমাদের ধারণাগুলো তৈরি হয়। কিন্তু আমাকে অকারণে কপট ভাববেন না। আমার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে। খুবই লঘু এবং বস্তাপচা প্রশ্ন। ইচ্ছে না হলে জবাব দেওয়ার দরকার নেই।

প্রশ্নটা কী?

আপনি বোধ হয় আর নর—নারীর প্রেম—ভালোবাসায় বিশ্বাসী নন?

কে বলল নই? আমার কথা শুনে কি তাই মনে হল?

মনে অবিশ্বাস থাকলে কি ভালোবাসা সম্ভব?

ছেলে যদি চোর হয়, মিথ্যে কথা বলে, বদমায়েশি করে বেড়ায়, তা হলে তার মা কি ভালোবাসে না? ছেলেকে বিশ্বাস না করলেও ভালোবাসে।

ম্যাডাম, মা আর ছেলের ব্যাপারটা ইনস্টিংটিভ। লাভ বাই চয়েস নয়।

শুনুন, আমি আপনার একথাটাও মানলাম। ঠিক কথা। মা আর সন্তানের ভালোবাসাটা সিলেক্টিভ নয়। আরও একটা ব্যাপার হল, মা তার অপত্য স্নেহের কোনো প্রতিদানও চায় না। ছেলে যদি মাকে নাও ভালোবাসে তবু মা একতরফাই ছেলেকে ভালোবাসতে পারে। আর জানবেন, এরকম ভালোবাসা অর্থাৎ ভালোবাসার এই প্যাটার্নটা মেয়েদেরই একচেটিয়া। ছেলেদের নয়।

একটু ব্যাখ্যা করুন।

বরুণ নামে একটা ছেলে আমার প্রেমে পড়েছিল। সে কী প্রেম রে বাবা! স্বর্গ—মর্ত—পাতাল এক করতে পারে। জানালায় ঢিল মারত, চিঠি দিত, তাতে লিখত আমার জন্য প্রাণ অবধি দিতে পারে। প্রেমে একদম পাগল হয়ে গেল। দিনরাত আমাদের বাড়ির চারদিকে ঘুরে—ঘুরে যেত। একটা প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির ব্যবসা ছিল তার, সেই ব্যবসা লাটে ওঠার জোগাড়। আমার তখন সতেরো বছর বয়স। জীবনে সেই প্রথম ভালোবাসার আঁচ পেয়ে আমিও ডগোমগো, পাগল—পাগল। ডিটেলস—এর দরকার নেই। বেশ কিছু বাধা—বিপত্তি ডিঙিয়ে একদিন আমাদের বিয়েও হয়ে গেল।

আপনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। একটা পজ দিচ্ছেন কি?

হ্যাঁ, ভাবছি এসব বলেই বা কী হবে। হাঁড়িতে যখন ভাত ফোটে, দেখেছেন? হাঁড়ি জুড়ে উথাল—পাতাল, টগবগ। কিন্তু ভাতকে তো আর অনন্তকাল ফুটতে দেওয়া যায় না। তাকে নামাতে হয়। জুড়োতে হয়, ফ্যান ঢেলে দিতে হয়। উথাল—পাতাল প্রেমের পর বিয়ে হল হাঁড়ির ভাতের মতো। টগবগানি নেই, কিন্তু বন্ডিং আছে। ছেলেদের প্রেম আর মেয়েদের প্রেমের মধ্যে তফাত হল ওইটি। ছেলেরা কেবল টগবগানি চায়। যার জন্য পাগল হল তাকে পেয়েই তার প্রেম উবে গেল, আবেগ উধাও, পাগলামি নেই, বউয়ের মুখের দিকে না তাকিয়েও তার চলে যায়। তখন সে নতুন টগবগানির জন্য ছোঁক—ছোঁক করে বেড়ায়।

আর মেয়েরা?

দেখবেন, বেশির ভাগ মেয়েই চায় পুরুষটিকে ঘিরে একটি নিরাপদ সংসারের রচনা। নির্ভরতা তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। একটি মেয়ের জন্য পুরুষ হয়তো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে, দাঙ্গা—হাঙ্গামা করতে পারে, কিন্তু নিজস্ব নারীটির প্রতি বিশ্বস্ত থাকা তার পক্ষে কঠিন। মেয়েদের ঠিক উলটোটা।

বরুণের সঙ্গে কি আপনারও তাই হল?

হল। বিয়ের দুমাস বাদেই সে বুঝতে পারল সে কত ভুল করে ফেলেছে। আর সেই ভুলের গুণাগার দিতে হচ্ছিল আমাকে। ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি গরিবদের ঘরে থাকেই। সেটা তত কিছু নয়। চড়চাপড়ের পর আদরও তো থাকে। কিন্তু বরুণের বাড়িতে চড়চাপড় বাড়তে লাগল, আদর কমতে—কমতে তলানিতে চলে গেল। একদিন বরুণ, তার দুই ধুমসি বোন আর দজ্জাল মা আমাকে মারতে মারতে উঠোনে ফেলে দিয়েছিল।

নর্দমার ধারে পড়েছিলুম, কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল না। চেতনা ফিরল গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায়। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন।

আবার বিরতি দিচ্ছেন?

বৃষ্টিতে একটা প্ররোচনা ছিল।

তার মানে?

আমার মনে হয় ওইদিন ঠিক ওই সময়ে বৃষ্টি যে নেমেছিল তা এমনি নয়। বৃষ্টিটা যেন ছিল উদ্দেশ্যমূলক। প্রবল বৃষ্টি আমার সর্বাঙ্গ ভাসিয়ে নিচ্ছিল। কেঁচোর মতো সরু সরু জলের স্রোত আমার পোশাকের ভিতরে ঢুকে শরীরে যেন ব্যথার প্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছিল। টোকা দিচ্ছিল আমার মাথায়, বলছিল, জাগো, জেগে ওঠো। ভালো করে তাকাও, তোমার কিছুই হারায়নি।

সেই জন্যই কি আপনার এনজিও—র নাম বৃষ্টি?

আপনি বুদ্ধিমান।

বৃষ্টির কাছ থেকে সেদিন কি আপনি ক্ষমা এবং সেবার পাঠ নিলেন?

আপনি বোকা।

এই তো এক্ষুনি বললেন, বুদ্ধিমান।

তাও বলেছি, বোকাও বলছি।

কেন?

আবার ক্ষমার কথা তুললেন বলে। ক্ষমা একটা দুর্বোধ্য শব্দ। ক্ষমা করার অধিকার কার আছে বলুন, যখন সকলেই কোনো—না—কোনোভাবে অপরাধী!

আর বৃষ্টির পর কী হল? তার পরে কি আপনি একটা এনজিও খুলে ফেললেন, আর হয়ে গেলেন তার সর্বেসর্বা? আপনার এনজিও যে বিশাল কাজ করছে তার জন্য দায়ী কি ওই বৃষ্টি?

ওই বৃষ্টিটার কথা আমি খুব ভাবি জানেন? কী অদ্ভুত বৃষ্টি। ওটা ঠিক আমাদের নিয়ম মানা বৃষ্টির মতো নয়। হয়তো কখনও—সখনও কারও জন্য ওরকম বৃষ্টি কানে—কানে কিছু বলে দিয়ে যেতে আসে, দান উলটে দেয়, কিংবা কিছু একটা হয়। ওই বৃষ্টির পর আমরা অল্প—অল্প বদলে গেলাম।

প্রতিশোধটা নিলেন কীভাবে?

প্রতিশোধ! প্রতিশোধের কথা উঠছে কীসে? কেন প্রতিশোধ? কার ওপর প্রতিশোধ? ওই বৃষ্টিই তো আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, ওরা কত দুর্বল, কত ছোট, কত অসহায়। আমার মতোই। একদল গুন্ডা আসুক বা ডাকাত ঢুকুক, ওরা নেংটি ইঁদুরের মতো হয়ে যাবে। একজন এমএলএ বা দারোগা এসে দাঁড়ালে এদের কাপড়চোপড় নষ্ট হওয়ার জোগাড়। এদের ওপর কি প্রতিশোধ নিতে আছে?

দাঁড়ান ম্যাডাম, দাঁড়ান। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, বৃষ্টির এগজিকিউটিভ সেক্রেটারির নাম বরুণ রায়, বাই এনি চান্স...

ও আমার বর। আপনি বুদ্ধিমান।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! তা হলে তো বলতে হয় আপনি শেষ অবধি প্রতিশোধ নিয়েছেন!

উঃ! আপনি বড্ড বোকা!

বৃষ্টিতে নিশিকান্ত

কেচ্ছাকেলেঙ্কারির মতো বৃষ্টি হচ্ছে কদিন। জলের ফোঁটা লক্ষ অর্বুদ গুড়ুলের মতো ছুটে আসে আকাশ থেকে, মাটি ফুঁড়ে বসে যায় ভিতরে। গায়ে লাগলে ফটাস করে ফাটে। ব্যথা পায় নিশিকান্ত। আদিঅন্ত সাদা হয়ে আছে, শীতের কুয়াশার মতো, কিছু নজর চলে না। আর সেই সাদাটে ভাবের আবডালে কী যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হচ্ছে কে জানে! উলটে পালটে যাচ্ছে জগৎসংসার। সেই কেচ্ছাকেলেঙ্কারির কথাই বৃষ্টির শব্দে ছড়িয়ে যাচ্ছে, ফিস ফাস গুজুর গুজুর। ওই বৃষ্টির আবডালে আবার জগৎসংসার যে থেমে আছে এমনও নয়। বেলপুকুরের বাজারে মহেন্দ্রর দর্জির দোকানে মেশিন চলছে খরখর শব্দে। মুদির দোকানে দু—চারজন কাকভেজা লোক সওদা করছে। আলু পেঁয়াজ নিয়ে ভূপেন বসেছে ভূষিওয়ালার বারান্দায়। দোকান সব একটু আধটু ফাঁক করে কাজকর্ম চলছে ঠিকই। কিন্তু সেটা বোঝা যায় না। বৃষ্টির রকম দেখে মনে হয় মানুষজন বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব। দুনিয়ায় আর মানুষ মাটির চিহ্ন রাখবে না।

বাগনানের বাস কখন বন্ধ হয়ে যায় কে জানে। এখনও চলছে। নিশিকান্ত অন্ধকার বিকেলবেলায় বেলপুকুরে নেমে পড়ে বাস থেকে। গায়ে ফতুয়া, পরনের ধুতিখানা উরুত পর্যন্ত তোলা। ছাতাখানা বগলদাবা করেই নামে। এই বাতাস বৃষ্টিতে ছাতা খুলতে ভয় করে তার। ফটাস করে উলটে গিয়ে পুরোনো ছাতার শিকটা ছরকুটে যাবে। অবশ্য ছাতা খুলতে তাকে কখনো দেখেওনি কেউ।

রাস্তাঘাট কিছু দেখা যায় না। ঝুপুস করে জলে পা দেয় নিশিকান্ত। দোলের দিনে যেমন ছোঁড়ারা রঙের বেলুন ছুড়ে মারে আর সেটা ফটাস করে ফাটে, তেমনি আকাশঠাকুর ছুড়ছে তার বিদঘুটে বেলুন সব। নিশিকান্তের শরীরে অ্যাই বড়ো বড়ো ফোঁটা ফাটছে। নামতে না নামতেই ভিজিয়ে একশা করে দিল। দৌড়ে গিয়ে সামনের দোকানটায় উঠে দাঁড়ায় সে। বৃষ্টির রকমটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাসটা তাকে ফেলে ইস্টিমারের মতো চলে গেল। কোমরের কাপড়ের মধ্যে শতপাল্লার ভাঁজে সাবধানে বিড়ি আর দেশলাই মুড়ে রেখেছে। দোকান ঘরের বেঞ্চটায় বসে কোমরের কাপড় আলগা দিয়ে নিশিকান্ত বিড়ি দেশলাই বের করে আনে। চায়ের দোকানদার তার দিকে বিরক্তির চোখে চায়। তার গা বেয়ে জল নেমে বেঞ্চ ভিজছে। নিশিকান্ত যে খদ্দের নয় একথা দোকানি জানে।

বিড়িটা জখম হয়ে গেছে। নিশিকান্ত দু—ধারে ফুঁ দিয়ে টিপেটুপে দেখে তারপর নিরাসক্ত গলায় বলে—আগুনটা দাও তো।

সামনে উনুন জ্বলছে, খামোকা দেশলাইয়ের একটা কাঠি নষ্ট করে কোন বুরবাক। দোকানদার অবশ্য গা করে না। তাই নিশিকান্ত উঠে বিড়িটা কেটলির পাশ দিয়ে উনুনে গুঁজে দেয়। ধরিয়ে আবার জুত করে বসে। তাড়া নেই। মহেন্দ্র দর্জির দোকানে আধবোতল চুয়া রাখা আছে, গতকাল মহেন্দ্র কলকাতা থেকে এনে

রেখেছে, আজ নিয়ে যাওয়ার কথা। এই বৃষ্টি বাদলায় সে কাজটা নিশিকান্তকে দিয়ে না করালেই চলছিল না বউমণির। নিশিকান্ত বসে থাকে— এটা তার সহ্য হয় না। আজ দুপুরের কথাই ধরা যাক। এমন বাদলায় কার যে ডাব খেতে ইচ্ছে করে তা জন্মে জানে না নিশিকান্ত, কিন্তু বউমণির করল। তিনদিন রাতে খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে নাকি ধাত গরম হয়েছে। বৃষ্টি মাথায় সাঁই—সাঁই বাতাসের মধ্যে নিশিকান্তকে উঠতে হল গাছে। ভিজে—ভিজে পিছল হয়েছিল গাছ। পা হড়কে কয়েক হাত নীচে পড়েছিল সে। ঘষটানিতে বুকের নুনছাল উঠে গেছে খানিক। এখনও জ্বালা করছে। দুটো বোঁটা আলগা ঝানু ডাব খসে পড়েছিল। লুকিয়ে নিশিকান্ত সে দুটোর মুখ কেটে ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে লেইটাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। লেই মেশানো ডাবের জল মিষ্টি ঘোলাটে একটা শরবতের মতো হয়ে যায়, তার ভারি স্বাদ। সেই শরবত খেয়ে খোলা দুটো ছুড়ে পুকুরে ফেলেছিল সে। তারপর বাবলা তলায় দাঁড়িয়ে দেখে পুকুরের ছাপানো জলে ভেসে—ভেসে ডুবন্ত মানুষের দুটো মাথার মতো কোন দেশান্তরে চলে গেল। এই ঝাপসা বৃষ্টির বেলায় পৃথিবীটা কত ছোট্টটি হয়ে এসেছে, তবু কালো মেঘের ছায়ায় এখনও কত নিরুদ্দেশ হওয়ার মতো জায়গা আছে। জল থেকে খুদে মাছ উঠে আসছিল, বাবলাতলায় কই মাছ বেয়ে উঠে এসেছে, ভেজা গাছের ডালে বসে কাক খাখা করে। নিশিকান্তর তখন কত কী মনে পড়ি—পড়ি করে। কিন্তু আদতে কিছু তেমন মনে পড়ে না তার। নিশিকান্তর ওই হচ্ছে রোগ।

অন্ধকারে টর্চ বাতি জ্বেলে চলার মতো নিশিকান্তর অবস্থা। টর্চ বাতির যেটুকু আলো হয় সেটুকু গোলপানা আলোয় একটুখানি দেখা যায় মাত্র। সামনেও হাঁ করা অন্ধকার পিছনেও হাঁ করা অন্ধকার। অর্থাৎ নজর চলে না নিশিকান্তর। হাতেও তেমনি এক টর্চ বাতি ধরিয়ে অন্ধকার দুনিয়ার দিগদারিতে পাঠিয়ে দিয়েছে কে। যেমন তার বিস্মরণ তেমনি তার ভবিষ্যৎ চিন্তা। ভাবতে বসলেই নিশিকান্তর কাছে তার জীবনটা এক ঝাপসা বাদলদিনের মতো লাগে, পৃথিবীটা ছোট্টটি হয়ে যায়। নজর চলে না বহুদূর পর্যন্ত। কে তার বাপঠাকুরদা, কোথায় তার বাড়ি ঘর, কী তার জাত গোত্র এ নিশিকান্তর জানা নেই। লোকে বলে সে হল হাবাগোবা মানুষ। তাই হবে। তবু নিশিকান্ত খুব ভাবতে ভালোবাসে। যেমন সেই ডাবের খোলা দুটো কোথায় হারিয়ে গেল, কোন বিশাল বিশ্বসংসারে চলে গেল ডুবন্ত মানুষের মতো ডাব দুটো তা নিশিকান্ত ভাবতে বসে।

ট্যাঁকে চুরি করা দু—চার পয়সা তার থাকেই। হঠাৎ চায়ের একটা দমকা গন্ধ আর সেই সঙ্গে হাওয়ায় উনুনের একটু তাপ উড়ে এসে গায়ে লাগতেই নিশিকান্ত নড়েচড়ে বসে। তারপর তাচ্ছিল্যের গলায় বলে— দাও তো এক ভাঁড় তোমার চা। খেয়ে দেখি।

দোকানদার উনুনটা খুঁচিয়ে একটু আঁচ তুলছিল। একটা ডেকচিতে আলু পেঁয়াজ কুঁচিয়ে রেখেছে, বোধহয় এক্ষুনি কেটলি নামিয়ে রাতের রান্নাটা সেরে রাখত। নিশিকান্তর কথা শুনে ফিরে তাকাল, তারপর চায়ের গুঁড়ো ঢালতে লাগল খয়েরি ন্যাকড়া—দেওয়া ছাঁকনিতে।

নিশিকান্ত বেঞ্চ থেকে উনুনের ধারটিতে আগুনের তাপে তেতে—ওঠা চৌহদ্দির মধ্যে এসে উবু হয়ে বসে। অল্প অল্প করে চায়ে চুমুক মারে, গরম ভাঁড়টা মাঝে মাঝে চেপে ধরে ঠান্ডা গালে। কিছুই মনে পড়ে না, তবু কত কী যে মনে পড়ি—পড়ি করে তার। আধবোতল চুয়ার জন্য পলতাবেড়ে থেকে মাইল দেড় হেঁটে শিবগঞ্জ বাগনানের বাস ধরে সে যে এতটা পথ এসেছে এই বাদলায়, তাতে তার ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। এ সময়টায় ঘরে থাকলে তাকে বউমণি টোকার সঙ্গে মাছ ধরতে পাঠাত, নয়তো সাঁজাল দিতে। কিছু একটা করাতই। কিন্তু বাদলায় দোক্তা ফুরিয়েছে। বিকেলের আগে তামাক পাতা সেঁকা হয়েছে, ভাজা হয়েছে ধনে আর মৌরি। বিপিনবিহারী হামানদিস্তা নিয়ে বসেছে, দুমদাম শব্দে গুঁড়ো করছে সব । চুয়া মিশিয়ে বউমণি খাবে। ভাজা মশলার মাতাল মিঠে গন্ধে বর্ষার ছাতকুড়োপড়া গন্ধটা চাপা পড়েছে। কিছু গন্ধ আছে ভালোবাসার, যেমন গন্ধ গোলাপে, বক—ফুলের ভাজা বড়ায়, সোঁদা—স্যাঁতা মাটিতে। আবার কিছু নেশাড়ু গন্ধ। যেমন গন্ধ কেয়াফুলে, কিশোরীর ঘেমো শরীরে, ভাজা দোক্তাপাতায়। এমন কত গন্ধ যে হঠাৎ উড়ে আসে। তুলসীতে আর চন্দনে এক রকম ভগবানের গন্ধ আছে। পুরোনো পুঁথির পাতায় পাওয়া যায়

কতকালের মন কেমন করা গন্ধ। সব গন্ধ ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এই বর্ষার গন্ধটা যেমন। বড্ড মন খারাপ করে দেয়।

এই বর্ষায় ঘরের বার হওয়া মানুষের বড়ো তাড়া। একজন ছাতা—মাথায় গেরস্ত লোক ওপাশের দোকানে দৌড়ে এল কোলকুঁজো হয়ে, এক ঠোঙা মুড়ি কিনে আবার কোলকুঁজো হয়ে রাস্তা পেরোয়। ভাবগতিক দেখে মনে হয় ঘরে ঢুকেই হড়াস করে দরজা দিয়ে ঘড়াক করে হুড়কো তুলে দেবে। নিশিকান্ত একটুখানি হাসে। জগৎসংসারে মানুষের কত তাড়া থাকে। নিশিকান্তর নেই, তাই বউমণি বকে—বকে হয়রান। সারাদিন কোথাও বসে নিশিকান্ত একটু যে ভাববে তার উপায় নেই! কানে পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিলে নিশিকান্তর ভালো সব ভাবনাচিন্তা আসে। মাদার গাছটার তলায় বসে শুকনো উদাস দিনে নিশিকান্ত নিরিবিলি কানে পালক দিয়ে যখনই ভাবতে বসে তখনই বউমণির হাতে একটা লাটাইয়ের সুতোয় ঠিক টান পড়ে। ডাকে— নিশি...ই। নিশি অমনি চিন্তার শূন্যে উড়তে—উড়তে টান খেয়ে চমকে ওঠে। ভাবনা চিন্তা সব লাট খেয়ে যায়।

সওদা করতে গিয়ে নিশিকান্ত ঠিকঠাক হিসাব মেলাতে পারে না। বউমণি নিয়ম করেছে অঙ্ক শিখতে হবে। বিপিনবিহারীর তাই আজকাল রাতের দিকে তাকে হিসাব শেখানোর ঝোঁক চাপে। বলে— বল দেখি দু—টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা থেকে এক টাকা আশি পয়সা বাদ দিলে কত থাকে? তখন তার দুনিয়াটাই কেমন ঝাপসা হয়ে যায় এই বাদলা দিনের মতো। কত থাকে! তাই তো! কত থাকে! দু—টাকা পঁয়তাল্লিশ থেকে এক টাকা আশি বাদ দিলে অনেক থেকে যায় মনে হয়। নাকি কিছুই থাকে না! দশটা বিড়ির দাম যদি হয় পাঁচ পয়সা, একটা ম্যাচিস দশ...তাহলে...কত যে থাকে। বাদ দিতে গিয়ে জান কাঠকয়লা হয়ে যায়। আর তখন গাঁট্টা মারে বিপিন। বলে— তোর কত বয়স খেয়াল আছে।

—হুঁ—উ! নিশিকান্ত বলে— দেড় কুড়ি।

—দূর ভূত, এক কুড়ি তো টোকারই বয়স। তুই তো আমার চেয়েও বড়ো। পঞ্চাশের কাছাকাছি তো হবিই।

তাই হবে! বয়েসের হদিশ জানলে, এ দশা হবে কেন তার!

আবার কিছু খারাপও সে নেই। বিস্মরণ হওয়াটা যে মন্দ সে টের পায় না। বেশ আছে। টর্চ বাতির আলোয় যেটুকু দেখা যায় সেটুকু দেখে—দেখে সে চলেছে ঠিক। আজ যা ঘটে তা বড়োজোর এক হপ্তা সে মনে করতে পারে, তার ওপারে সাদা বৃষ্টি সব ঢেকে রাখে। বিস্মরণ হচ্ছে ঠিক টর্চ বাতির আলোর চৌহদ্দির বাইরের অন্ধকারের মতো, বাদলা দিনের মতো। চা—টা খেয়ে উঠে পড়ে নিশিকান্ত। সবাই জানে সে হচ্ছে একটু মাঠো লোক— ধীরস্থির, ঢিলাঢালা। কিন্তু তা বলে যে ইচ্ছেমতো কোথাও বসে থাকবে তার উপায় নেই। লাটাই বউমণির হাতে, সে হচ্ছে এক লাতন ঘুড়ি। যত দূরেই যায় নিশিকান্ত হঠাৎ হঠাৎ চমকা টান টের পায় সুতোর। লাট খায়। ঠিক যেন বউমণি ডাকে— নিশি—ই।

ছাতাটা না খুলেই সে বৃষ্টির জলে ছপাৎ করে পা ফেলল। যা বাতাস! ছাতা খুললে রক্ষে আছে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে হাত থেকে।

এখানকার মাটি বেলে, তাই তেমন পিছল নয়। তবু দু—একবার পা হড়কায় নিশিকান্তর। চবাস চবাস করে বৃষ্টি চাবকাচ্ছে, মাথা মুখ ফুটো করে দিয়ে যাচ্ছে রে বাবা! জলে ঝাপসা হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি, কান বন্ধ। আবছা—আবছা দোকানঘর, মানুষজন দু—একটা দেখা যায়। জগৎসংসার যেন বা থেমে গেছে দম ফুরানো ঘড়ির মতো।

মহেন্দ্র তার অবস্থাটা চোখ তুলে দেখে। দর্জিঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিশিকান্ত কাপড় নিঙড়ে নেয়, পিরানটা খুলে জল চিপে মাথা গা মুছতে থাকে। ছাতাটা আগাগোড়া খোলেনি সারা রাস্তা, তবু ছাতাটা ভিজে গেছে। মহেন্দ্র হেঁকে বলে— ছাতা বাইরে রাখ, তুমিও বাপু ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে গায়ের জল ঝরিয়ে এসো। এ বাদলায় ঘর যদি ভেজে তো শুকোবে না।

তাই করে নিশিকান্ত। দাঁড়িয়ে থাকে।

মহেন্দ্র কল চালাতে—চালাতে বলে— ছাতাটা তো সারাজীবন বগলেই দেখলাম। কোনোদিন খুলেছ?

—খুলি মাঝে মাঝে, রোদে শুকোতে যখন দিই।

মহেন্দ্র হাসে। বলে— নিশি, ছাতাটা তো ভোগে লাগালে না। তবে কেন বয়ে বেড়াও হে?

—কাজে লাগে। নিশিকান্তর উদাস উত্তর।

মহেন্দ্রর শাগরেদ গুপে পাটির ওপর বসে একটা জামার কলার ঠিকঠাক করছিল। সে দাঁতে কামড়ানো ছুঁচটা বের করে হাসল, বলল— কাজটা কী?

—সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাতেই কাজে লাগে।

গুপে আর মহেন্দ্র নিজেদের মধ্যে একটা চোখ ঠারাঠারি করে।

নিশিকান্ত দাঁড়িয়েই থাকে। ওই তার স্বভাব বলা যায়। সময়ের জ্ঞান থাকে না, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দরকার তা বিচার করতে পারে না। একটা বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করে। বর্ষায় ম্যাচিসের কাঠি সব ম্যাদা মেরে গেছে, ঠুকলেই বারুদ খসে যায়। অনেক কষ্টে অবশেষে ধরে ওঠে বিড়িটা। মিয়ানো গলায় বলে— জিনিসটা দিয়ে দাও, বেলাবেলি চলে যাই।

মহেন্দ্র সেলাই করতে করতে বলে— যাবে যাবে। একটু বসে যাও। জলটা ধরে যেতেও তো পারে?

বসতে বলায় নিশিকান্ত বসে। চৌকাঠের কাছে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে বলে— আর ধরেছে।

এইটুকু বলেই তার কথা ফুরোয়। আর কিছু ভেবে পায় না। মানুষে—মানুষে যে কত কথা বলাবলি হয়! বাসে আসতে সামনের সিটে দুই হাটুরে বসে তাদের বিকিকিনি, লাভালাভ, বাজার এবং ভগবান নিয়ে কত কথা বলে গেল। মানুষের মাথায় কথাও আসে বাবা, যেন শেষ নেই। নিশিকান্তর মাথায় আসে না। আবার এও ঠিক যদিই বা দু—চারটে কথা তার প্রাণে আসে তো তা শোনারও লোক নেই। কথা বলার জন্য, প্রাণ ঢেলে কথায় বাদলা নামিয়ে দেওয়ার জন্য এক একবার তার বিয়ের বাই চাপে। সুন্দরপানা মেয়েছেলের সঙ্গে ফুলের মালা বদল করে হ্যাজাকের আলোয় বিয়ে— সে ভারী একটা রহস্যময় আমুদে ব্যাপারও বটে। তার ছাতাটার সঙ্গে এমনি এক বিয়ে পাগলামির গল্প জুড়ে আছে। মায়াচরের কাছে সেবার ভীমপুজো দেখতে গিয়ে নিশিকান্তর আলাপ এক জোচ্চোরের সঙ্গে। অনেক কথা বিস্মরণ হয়ে হয়েও যে দু—চারটে তার মনে আতরের তুলোর মতো গন্ধমাখা হয়ে থাকে বহুদিন বাদেও, তেমনি কোনো কোনো কথা মনে থেকে যায়। জোচ্চোরটা নিশিকান্তকে প্রথম নজরেই জরিপ করে নিয়েছিল। ভীমের বিশাল মূর্তি জরাসন্ধকে পেড়ে ফেলে ঠ্যাং ফাঁক করে চিরে ফেলে বধ করেছে, এ দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল সে। জোচ্চোরটা তার ভাবসাব দেখে ধরে নিয়ে গিয়ে চা সিগারেট খাওয়ায়। দু—চার কথার পর নিশিকান্তর বিয়ের ইচ্ছেটা জানতে পেরে বলে— পুরুষমানুষের আবার বিয়ের ভাবনা, চাকর—বাকর মুনিশ—মুটে ভিখিরি যাই হও বউ ঠিক জোটে।

ভীম পুজোর মণ্ডপ থেকে পুরোপাক্কা তিন ক্রোশটাক হাঁটিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিল মেয়ে দেখাবে বলে। আর ততক্ষণে নিশিকান্তর চুরি করে জমানো পয়সা ফাঁক করেছিল বিস্তর। বিয়ের আশায় নিশিকান্ত 'না' করেনি। লোকটা ফুলুরির দোকানে দাঁড়িয়ে যায়। সিগারেট কেনে, দু—চারটে বাজারহাট সারে, নিশিকান্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে হয়রান। তার ওপর ধার বলে পয়সা নিয়ে—নিয়ে নিশিকান্তের ট্যাঁক ফাঁক করেছিল লোকটা। একটা অচিন গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে একটা কোটাবাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বলল— এই হচ্ছে আমার বাড়ি। নিজের বাড়ি বলে মনে করে নাও। যাও ওই বাইরের ঘরে গিয়ে বোসো, আমি আট্টু বাজার ঘুরে সেরটাক মাংস নিয়ে আসি, মস্ত একটা খাসি কেটেছে শুনলাম। খাসির তেলের বড়া খাও তো?

খুব খায় নিশিকান্ত। তাই ঘাড় নেড়েছিল। তখন বেশ দুপুর হয়ে গেছে। লোকটা বলে— আজ এবেলা থেকেই যেতে হবে তোমাকে, ওবেলা মেয়ে দেখিয়ে দেব, তারপর পাকা কথা বলে যেও।

নিশিকান্ত খুব রাজি। লোকটা চলে যেতে সে দিব্যি কোঠাবাড়ির বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। চেয়ার—টেয়ার পাতা ভালো বন্দোবস্ত। বসে থাকতে কিছু বাদে সেখানে এক খিটকেলে বুড়ো এসে হাজির। কী চাই, কাকে

চাই প্রশ্নে বিরক্ত করে তুলল। খ্যাঁচাকল আর বলে কাকে। জোচ্চোরটার নামও মনে রাখেনি নিশিকান্ত, কেবল বলে— এ বাড়ির কর্তাই আমাকে বসতে বলে গেছে গো! বুড়োটা খ্যাঁকশিয়ালের মতো হুয়া—হুয়া শব্দ করে বলে— বাড়ির কর্তা তো আমি, নিত্যহরি গোঁসাই। নিশিকান্ত তখন গম্ভীর হয়ে বলে— তাহলে তোমার ছেলেই হবে, আমাকে বসিয়ে রেখে বাজারে গেল মাংস আনতে, খাসির তেলের বড়াও খাওয়াবে বলেছে দুপুরে। বুড়ো তখন তেড়ে মারতে আসে— বৈষ্ণবের বাড়িতে খাসির মাংস! বেরোও, বেরিয়ে যাও।

কোথায় একটা ধন্ধ থেকে গিয়েছিল, তাই সবটা না বুঝেই বেরিয়ে এসেছিল নিশিকান্ত। কোঠাবাড়ির বারান্দায় ছাতাখানা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। কার ছাতা, কোথা থেকে এসেছে, এতসব জানার দরকার মনে হয়নি তার। হাতটানের স্বভাবের দরুন অভ্যাসমতোই নিশিকান্ত ছাতা বগলে করে বেরিয়ে এসেছিল।

জগৎসংসারে এই ছাতাখানার বাবুগিরি ছাড়া তার আর বেশি কিছু নেই। যক্ষীর মতো সে ছাতা আগলে থাকে। রোদে জলে খোলবার জন্য নয়, কেবলমাত্র বাবুগিরিরই জন্যই বয়ে বেড়ায়। ছাতার ইজ্জতই আলাদা।

—শুনতে পাই, তোমার ছাতার সঙ্গে নাকি তোমার কথাবার্তা হয় নিশি! মহেন্দ্র একখানা পায়জামার পা টানা সেলাই করতে করতে বলে।

নিশিকান্ত লজ্জা পেয়ে যায়। মুখে বলে— দূর, বিপিনদার যতো বানানো কথা।

—না গো, বানানো হবে কেন। বিপিন নিজে কানে শুনেছে, নিশুতরাতে উঠে বসে তুমি নাকি ছাতাকে তোমার দুঃখের কথা বলো, আর নাকি ছাতাও তোমার কথার সব জবাব—টবাব দেয়! ছাতার গলার স্বর নাকি একটু খোনা—খোনা, কিন্তু কথা ভারি পরিষ্কার!

গুপে ছুঁচ হাতে চেপে কলারটা পাট করতে করতে বলে— হ্যাঁগো, নিশিদা, তোমার ছাতাটা মেয়ে না ছেলে।

—আমি ওসব জানি না বাবু। তোমরা বড়ো দিক করো। জিনিসটা দিয়ে দাও চলে যাই।

—কথাটা চেপে যাচ্ছ নিশিদা, কিন্তু সেই পলতাবেড়ে থেকে বাগনান তক সবাই জানে যে তোমার ছাতাটা মেয়েছেলে।

—যাঃ।

—মাইরি। গুহ্য কথা আমাদের না হয় না বললে, কিন্তু ভাব ভালোবাসার কথা হচ্ছে আতর এসেন্সের মতো, চেপে রাখা যায় না। ছড়াবেই।

মহেন্দ্র পায়জামার পাখানা সরিয়ে রেখে আর একখানা পায়ের পট্টি মারতে লাগে, বলে— কথা আরও আছে। শুনি ওই ছাতাখানার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।

—যদি হয় তো নেমন্তন্নটা কোরো বাপু। বলে গুপে।

নিশিকান্ত তেতে উঠে বলে— পেছুতে লাগবে তো চললাম বলছি। গিয়ে বিপিনদাকেই পাঠিয়ে দেবখন।

মহেন্দ্র গুপেকে একটা ধমক দেয়— তোর যত ইয়ার্কি কথা। বসো নিশি, রাগ করো না।

নিশিকান্ত বসে। দেরি হচ্ছে। একটা হাই তোলে সে। মহেন্দ্রর কলখানা দেখতে তার বড়ো ভালো লাগে। কলকবজা এক আশ্চর্য জিনিস। কোথাও কিছু না, পায়ের নীচে একখানা পাটা নড়ছে আর ওপর খাপে ছুঁচখানা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কপাকপ নেমে এসে সেলাই ফেলে যাচ্ছে।

বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা। কলখান যতবার দেখে ততবারই তার ভিতর একটা কী যেন মনে পড়ি—পড়ি করে। পড়ে না অবিশ্যি। ওটাই তো তার রোগ। বড়ো বিস্মরণ। তার মনখানা বাদলা দিনের মতো, টর্চ বাতির আলোর মতো। কতকটা দেখা যায়, বাদবাকি সব বিস্মরণের বাদলায়, কালিঢালা অন্ধকারে ঢাকা।

বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি এসে গিয়েছিল তার। গুপে ডেকে তোলে তাকে। চুয়ার বোতলটা হাতে দিয়ে বলে— দিনক্ষণ দেখে বিয়েটা সেরে ফ্যালো বাপু। আইবুড়ো মেয়েছেলে নিয়ে রাত বিরোতে বসে থাকো, এ

ভালো কথা নয়। ছাতারও তো সমাজ আছে।

বোতল নিয়ে নিশিকান্ত উঠে পড়ে। দরজার কোণে ছাতাটার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেখে, নেই।

—ই কী! নিশিকান্ত বলে ওঠে।

মহেন্দ্র গম্ভীর মুখ তুলে বলে— কী হল!

—ছাতাখানা!

—নেই?

—না। তোমরা লুকিয়েছ।

—আমরা! গুপে হাঁ করে চেয়ে থাকে বলে— পরের মেয়েছেলে লুকোব আমাদের তেমন ভাব নাকি!

—ছাতাটা কী হল রে গুপে? মহেন্দ্র নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করে।

—হবে আর কী! একটু আগে কতগুলো লোধা মেয়েছেলে বৃষ্টির মধ্যে হুড়মুড়িয়ে এসে উঠেছিল। এ ঠিক তাদের কাজ। নিশিদা ঢুলছিল তখন খেয়াল করেনি।

নিশিকান্ত ক্ষেপে গিয়ে বলে— দিয়ে দাও বলছি।

গুপে বলে— তোমার ছাতারও স্বভাবের বলিহারি। কোন আক্কেলে তোমার মতো ভালো মানুষটাকে ছেড়ে না বলে কয়ে চলে গেল।

ভারি রেগে যায় নিশিকান্ত। ডাক হাঁক করে গাল পাড়ে— তোমরা দুটো চোরের ব্যাটা, গর্ভস্রাব...

গুপে গম্ভীর মুখে বলে— তা মুখ খারাপ করলে কী হবে! লোকে যে বলে তুমি ছাতা চোর। আমি অতশত জানি না বটে, কিন্তু শুনেছি ওই ছাতা মেয়েছেলেটাকে তুমি মায়াচরের কোনো গেরস্তর ঘর থেকে ভাগিয়ে এনেছ!

নিশিকান্তর মাথার মধ্যেটা ভারি বেসামাল হয়ে যায়, বলে, কোন রাঁড়ির ব্যাটা বলে, কোন...ইত্যাদি।

মহেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলে— মুখ খারাপ করবে না বলছি। দিয়ে দে গুপে ওর ছাতাখানা। খিস্তির চোটে জল গরম করে দিল।

রেগে গেলে নিশিকান্ত এরকম। হাট মাঠ ঘুরে যা গাল শোনে তার কিছু মনে রাখে সে। কারণ, ওই হচ্ছে তার অস্ত্রশস্ত্র। লোকে তাকে দিক করলে তাকেও তো কিছু করতে হয় তখন!

গুপে উঠে চৌকির তলা থেকে ছাতা বের করে দিল। তারপর আচমকা পিছনে একটা লাথি দিয়ে বলল— বেরো শালা!

লাথিটা খেয়ে দরজাটা ধরে সামলে নেয় নিশিকান্ত।

—এই—ই—ই....বলে মহেন্দ্র চেঁচিয়ে ওঠে— মারিস না। আর একটু হলে বোতলটা হাত থেকে পড়ে ভাঙত।

—শালার বড়ো মুখ। গুপে বলে রেগে।

নিশিকান্ত তখন গুপের মা—বাবা তুলে নোংরা খিস্তি দিয়ে বেরিয়ে আসে। গুপে অবশ্য ছাড়ে না। দৌড়ে এসে ঠাঁই করে মাথায় একটা কী দিয়ে মারে। ঝিমঝিম করে ওঠে নিশিকান্তর মাথা। সে বোতলটা অবশ্য চেপে রাখে বুকে। ভাঙলে বউমণি আর বিপিন তো আর গুপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসবে না। মেরে তারই গা—গতর ব্যথা করে দেবে। নিশিকান্ত রাগে অন্ধকার হয়ে বৃষ্টির মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে চেঁচায়— গু খা, গু খা রাঁড়ির ছেলে...

গুপে আবার বেরিয়ে আসে। দূর থেকে একটা মাটির ভাঁড়ই বুঝি ছুড়ে মারে তাকে।

নিশিকান্তর বুকে এসে লাগে সেটা। নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাল দিতেই থাকে— আমার পা খা, বাঁ—হাত খা, হেগো খা...

অনেকক্ষণ ধরে বকে—বকে নিশিকান্তর মাথা ফরসা হয়ে গেল। আসলে কাকে বকছে সেটাই ভুলে গেল সে। কী হয়েছিল তাও মনে পড়ে না আর। তখন নিশিকান্ত ভারি অবাক হয়ে চুপ করে যায়। কার ওপর

রেগে গিয়েছিল, কেন গাল দিচ্ছিল কিছুই তেমন মনে পড়ে না।

এদিকে বৃষ্টি থেমে চাঁদ উঠে গেছে কখন। দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে। অবাক নিশিকান্তর ভিতরে একটা সুতোর টান লাগে। লাটাই বউমণির হাতে। নিশিকান্ত ঘুড়ি তাই চমকে ওঠে, লাট খায়। বউমণি নিশ্চয়ই ডাকছে— নিশি—ই!

খাড়ুবেড়ের মোড়ে যখন নামল নিশিকান্ত তখন পৃথিবীটা বড্ড অদ্ভুত হয়ে আছে। কী এক ভূতুড়ে চাঁদ উঠেছে আজ আকাশে। চারধারে মেঘের কালি তার মাঝখানে ফ্যাকাসে একটা ডুম থেকে বারবার মেঘ ডাকছে পাথর ঘষা শব্দে। তিনদিন বাদে বৃষ্টি এই ধরল। জাড়ের মাস নয়, তবু কেমন শীত ঝরিয়ে দিচ্ছে আকাশঠাকুর। জলে জলময় পৃথিবীটা সাদাটে হয়ে পড়ে আছে অলক্ষুণে জোছনায়।

যেমন ভয় ভূতপ্রেত বেহ্মদৈত্যকে, তেমনি ভয় বিপিনবিহারী আর বউমণিকে। খালধারে পিছল মাটি ধরে প্রাণপণে হাঁটে নিশিকান্ত। মাথায় একটা টাটানো ব্যথা! মাজায় ব্যথা। কখন কোথায় লাগল ঠিক খেয়াল করতে পারে না সে।

তিনদিন ধরে লক্ষ হাত দিয়ে মাটিকে মেখেছে আকাশ। মাখাজোখা হয়ে তাই ভূতুড়ে জোছনায় সিটোনো পৃথিবীটা পড়ে আছে। মেখেছিল বিপিনবিহারী ও বউমণিকে। বর্ষা বাদলায় কাজকর্মে বড়ো সংক্ষেপ। হাঁড়িকুড়ি ছাড়া আর কিছু সকড়ি করেনি বউমণি। কলাপাতা কেটে হড়হড়ে খিচুড়ি ঢেলে খাওয়া। ঘাটলার কাজ ছিল না, কাচাকুচি ছিল না, রোদে দেওয়া জিনিস টানটানি করা ছিল না। ঘরমোছা ছিল না। বউমণি তেপহর বিছানায় পড়ে থাকত। বিপিন মাঠে একটু চাষের কাজ দেখে এসেই দরজায় হুড়কো তুলে দিত। ভিতরে কী হত তা কি আর বোঝে না নিশিকান্ত। সেও ওই মাখামাখিরই ব্যাপার। বিকেলে আমতেল দিয়ে মাখা মুড়ি কাঁচালঙ্কা কামড়ে খেয়ে বিপিন যেত বাজানিদের বাড়িতে, ধর্মকথা শুনতে।

কিন্তু ধর্মকথার আগেও কথা থাকে পরেও কথা থাকে। বৃষ্টি বাদলায় সেইসব কথাই কলঙ্কের কথার মতো ছড়িয়ে গেল। চারধার ফিসফাস গুজগুজ। নিশিকান্ত একা একা হাসে।

খালধারে একটা আগুন জ্বলছে বিশাল। আগুনের ধারে কালো—কালো লোকজন। বাবলাগাছের আড়ালে বড়ো বড়ো সব ছায়া নড়াচড়া করছে! নিশিকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে যায়। দূর থেকে কাণ্ডটা দেখে আর তখন একটা পোড়াঘিয়ের বদ গন্ধ উড়ে আসে। আর আসে চামড়া পোড়া চিমসে মতো গন্ধ।

নিশিকান্ত মাথা নেড়ে আবার হাঁটে। নেতাইয়ের ঠাকুমাটা মরল বোধহয়। জোর কদমে হেঁটে চলে আসে আগুনটার কাছে। বাঁধা শ্মশান বলতে কিছু নেই এখানে, যে যেখানে পারে মড়া পোড়ায়। বাবলাতলায় একটু উঁচু জমি পেয়ে ওরা ওখানেই কাজ সেরে নিচ্ছে।

নেতাই মাল খেয়ে চেল্লাচ্ছিল। স্যাঙাৎদের মধ্যে কে যেন চিতা থেকে চ্যালাকাঠ টেনে বিড়ি ধরিয়েছে, তাতে অপমান হয়েছে নেতাইয়ের। চেঁচিয়ে বলে— কোনো শালা চিতা থেকে বিড়ি ধরাবে না বলে দিচ্ছি। আমার ঠাকুরমার চিতা শালা, কারও বাপের নয়— বলে দিচ্ছি।

স্যাঙাৎদের একজন সান্ত্বনা দিয়ে বলে— বিড়ি নয় রে, সিগারেট...

—কেন ধরাবে? ওর বাপের চিতা শা...?

বলতে বলতে নেতাই বাবলাতলা থেকে উঠে খালের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে। আর বলে— আমার ঠাকুমার শালা পুণ্যি দেখ, চিতা নিভে যাবে ভয়ে বৃষ্টি থেমে গেছে। দেখেছিস কখনো অমনধারা শালা? বিড়ি ধরাচ্ছিস চিতা থেকে। আমার ঠাকুমার সম্মান নেই?

স্যাঙাৎরা খি খি করে হাসছে।

নিশিকান্ত দেখে, নেতাইয়ের ঠাকুমার মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এখনও সেখানে আগুনটা পৌঁছায়নি। চোখের পাতায় চন্দন, তাতে তুলসিপাতা সাঁটা। পোড়ার সময়টায় মানুষের কেমন লাগে তা বড়ো জানতে ইচ্ছে করে নিশিকান্তর। দু—কদম এগিয়ে এসে সে ছাতা আর বোতল হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কেউ কিছু বলে না। সব ব্যাটা বোতল টেনে যাচ্ছে। বেসামাল।

আর হঠাৎ যেন কেউ দেখছে না দেখে, ফাঁক বুঝে নেতাইয়ের ঠাকুমা টক করে চোখ চাইল। নিশিকান্তর কিছু মনে থাকে না। বড়ো বিস্মরণ। কিন্তু নেতাইয়ের ঠাকুমা চোখ খুলে ভালোমানুষের মতো তার দিকে তাকাতেই নিশিকান্তর ঝড়াক করে মনে পড়ে গেল, বহুকাল আগে, পেটব্যথায় বুড়ি কাতরাচ্ছিল একা ঘরে। তখন নিশিকান্ত বাবলার কচিপাতা থেঁতো করে রস খাইয়ে সারিয়ে ছিল ব্যথা। সেই বাবলা গাছের তলায় নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে, আর চিতার আগুনের মধ্যে আধপোড়া নেতাইয়ের ঠাকুমা। চোখে চোখ পড়তেই যেন বলে ওঠে, কী বাবা মনে পড়ে?

মনে পড়ে? মনে পড়ে? বাদলা কেটে মনের মধ্যে একটা জোছনা যেন ভেসে ওঠে হঠাৎ। পড়ে বইকি! কত কী মনে পড়তে থাকে হঠাৎ। নিশিকান্ত টের পায় মনে পড়ার বেনো জল হঠাৎ বাঁধ ফাটিয়ে ধেয়ে আসে যে! নিশিকান্ত ছাতাটা সাপটে ধরে বোতল চেপে ধরে বুকে। একটা 'আঁক' চিৎকার পেড়ে আবার খালধারের রাস্তায় উঠে আসে।

কিন্তু তবু মনে পড়া কি ছাড়ে। আকাশ থেকে হঠাৎ টাপুর—টুপর খসে পড়ে অতীতের জল। পড়তেই থাকে। নেতাইয়ের স্যাঙাৎ দু—পা এগিয়ে এসে তাকে ধরে— কী বাবা বোতলে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা নিশি!

—ছেড়ে দাও। বলে নিশিকান্ত একটা ঝটকা মারে। আর ওই ঝটকাতেই টর্চ বাতির আলোর মতো তার বর্তমানটা ছিটকে যায়। বাদলা দিনে ছোটো পৃথিবীটা হঠাৎ যেন আদিগন্ত দেখা যায়। মনে পড়ে। মনে পড়ে।

তার নাম নিশিকান্ত নয়। সে নয় এদেশের লোক। নীলকুঠির ধারে একটা ছোটো কুঠিবাড়ি ছিল তাদের। মা ছিল মনোরমা, বাবা চন্দ্রনাথ। সুখের ছিল সংসার। জায়গাটা কী যেন! কী যেন! মনে পড়ে, বেঁটে লিচু গাছের বন ছিল সেখানে, থোকা থোকা ফল ধরত, পাকা সড়কের ওপর ছিল ইস্কুল বাড়ি, তার ঘণ্টা বাজত ঢং ঢং, নিশিকান্তকে ডাকত।...মনে পড়ে, মনে পড়ে...

কিন্তু কী যে যন্ত্রণার ঝড় ওঠে বুকের মধ্যে! হাহাকার এক বাতাস বয়ে যায়। কী হয়েছিল তারপর? অতীতের বৃষ্টি মাতালের মতো টলে টলে পড়ে, দোল খায়, মারদাঙ্গা আগুন কী সব হয়েছিল, দাড়িওলা, কালি—মাখা মশাল হাতে কিছু লোক... তারা পায়খানার তলায় নোংরায় লুকিয়ে কাঁপছে! মনে পড়ে...রেল লাইন ইস্টিশান...লঙ্গরখানা...

নিশিকান্ত চিৎকার করে পিছলে পড়ে যায়। রাস্তা বেভুল। কোথায় যাচ্ছে সে? কার কাছে? জোছনায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে চারধারে চায় নিশিকান্ত। এ সে কোথায়?

মাঠের মাঝখানে ছাতা আর বোতল হাতে সে দাঁড়িয়ে আকাশ—জোড়া পৃথিবীটা দেখে। কী প্রকাণ্ড! সে একা! হারিয়ে গেছে!

ভূতুড়ে জোছনায় হাহাকার চারদিকে। তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, কেউ নেই।

—আঁ—আঁ—আঁ বাক্যহারা চিৎকার দিতে থাকে নিশিকান্ত। চোখে জল আসে। সে উপুড় হয়ে পড়ে মাঠের কাদায় জলে। কোমর সমান ডুবে যায়। মাথা চেপে ধরে বিড়বিড় করে বলতে থাকে— ভুলিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও...

ঠিক সময়ে একটা সুতো কে যে গুটিয়ে নেয় লাটাইয়ে, হাত্তা মারে। টান লাগে। ঘুড়ি টাল খায়। বউমণি বুঝি ডাকে— নিশি—ই...

—যাই। বলে কাদাজল থেকে ওঠে নিশিকান্ত। ছাতাটা আর বোতলটা চেপে ধরে বুকে। পিরানের হাতায় চোখ মুছে নেয়। ঘুরির সুতো গুটিয়ে নিচ্ছে বউমণি। বড়ো টান। চাকর বলো চাকর, জন বলো জন, টান একটা আছেই।

বেশ আছি বাবা, বেশ আছি। বিড়বিড় করে বলে নিশিকান্ত। পৃথিবীটা আবার বাদলা দিনের মতো ছোটো হয়ে এসেছে। টর্চ বাতির আলোর চৌহদ্দিতে বাঁধা জীবন। আগুপিছু আর কিছুই দেখা যায় না। এই বেশ আছে নিশিকান্ত। এবার নিশ্চিন্তে সে হাঁটে।

হলে হয়

আজ অবধি গায়ে একটা পিরান উঠল না হাঁদুর। বগলকাটা গেঞ্জি, তেমন তেজালো শীত পড়লে এক্রাম আলির দেওয়া খদ্দরের চাদরখানা— এই অবধি হাঁদুর দৌড়। দেমাকের সঙ্গে বোতাম এঁটে একখানা জামা গায়ে ঘুরে বেড়াতে পারলে বেশ হত।

নরেনটা ভারি ফচকে। বলেছিল, বিয়ে করার সময় পরিস, তখন শ্বশুরই দেবে নিজের গরজে।

তা বউ একটা হলে হত হাঁদুর। ঘোমটার ভিতর থেকে টালুক টুলুক চেয়ে চেয়ে দেখবে তাকে, ফিচিক ফিচিক হাসবে, সে ভারি মজা। হ্যাঁ, তা বউ একটা হলে হয় তার।

পিরান বা বউ বলেও কথা নয়। ওরকম আরও অনেক কিছুর কথাই মনে হয় হাঁদুর। এই যেমন পায়ে একজোড়া চটি হলে বেশ হয়। তারপর এই বাদলার দিনে একটা ছাতা হলে হয়। জল খাওয়ার একখানা পেতলের ঘটি হলে হয়।

ব্রজ তার সেলাইমেশিনে পায়জামাটা খড়খড় করে টেনে যাচ্ছিল আর হাঁ করে দেখছিল হাঁদু। ইব্বাস, কী আজব কলই যে বানিয়েছে সাহেবরা। পায়ে একটা পাটাতন নাড়াও আর হাতে সেলাই টেনে যাও। ছুঁচখানা যেন একেবারে মুষলধারে পড়ছে। একাই একশোখানা হয়ে। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হাঁদু মুখের ঝোল টানল। শুধু মেশিন বলেও কথা নয়, ব্রজর মতো কারিগরই বা কটা আছে! লুঙ্গি পাজামা পিরান ব্লাউজ ফটাফট কাঁচিতে কেটে মেশিনে জুড়ে ফিট করে দিচ্ছে। হাতে জাদু, পায়ে জাদু।

সেলাই থামিয়ে ব্রজ একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল। হাঁদুর দিকে চেয়ে বলল, হবে নাকি একটা?

হাঁদু যে খায় না তা নয়। মাগনা পেলে সে সবই খায়। বিড়ি কিন্তু খারাপ জিনিসও নয়। খেলে শরীরটা বেশ চনমনে হয়। তবে কিনা ব্রজর মতো ওস্তাদ লোকের সামনে এই যে বসে আছে এটুকুই ঢের, এর ওপর আবার বিড়ি খাওয়াটা বড্ড আস্পদ্দা হয়ে যাবে। তাই হাঁদু লজ্জার হাসি হেসে বলল, না, না থাক।

ব্রজও চাপাচাপি করল না। বিড়ির আজকাল দাম বেড়েছে। পায়জামাটা ভাঁজ করে সরিয়ে রাখল সে। পিছনের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মেশিনে হাঁটু ঠেকিয়ে আরাম করে বসল।

দর্জিঘর বলতে তেমন কিছু বাহারি ব্যাপার নয়। দুটো দিক হাঁ হাঁ করছে খোলা আর দু—দিকে বাঁশের বেড়া, মাথায় টিন। চালাঘরই। তলায় কাঠের পাটাতন। তাও তেমন মজবুত নয়। পাটাতনের নীচেই পলতাবেড়ের খাল। দু—এক জায়গায় পাটাতন ফাঁক হয়ে আছে, তলায় জল দেখা যাচ্ছে। পচা জলের একটা আঁশটে গন্ধও সব সময়ে ঘুলিয়ে উঠছে বাতাসে। সামনে পলতাবেড়ের বাজার। বাজার বলতে তেমন জমজমাট কিছু নয়। মুঠোভর জায়গায় দশ বারোটা টিনের চালা। কিছু গেরস্ত খোলা জায়গায় শাকপাতা নিয়ে হা—পিত্যেশ করে বসে আছে। সকালের দিকে কিছু লোকজন হয়েছিল। এখন ফাঁকা।

ব্রজ ধীরেসুস্থে বিড়িটা শেষ করে পাজামাটা একটা পুরোনো খবরের কাগজে মুড়ে হাঁদুর হাতে দিয়ে বলল, এক্রামদাকে বলিস একবার আসতে।

হাঁদু মাথা নেড়ে উঠে পড়ল।

নতুন পাজামার গন্ধটা যে কী সুন্দর সে যে না গন্ধটা নাক দিয়ে টেনেছে সে বুঝতে পারবে না। নতুন জিনিসের ফাঁটই আলাদা। হাঁদুর কপালে নতুন বড়ো জোটে না। এর ওর তার ছেঁড়া ন্যাতা ফেলে দেওয়া জিনিসই বরাবর পায় সে। যে ছাপা লুঙ্গিখানা সে এখন পরে আছে এটা অবধি ধীরেন সাঁপুইয়ের ছাড়া জিনিস। বেঘোরে ধীরেন মোলো, আর তার বউ জিনিসপত্র কিছু বিলি করে দিল। হাঁদু পেল লুঙ্গিখানা।

কথা হল, ধীরেন যখন চরণগঙ্গার হাটের কাছে খুন হয় তখন এই লুঙ্গিখানা তার পরনে ছিল। হাঁদুর চোখের সামনেই হল কিনা কাণ্ডখানা। ধীরেনের ঘর হাট থেকে বেশি দূরেও নয়। মাইলটাক হবে। গোটা দশ বারো কুমড়ো বস্তায় ভরে হাঁদুর মাথায় চাপিয়ে হাটে গিয়েছিল ধীরেন। কপালটা ভালোই। চরণগঙ্গার হাটে সেই কুমড়ো পটাপট বিকিয়ে গেল। যেন কুমড়োর জন্য সেদিন হামলে পড়েছিল লোকে। ধীরেনের ট্যাঁকে পয়সা এসে গেল দেখ—না—দেখ। তাই দিয়ে ধীরেন কিছু কেনাকাটা করল। বস্তাটা বেশ ভারীই ঠেকছিল হাঁদুর ফেরার সময়।

হাট ছেড়ে পোয়াটাক পথ আসতেই ধানখেতের মধ্যে পড়ল তারা। বেশ ফলন হয়েছে। বর্ষাটা ভালোই গেছে এবার। মাঠ একেবারে ছয়লাপ। লক্ষ্মী ঢেউ খেলে যাচ্ছেন। মনের আনন্দে হাঁদুর গান গাইতে ইচ্ছে যাচ্ছিল। কিন্তু ধীরেন সাঁপুই গোমড়ামুখো লোক, দাপ খাপের লোকও বটে। তাই সাহস পাচ্ছিল না।

কালীতলার কাছ বরাবর মন্দিরের দিকটায় কিছু ঝুব্বুস চেহারার গাছের জড়ামড়ি। জায়গাটা বেশ আঁধারমতো। হঠাৎ সেখান থেকে চারটে লোক বেরিয়ে এল। দু—জনের হাতে দু—খানা হেঁসো। একজনের হাতে বাঁকা হাতলের একখানা লাঠি। চার নম্বর লোকটার হাতে অস্ত্র ছিল না বটে, কিন্তু লোকটা নিজেই এক পেল্লায় বিভীষণ। ভয়ের কথা হল, চারজনকেই হাঁদু চেনে। হেলে, পটল, গণেশ আর গদাধর। গদাধর আবার মস্ত হোমিওপ্যাথ ডাক্তারও। বেশ নাম ডাক। ধীরেনের জ্ঞাতি।

লোক চারটেকে দেখেই ধীরেন সাঁপুই হঠাৎ একটা গোঁত খেয়ে দৌড়তে শুরু করল, লুঙ্গি পরার অসুবিধে এইটেই, দৌড়োনো যায় না। তার ওপর আলের পথ। ধীরেনের শরীরটাও থলথলে গণেশমার্কা।

চারটে লোক তাড়াহুড়ো করল না। তবে খেতেয় নেমে আড়াআড়ি একটু চোটে হেঁটে ধীরেনের একেবারে মুখোমুখি এসে গেল।

তারপর যা কাণ্ডখানা হল তা আর বলার নয়। বাঁকা লাঠি হাতে লোকটা ধীরেনের দু—পায়ের ফাঁকে লাঠিটা ঢুকিয়ে দিতেই দড়াম করে পড়ল ধীরেন। দুটো হেঁসো পড়ন্ত রোদে একটু ঝলক তুলে নেমে এল ধীরেনের ওপর। পেট আর গলা ফাঁক হয়ে গেল চোখের পলকে। একটু দূরে পাথর হয়ে গিয়ে হাঁদু শুধু দেখল, ধানখেতের মধ্যে একটা জায়গায় বড়ো ছটফট করছে গাছগুলো, বড্ড ছটফট করছে।

তাকে দেখেই গদাধরই একটা হাঁক মারল, কে রে ওটা?

পটল বলল, ওটা ধীরেনের স্যাঙাৎ। সাক্ষী রাখার দরকার কী?

বস্তাটা গড়িয়ে গেল ঘাড় থেকে। আর হাঁদু টের পেল যে, সে ছুটছে। ধানখেতে নেমে লাফিয়ে লাফিয়ে হরিণের মতো ছুটছে সে। বাঁই বাঁই শব্দ উঠেছিল বাতাসে। জীবনে ওরকম আর কখনো ছোটেনি।

এক দমে একেবারে ধীরেনের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল সে। মুখে বাক্যি সরছে না তখন, বুকে হাতির পা পড়ছে, গলা বুক শুকিয়ে কাঠ।

সেই থেকে ঘটনাটার সাক্ষী হয়ে আছে হাঁদু। তবে পুলিশ এসে যখন তাকে মেলা কথা জিজ্ঞেস করেছিল তখন সে বিশেষ ভেঙে বলেনি। চারজন যে কে তাও চেপে গেছে। তবে গদাধরের সঙ্গে জোতজমি নিয়ে ধীরেনের কাজিয়া বহুদিনের পুরোনো। সবাই জানে।

সেই ঘটনার স্মৃতি এই লুঙ্গি। মাদ্রাজি তাঁতের খয়েরি রংয়ের জিনিসটা বেশ মজবুত। ধীরেনের গলা আর পেট থেকে চোঁয়ানো রক্তে একেবারে অন্য রং ধরেছিল। ফেলে দিতে পারত ধীরেনের বউ। না ফেলে কেচেকুচে পরিষ্কার করে একদিন তার হাতে দিয়ে বলল, তুই—ই পরিস।

না চাইলে কেউ বড়ো একটা দেয় না। চাইলেই যে দেয় এমন নয়। তবু চাইলে কখনো সখনো জোটে, না চাইলে একদম নয়। এই লুঙ্গিটা হাঁদু চেয়ে নেয়নি। এমনিই পেয়েছে। হাঁদু চাইতে পারে না কখনো। বড়ো লজ্জা করে। তাই পায়ও সেই খুব কম। এই ধীরেন সাঁপুইয়ের বউ। এও তেমন দেনেওয়ালা নয়। দিনরাত খাটাত তবু পান্তার সঙ্গে তেঁতুলটা দিতে হাত কুঁকড়ে যেত মাগির।

ধীরেন মরার পর বকেয়া কয়েকটা টাকাও ঠেকাল না ধীরেনের বউ। এই লুঙ্গিখানা দিয়েই একরকম ঘাড়ধাক্কা দিলে। একখানা আধুলি ঠেকিয়েছিল শুধু রাহাখরচ বাবদ। নাকি কান্না কেঁদে বলল, আমার তো সর্বস্ব চলে গেল, অনাথা বেধবা, আমারই কেমন করে চলবে তোরা বল। ছ—টা বাচ্চচা সারাদিন খেতে চায়। এইসব ধানাই পানাই।

ধীরেনও খচ্চচর ছিল সন্দেহ নেই। তবে পাওনাগণ্ডা দিয়ে ফেলত। বউটা ধীরেনের ওপর এক কাঠি। যে ক—টা কাজের লোক ছিল প্রায় সবাইকেই ধীরেনের পুরোনো ধুতি, জামা, চটি এইসব এক দফা করে দিয়ে তাড়াল।

হাঁদুর মুশকিল হল ভালো জিনিস পেয়েও তার লাভ নেই। তার একখানা ঘড়েল বাপ আর দুটো গুন্ডা দাদা আছে। ভালো জিনিস দেখলেই তারা কেড়ে নেয়। তার মেজদা ভাদু এই লুঙ্গিখানার ওপরেও নজর দিয়েছিল। ধীরেন এই লুঙ্গি পরে খুন হয়েছে জেনে আর নেয়নি।

এক্রাম আলির বাড়িতে এখন গোরু রাখে হাঁদু। তাতে কিছু সুবিধে হয়নি। বউ মরার পর সে একরকম ফকিরগোছের হয়ে গেছে। ছেলেপুলেদের দিয়ে থুয়ে এখন একরকম ঝাড়া হাত—পা। গোরুও প্রায় সবই বেচে দিয়েছে। একটা বকনা বাছুর মাত্র আছে। সেটাও শোনা যাচ্ছে বেচে দেবে। তারপর হজ করতে মক্কা যাবে। হাঁদুকে আর বেশি দিন দরকার হবে না তার।

শীতটা যে এবার জোর পড়বে তা এখন থেকেই টের পায় হাঁদু। জলঝড়টাও বেশ গেল এ—বছর। কার্তিকের মাঝামাঝি থেকেই উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে টেনে। আর এই শীতেই যত কষ্ট। রোদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। সাঁঝটি যেই লাগল অমনি শীতবুড়ি এসে ধরল জাপটে। তার তো ঘরটর জোটে না। বড়োজোর এক্রামের দাওয়া, না হয় গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপের চাতাল।

তার নিজের গাঁ মাইল সাতেক উত্তরে। মোট তিনখানা ভাঙা ঘর। তার দুটোতে দুই দাদা বউ সাপটে পড়ে থাকে। আর একখানায় চিল্লামিল্লি করে নিজেদের গুঁজে রাখে বুড়ো বাপ, তার দ্বিতীয় বিয়ের বউ আর দু—পক্ষের কিছু অপোগণ্ড। ভারি হাড়হাভাতে সব। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ল ধান্ধায়। কেউ গিয়ে খালে গামছা দিয়ে মাছ ধরার ফিকির করছে। কোনোটা গিয়ে পুকুরের গেঁড়িগুগলি তুলছে। একজন গেল শাকপাতা আনতে। কেউ বা গেল কার ঘটিটা বাটিটা হাতিয়ে আনা যায় তাই দেখতে। হাঁদুর দুই দাদাই মহা ফেরেব্বাজ। জনমজুর খাটে, চাষে খাটে, মাছ ধরে, নৌকো বায়, হাটে মহাজনের শাগরেদি করে। যখন যেমন। তবে তারা লোক ভালো নয়। পাঁচটা টাকার গন্ধ পেলে খুন খারাপিও করতে পারে। তার ওপর দু—জনেরই নেশাভাঙের ব্যাপার আছে। হাঁদুর বাপও তাই ছিল। এখন বুড়ো বয়সে বসে বসে ছেলেদের মুণ্ডুপাত করে।

হাঁদু আড়াআড়ি একটা ধানজমি পার হচ্ছিল। দূর থেকে রফিকভাই ডাকল, ওরে হাঁদু!

রফিকভাই এক্রাম আলির বড়ো ছেলে। গাঁয়ের মাতব্বর গোছের লোক। হাতে ছাতা, পরনে ঢোলা পায়জামা আর গায়ে একখানা মোটা কাপড়ে পাঞ্জাবি। মদনার দোকানের সামনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছে। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল।

হাঁদু রাস্তার বাঁধ বেয়ে উঠে এল ওপরে।

কী বলছ গো?

তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। বাড়ির দিকে হাঁটতে থাক, আমি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি।

যেমন কথা তেমনি কাজ। পথে উঠলে একটু ঘোরা পড়ে যায়। মাঠ দিয়ে হাঁটলে কোনাকুনি একটু তাড়াতাড়ি হত। হাঁটতে হাঁটতে হাঁদু সাইকেলের কথা ভাবছিল। তার নেই। কিন্তু একখানা হলে হত। দুটো চাকার ওপর বনবন করে কী দৌড়টাই লাগায় বাবা যন্ত্রটা! যত দেখে তত হাঁদু অবাক মানে। এসবই সাহেবদের কল, হাঁদু শুনেছে। রাঙামতো দেখতে এক আজব জীব তারা। যত আজব যন্ত্রপাতি তারাই বানায়। সেলাইয়ের মেশিন, আটাচাক্কি, সাইকেল।

সাইকেল হলে হাঁদু যা ফাঁটে ঘুরে বেড়াত তা আর বলার নয়! সাঁ করে ধেয়ে এসে গোবিন্দর চায়ের দোকানের সামনে ঘ্যাস করে থেমে বেঞ্চে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ত। গমগমে গলায় হাঁক মারত, গোবিন, চা দে। ওঃ, কী কাণ্ডটাই যে হত তা হলে!

দেখ—না—দেখ রফিকের সাইকেলটা এসে দাঁড়াল পাশে। হাঁদু পাশ—চোখে সাইকেলটা দেখছিল। আঃ, কী বাহারি জিনিসখানা! দু—খানা চাকা সুদর্শন চক্রের মতো ঘুরছে।

এই বুরবক, সেদিন কাদের দেখেছিলি বল তো! নাম কী?

হাঁদু অবাক হয়ে বলল, কাদের?

ধীরেনের খুনের সময় তুই তো কাছেই ছিলি।

হাঁদু মাথা চুলকে বলল, মনে নেই।

চারটে লোক ছিল তো?

হ্যাঁ চারটেই হবে।

তাদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারিসনি সত্যি? না কি ভয়ে মিছে কথা বলছিল?

চিনিনি।

রফিক একটু চাপা গলায় বলল, পুলিশের কাছে কিছু কবুল করেছিস?

না তো!

তবু পালা। এ জায়গা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যা! তোর খুব বিপদ।

হাঁদু আঁতকে উঠে বলল, কেন রফিকভাই?

তোর খোঁজ হচ্ছে।

কে খুঁজছে আমাকে?

ওই চার খুনের সাঙ্গোপাঙ্গরা। তুই একমাত্র সাক্ষী। তুই নিকেশ হলে ওদের আর পায় কে!

কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি।

বলিসনি, কিন্তু বলতে কতক্ষণ? পুলিশ কি এমনিতে চুপ করে আছে ভেবেছিস? খুনিদের টাকা খেয়ে ঝিম মেরে আছে মাত্র। কিন্তু ধীরেনের এক খুড়শ্বশুর উকিল, পলিটিক্স করে। খুব খাতির। ধীরেনের বউ গিয়ে তাকে ধরাকরা করায় সে এখন কলকাঠি নেড়েছে। পুলিশ এবার গা—ঝাড়া দিয়ে উঠবে। তোর পেট থেকে কথা টেনে বের করতে তাদের এক মিনিটও লাগবে না। খুনিরা এখন সেই ভয়টাই পাচ্ছে। তোর মুখ বন্ধ না করলেই নয়।

হাঁদু দাঁড়িয়ে গেল, তবে?

রফিক চারদিকটা একবার নজর করে নিয়ে বলল, আমাদের বাড়িতে পটল এসেছিল সকালে।

পটল? ও বাবা!

তাই বলছিলুম, পালা।

হাঁদু একবার ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখে নিল।

কোথা যাব রফিক ভাই?

চেনা জায়গায় গিয়ে হাজির হোসনি বোকার মতো। দূরে কোথাও গিয়ে ঘাপটি মেরে থাক।
হাঁদু পায়জামাটা রফিকের সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, এক্রাম চাচাকে দেবেন।
হাঁদু আর একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। কিন্তু কোন দিকে যাবে তা বুঝতে পারল না।
রফিক একটু গলা তুলে বলল, ওরে পয়সাটয়সা কিছু আছে?
হাঁদু মাথা নাড়ল। নেই।
রফিকের দিক থেকে একটা দু—টাকার লাল নোট উত্তুরে বাতাসে উড়ে এল। প্রজাপতির মতো ছোটাছুটি করল কিছুক্ষণ। হাঁদু ধরে ফেলল।

২

চকমকি যখন লোকটাকে লেবুবন থেকে বেরিয়ে তাদের ঘরে যেতে দেখেছিল তখনই বুঝতে পেরেছিল যে, তার বাপটা বাঁচবে না।
নামিনাথের জ্বরটা সারছিল না কিছুতেই। মাসেকের ওপর হয়ে গেল। বাড়ির লোক তাকে বাদের খাতায় ধরে রেখেছে। গাঁয়ের ডাক্তার চরণ ঘোষ খারাপ নয়। জ্বরটর ভালোই সারায়। চরণ ডাক্তার দেখেটেখে বলেছিল, পাথুরি হয়েছে মনে হয়। অস্ত্র করা দরকার। শহরে নিতে হবে।
নামিনাথ লোকটা কৃপণ। শহরে গিয়ে অস্ত্র করিয়ে ভালো হওয়া মানে রক্ত জল করা টাকায় এক মস্ত থাবা মারা। তার চেয়ে মরা ঢের ভালো। দু—দিন আগে আর পরে।
তবে নামিনাথ গরিবও বটে। কৃপণরা বেশিরভাগই টাকাওলা হয়, গরিবরা বড়ো একটা কৃপণ হয় না। নামিনাথ দুই—ই।
গা গঞ্জে মানুষের যা কিছু রোজগার তা বেশিরভাগই জমি থেকে। খেতি গেরস্থি থেকে। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগির পর নামিনাথ আর তার তিন ভাইয়ের ভাগে মাথাপিছু যা পড়ল তা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার মতো নয়। জমিজোত হাঁড়ি সবই ভাগ হয়ে যাওয়ায় একখানা ফলাও সংসার একেবারে চুপসে গেল। তবে নামিনাথের মতো অবস্থা আর দুই ভাইয়ের নয়। মেজোজন চরণগঙ্গার মাস্টার। ছোটোটি তেহাটার গুরুপদ দাসের ঘরজামাই হয়ে তার কারবার দেখছে। ভালোই আছে তারা। নামিনাথই শুধু আঁটি চুষছে আর দিনরাত কাগজে কলমে নানা হিসেবে কষে দেখছে, কীভাবে চালানো যায়। কত কমে আর কত ভালোভাবে। বিড়ি খেত, সেটা ছাড়ল। জুতো পরা ছাড়ল। খাওয়া কমাল।
নামিনাথের তিন ছেলে আর এক মেয়ে। চকমকি বড়ো, তার বয়স ষোলো সতেরো। তিন ছেলে ছোটো। পেট অনেকগুলোই বলতে হবে। তারা যে খুব ভালো খেত পরত তা নয়। তবে ভাগাভাগির আগে পর্যন্ত নামিনাথ তার ভাইদের জমির ফসল খানিকটা করে নিজের ভাগে হাতিয়ে নিতে পারত। ভাইরা বাইরে থাকে, অত নিকেশ নিতে হাজির থাকত না। কিন্তু ভাগের পর যে যার নিজের অংশ বেচে দিয়ে আপদ চুকিয়ে গেছে। ফলে অবস্থা ঝপাত করে পড়ে যাওয়ায় ছেলে—মেয়ে বউয়ের দুর্দশা এখন শতগুণ। ভাতের সঙ্গে শুধু সেদ্ধ। জামা একখানার বেশি দু—খানা কারওরই নেই। চুলে তেল জোটে না।
তার ওপর নামিনাথের অসুখটাও বেঁধে বসল এসময়ে।
সন্ধেবেলা চকমকি তিনটে হাঁসকে তাড়িয়ে এনে সবে মাচার তলায় ঢুকিয়েছে এমন সময় দেখল নামিনাথের ঘরের পিছনে আঁধার লেবুঝোপের ভিতর থেকে একটা কালো লম্বা লোক বেরিয়ে এসে ধীর পায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।
চকমকি দেরি করেনি। 'বাবা' বলে হাঁক দিয়েই দৌড়ে গেছে ঘরে। হ্যারিকেনটা নিবু নিবু করে জ্বালা। সেটা উসকে নেবার আগেই দেখল, লোকটা যেন একটা পাতলা ছায়ার মতো ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে নামিনাথের বিছানার পাশে।

বাতি উসকে চকমকি ভালো করে দেখল, কেউ নেই। চৌকির তলা, ঘরের আনাচ কানাচ সব জায়গায় দেখল। কেউ নেই। নামিনাথ একা বেঘোরে পড়ে আছে।

দুর্দৈব। দেখ এখন কী হয়। আমি একটা খবর দিতে এলুম।

কী খবর কাকা?

স্বামীনাথ আজ আসবে। আমার সঙ্গে চকবেড়েয় কাল দেখা। খবরটা দিতে বলল।

কাকা আসছে, সেটা কোনো ভরসার কথা নয় চকমকির কাছে। কাকা তাদের দু—চোখে দেখতে পারে না। নামিনাথের অসুখের খবর পেয়েই আসছে নাকি? কিন্তু চকমকি যতদূর জানে, বড়ো কাকা সেরকম মানুষ নয়। তেএঁটে পাজি লোক। কোনোকালে সম্পর্ক রাখেনি। সম্পত্তির বখরা নিতে এসে কী সাংঘাতিক হম্বিতম্বি! নামিনাথকে এই মারে কী সেই মারে। চকমকি ভালোই জানে যে, তার বাবা কিছু সাধুপুরুষ নয়। কিন্তু মানুষটা নিরীহ, মিনমিনে, দুর্বল। কৃপণদের প্রকৃতি দুর্বলই হয়ে থাকে। ভাইদের তর্জনে গর্জনে আরও মিইয়ে কেমনধারা যেন হয়ে গিয়েছিল। মুখে বাক্য সরে না। কেবল চোর—চোর টালুমালু চোখে চারদিকে চায় আর বিড়বিড় করে কী যেন আপনমনে বকে।

লোকটার অমন অসহায় অবস্থা দেখে ঘরজামাই কাকার তবু মনটা যেন নরম হয়েছিল, কিন্তু বড়ো কাকার যেন রোখ কিছুতেই কমতে চায় না। চকমকি তখনই বুঝে গিয়েছিল এই মাস্টার মানুষটির ভিতরে দয়ামায়া বড্ড কম। যে ক—দিন এ বাড়িতে ছিল কেবলই বউদি আর ভাইপো ভাইঝিদের ধমক টমক চোটপাট করে হুকুমের ওপর রেখেছে। লোকটার চেহারার মধ্যেও একটা কর্কশ ভাব আছে।

খবরটা ভালো নয়।

কানুকাকার সাইকেলটা চলে যেতেই চকমকি ফিরে এসে ঘরের কাজে মন দিল। মনটা আড় হয়ে রইল।

লেবুঝোপের ভিতর থেকে যে ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে আসতে চকমকি আর লাবণ্য দেখেছে তার কথাও এই সাতসকালে মনে পড়ল তার। বাবাটা কি মরে যাবে? বিনা চিকিৎসায়, অনাদরে? সংসারে কি একটা অমঙ্গলের ছায়া নেমে আসছে।

ভাইগুলোকে ঘুম থেকে তুলে পুকুরঘাট ঘুরিয়ে নিয়ে এল চকমকি। চাট্টি করে মুড়ি দিল বেতের ছোট্ট ধামায়। তারপর পড়তে বসাল। পড়াটা নামমাত্র। ছেঁড়াখোঁড়া বইখাতা আর ভাঙা শ্লেট নিয়ে হাঁ করে বসে থাকে তিনজনে। কে শেখাবে তাদের? স্কুলে যায় আসে বটে, কিন্তু কেউ তাগিদ দেয় না বলে পড়েও না, শেখেও না। দিনকে দিন ছোটোলোক হয়ে যাচ্ছে।

এ বাড়ির রান্না এখন ভারি সরল। প্রথমে এক বাটি শটি তৈরি হয় রুগির জন্য। তারপর ফ্যানাভাত বসে যায়। বাগান থেকে যা পায় তুলে আনে চকমকি। উচ্ছে, বেগুন, লাউ বা কুমড়ো। ভাতে ফেলে দিলেই হয়। ফ্যানাভাত আর নুন— এই তাদের খাবার।

রান্না বসাতে না বসাতেই লাবণ্য উঠে এল। রোগা জীর্ণ চেহারা। রুগির চেয়েও যারা রুগির সেবা করে তাদের দুর্গতি বেশি। নামিনাথ আজকাল বিছানা থেকে উঠতে পারে না বললেই হয়। পায়খানা পেচ্ছাপটাও ঘরেই করতে হয়। সেসব পরিষ্কার করে লাবণ্য। সারা রাত রুগির পাশে বসে থাকতে হয়। নামিনাথ বড়ো অশৈরণ, শরীরের কষ্ট একদম সহ্য করতে পারে না। হ্যাপা সামলে সকালবেলায় লাবণ্য বড়ো কাহিল থাকে।

চকমকি মাকে লক্ষ করল ভালো করে। লাবণ্য স্নান করে এসে যখন রান্নাঘরের বারান্দায় চায়ের গেলাস হাতে বসল তখন সে খবরটা দিল, মা, আজ বড়ো কাকা আসছে! কানুখুড়ো খবর দিয়ে গেল।

লাবণ্য ক্লান্ত চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, কেন আসছে?

কে জানে!

লাবণ্য একটু চুপ করে থেকে বলল, ঘরে তো কিছু তেমন নেই, কী খাওয়াব? আমরা যা খাই তা তো কারও পাতে ধরে দেওয়া যায় না।

কে এসেছিল তা চকমকি জানে। ওরা এসময়ে আনাগোনা করে। দেখে যায়, আর কতক্ষণ আয়ু।

নামিনাথের বউ লাবণ্য মেয়ের কাছে সব শুনে গুম মেরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জলভরা চোখে বলল, ঠিক দেখেছিস?

ঠিক মা। একটুও বানিয়ে বলছি না।

লাবণ্য আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে শরীরের একটা শীতভাব আটকানোর চেষ্টা করে বলল, আমিও দেখেছি।

কবে মা?

কাল। রান্নাঘর থেকে শুনেছিলুম কুকুরটা ভীষণ ডাকছে। রাত বেশি নয়, সবে সাঁঝ পেরিয়েছে। কে এল দেখতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই দেখলুম, একটা লোক ওর ঘরে ঢুকছে। বললাম, কে ওখানে, কেউ জবাব দিল না। একটু বাদে এসে দেখি, ঘর ফাঁকা। তোরা সব তখন বাতাসিদের বাড়ি শনি পুজোয় গেছিস।

চকমকি তার বাবাকে যে ভীষণ ভালোবাসে এমন নয়। তার বাপের অনেক গণ্ডগোল। অলস কৃপণ ঝগড়াটে তিরিক্ষি মেজাজের লোক। কাছে ঘেঁষলেই কেমন যেন খ্যাঁক করে উঠতে চায়। কারও বেশি খাওয়া পছন্দ করে না, একটুখানি বাবুগিরি সয় নয়। চকমকির এই তো সবে সাজের বয়স। তবু একটু পাউডার কিনে দেবে না, একখানা বাড়তি শাড়ি ব্লাউজ তার নেই, আলতা জোটে না। শুধু দু—বেলা দুটো ভাত। এর বেশি তারা আর কিছু আশা করে না।

তবু লোকটা তার বাপ। যেমনই হোক, বাপ। নামিনাথ মরলে তারা পড়বে অগাধ জলে।

কিন্তু চকমকি জানে, নামিনাথ আর বাঁচবে না। পেটে পাথর হলে কেউ কি বাঁচে? যমদূত আনাগোনা শুরু করেছে।

তাদের বাড়িটার চারদিকে মেলা অবান্তর গাছ হয়েছে। কে কাটবে? সকালে ঘরের সামনের দাওয়ায় বসে উদাস চোখে দেখছিল চকমকি। আগাছার জঙ্গল।

সকালের দিকটায় অনেক কাজ থাকে। কিন্তু চকমকির আজ আর কোনো কাজে মন লাগছে না। অথচ ওঠা দরকার। তার মা সারা রাতই প্রায় জেগে বসে থাকে তার বাবার পাশে। সকালের দিকে একটু তন্দ্রামতো হয় তার। এ সময়ে মা উঠে সংসারের ঝামেলা পোহাতে পারে না।

উঠোন ঘর সব ঝাটপাট দিতে হবে। লেপাপোঁছা আছে। ভাইগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য করানোর পর পড়তে বসাতে হবে। রোগীর পথ্য করা, রান্না, সবই পড়ে আছে।

তবু চকমকি বসে রইল চুপচাপ। সে কেবল ভাবছে, নামিনাথ মরে গেলে কী হবে। কী হবে তা বলা শক্ত, কিন্তু কী হবে না তা সে ভালোই জানে। একটা হল, তার বিয়ে। নামিনাথ মরে গেলে তার আর বিয়ে হবে না সহজে।

কে একজন বাইরে থেকে ডাকল, নামিনাথদা, ও নামিনাথদা।

চকমকি চমকে উঠল। কানুকাকার গলা।

উঠে এগিয়ে গিয়ে চকমকি বলল, বাবার বড়ো অসুখ।

কানুকাকা একখানা সাইকেলে বসে। বলল, সে তো জানি। আজ আছে কেমন?

জ্বর কমছে না।

তাই তো রে! ভাবালে বড্ড। ডাক্তার কী বলছে?

অস্ত্র করতে হবে।

চকমকি চুপ করে রইল।

লাবণ্য চা শেষ করে উঠল। বলল, তুই সামলে থাক সব। আমি একটু ঘুরে আসছি। হাঁসের ঘরে দেখিস তো ডিম আছে বোধহয়। বের করে রাখ। শালপাতাও তুলে রাখিস চারটি।

ঘটি, বাটি, গেলাস যাহোক একটা কিছু আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল লাবণ্য।

বাপের জন্য শটিফুড জ্বাল দিয়ে নিয়ে গেল চকমকি।

বাবা!

নামিনাথ জ্বরে বেহুঁশ হয়ে বিড়বিড় করে বলছিল, ওই আসছে! ওই আসছে!

৩

ভয়ে দিগবিদিগজ্ঞানশূন্য হয়ে যখন মাঠ ভেঙে পালাতে লাগল হাঁদু, তখনই আসলে তার এতকালের আকাট মাথাখানা হঠাৎ খুলে যেতে লাগল। কারণ হঠাৎ তার মাথায় একেবারে বজ্রাঘাতের মতো এসে পড়ল একটা বুদ্ধির কথা। তার মনে হল সে নিজে যাদের ভয়ে পালাচ্ছে তারাও কিন্তু ভয়ই খাচ্ছে তাকে। ভয় খাচ্ছে বলেই নিকেশ করতে বেরিয়ে পড়েছে।

পলতাবেড়ের খালের ধারে যখন পৌঁছল তখন মাথায় আস্ত একখানা ডাব এসে পড়ল হঠাৎ। না, সত্যিকারের ডাব নয়। আর একটা বুদ্ধির কথা। খুনিয়ারা তো তার মুখ বন্ধই করতে চাইছে। তা সেটা দু—ভাবেই হতে পারে। নিকেশ করেও হয়, আবার ঘুষ দিয়েও হয়।

আজ অবধি হাঁদুর জামা—জুতো জুটল না, বউ না, ছাতা না, কিছু না। খুনিয়াদের কাছ থেকে কিছু কষে নিতে পারলে হত। তবে কিনা গদাধর, হেলে, পটল আর গণেশ চরণগঙ্গা থেকে শুরু করে বিশ—ত্রিশ মাইল চক্করে সব এলাকাই মুঠোয় রেখেছে। নইলে এক্রামের বাড়ি চড়াও হতে পারত না।

দর্জিঘরের সামনের দিককার ঝাঁপ পেলে ব্রজ একটা লুঙ্গি সেলাই করছিল খড়খড় করে।

ব্রজদা! বড্ড বিপদ।

ব্রজ মুখ তুলে চেয়ে বলল কীসের বিপদ?

হাঁদু ধীরেনের লুঙ্গির একখানা কোনা তুলে মুখের ঘাম মুছে বলল, আমার একটা লুকোনোর জায়গা দরকার। নইলে মেরে ফেলবে।

ব্রজ সেলাই থামিয়ে বিড়ি ধরিয়ে সবটা শুনল বসে বসে। কুঁজো থেকে নিজের হাতে জল গড়িয়ে খাওয়াল হাঁদুকে। তিন নম্বর বিড়িতে হাঁদুর কথা শেষ হল। পাঁচ নম্বর বিড়ি অবধি চুপচাপ বসে ভাবল ব্রজ।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর এদিকেও বিপদ, ওদিকেও বিপদ। ওরা এখন খ্যাপা কুকুরের মতো হন্যে হয়ে খুঁজছে তোকে। দর কষাকষির কথাই ওঠে না। হেঁসো দিয়ে গলা নামিয়ে দেবে।

তা হলে?

তোর দরকার এখন একজন মাতব্বরগোছের লোক। নইলে পেরে উঠবি না। মাতব্বর যদি কাউকে পাস তো বেঁচে গেলি। সে তোকে আড়ালে রেখে খুনিয়াদের সঙ্গে কথা বলবে। এখন টাকাপয়সা খেঁচবার কথা ভাবিসনি। আগে গর্দানখানা বাঁচা।

একজন মাতব্বর জুটিয়ে দাও না।

ব্রজ সাত নম্বর বিড়ি খরচ করে তারপর স্বামীনাথের ঠিকানা দিলে। একখানা হাতচিঠিও ছিল সঙ্গে বলল, এই ঘরেই লুকিয়ে থাক বিকেল অবধি। পাটাতনের ওই কাঠখানা আলগা আছে, কেউ হুড়ো দিলে ওটা তুলে খালের জলে নেমে পড়িস। দুটো মুড়ি তেলেভাজা দিয়ে যাচ্ছি, চিবিয়ে বেঞ্চখানায় শুয়ে থাক। আমি বাড়ি চললুম। আর একটা কথা। যার কাছে পাঠাচ্ছি সে কিন্তু লোক সুবিধের নয়। অতি ঘড়েল।

শীতের বেলা পট করে ফুরিয়ে যখন চারদিকে লেপাপোঁছা আঁধার হল তখনই সাঁত করে ব্রজর দোকান থেকে বেরিয়ে খালের ধারে নেমে পড়ল হাঁদু।

চরণগঙ্গা তার চেনা জায়গা। তবে চেনা পথে গেলে বিপদ আছে ভেবে হাঁদু মাঠঘাট ভেঙে হাঁটা দিল।

ইকবালপুর পিরের দরগার কাছাকাছি একটু জিরোতে বসেছিল গাছতলায়। তখনই হঠাৎ ঘটনাটা ঘটল। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

একটু দূরে দরগার বাতি জ্বলছে। লোকজনও দেখা যাচ্ছে দু—চারজন। একটু তফাতে একখানা অশ্বত্থ গাছের তলায় থুপ করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে অভ্যাসমতো লুঙ্গিটা তুলে যখন মুখের ঘেমো ভাবটা মুছছে তখনই হঠাৎ ধীরেন তার কানে কানে বলল, তুই বড়ো ভালো ছেলে...

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল হাঁদু। 'ভূত! ভূত!' বলে চেঁচিয়ে ফেলত আর একটু হলে। কিন্তু সামলে গেল সময়মতো।

তারপর বাকি রাস্তাটা সে আর কোথাও দাঁড়ায়নি।

স্বামীনাথ লোকটা যে সুবিধের নয়, তা তার দিকে একবার চোখ ফেললেই বোঝা যায়। চোখদুটো ভারি ধূর্ত। মুখখানা দেখলে মনে হয়, রসকস সব কেউ নিংড়ে নিয়েছে।

ব্রজর চিঠিখানা গোমড়া মুখ করে পড়ল, আর ততক্ষণ হাঁদুকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখল, ঘরে ঢুকতে দিল না।

ঘরে ঢুকেই যে স্বস্তি হল তা নয়। শুরু হল জেরা। নাম, বাপের নাম দিয়ে শুরু। তারপর নানা খতেন। লোকটা যে ঘোরতর বিষয়ী তা ঘর দেখলেই বোঝা যায়। ঘরের দুটো দেয়াল জুড়ে ছাদ পর্যন্ত পেটমোটা বস্তা সাজিয়ে রাখা। চৌকির তলাতেও তাই। বাড়িখানা বেশ বড়োসড়ো। অবস্থাপন্ন চেহারা। গাঁয়ের মাস্টারের অবস্থা এত ভালো হওয়ার কথা নয়।

লোকটা যে বিষয়ী তার আরও প্রমাণ, হাঁদু খুনের সাক্ষী জেনেও তাড়াল না। সব শুনে—টুনে ভাবতে লাগল। বিষয়ী লোকেরা দুনিয়ার সব ঘটনা থেকেই দাঁও মেরে নিতে পারে।

অবশেষে ভরসার কথা বেরলো মুখ দিয়ে, ধীরেন সাঁপুইকে আমি ভালোই চিনতাম। অমন পাজি লোক দুটো হয় না। মরেছে আপদ গেছে। তবে আইন বলে কথা আছে। তা খুনেদের যে তুমি ভালো করেই চেনো সে কথা হলফ করে বলতে পারবে তো সময়কালে?

আজ্ঞে দরকার হলে পারব।

তুমিই একমাত্র সাক্ষী কিনা। তোমার ওপর অনেকটাই নির্ভর।

আজ্ঞে জানি।

তা আগে পুলিশকে সেকথা বলনি কেন?

ভয়ে।

এখন ভয় নেই?

আজ্ঞে এখন আরও বেশি ভয়। কিন্তু খুনিয়াদের ধরিয়ে না দিলে তারা যে আমাকেই নিকেশ করবে। তবে টাকাপয়সা দিয়ে যদি বন্দোবস্ত করতে চায় তা হলে...

স্বামীনাথ মাথা নেড়ে বলল, ও লাইনে সুবিধে হবে না। ধীরেনের খুড়শ্বশুর মস্ত মানুষ। এম এল এ। সে এতকাল গা করেনি, জামাইকে বোধহয় পছন্দও করত না। কিন্তু এবার সে গা—ঝাড়া দিয়ে নেমেছে। খুনিরা ধরা পড়বেই। তার সাক্ষী না থাকলে মামলাটা ফেঁসে যেতে পারে এইজন্যই খুনিরা তোমাকে খুঁজছে।

আজ্ঞে জানি।

স্বামীনাথ আবার ভাবতে বসল। তারপর বলল, আপাতত গা—ঢাকা দিয়ে থাকো। আরও ভেবে দেখি।

স্বামীনাথের বাড়িতে দু—রাত্তির থাকতে হল হাঁদুকে।

প্রথম রাত্রেই ঘটনাটা আবার ঘটল। হাঁদুর একটি বই দুটি লুঙ্গি নেই। সেই ধীরেনের লুঙ্গিখানা। মাঝরাত্তিরে লুঙ্গিখানা যেন ধীরেনের গলায় কথা কয়ে উঠল, নেমকহারামি করিস না রে হাঁদু। তুই বড়ো ভালো ছেলে ছিলি...

হাঁদু ভারি ভয় খেয়ে গেল।

দ্বিতীয় রাত্রে ফের ধীরেনের গলা, সামলে—সুমলে চলিস বাপ, তোর সময়টা মন্দও বটে, ভালোও বটে। মন্দ থেকেই ভালো বের করে নিতে হয়...

হাঁদুর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। দ্বিতীয় রাত না পোহাতেই আঁধারে আঁধারে দু—জনে বেরিয়ে পড়ল। স্বামীনাথ আর সে। স্বামীনাথের এক দাদার বাড়ি আছে কাছেপিঠে। এক গাঁয়ে। জায়গাটা নিরাপদ। মাইল পাঁচেক হেঁটে তারপর বাস ধরে এবং ফের মাইলটাক হেঁটে যখন বাড়িটায় পৌঁছল হাঁদু আর স্বামীনাথ তখন দুপুর।

মানুষের খিদে তেষ্টা আছে, হাঁদুর নেই। মানুষের শীত গ্রীষ্ম আছে, হাঁদুর নেই। মানুষের সুখ দুঃখ আছে, হাঁদুর নেই। হাঁদুর এমনি আরও অনেক কিছুই নেই। থাকলে বেশ হত। না থেকেও চলে যাচ্ছে।

হাঁদুকে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে স্বামীনাথ ভিতরবাড়িতে ঢুকে সেই যে জমে রইল আর ঘণ্টাটাকের মধ্যে বেরোল না। এর মধ্যে একটা ছুকরি মেয়ে কলসি কাঁখে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে তাকে বেশ খর চোখে দেখে গেল। তিনটে বাচ্চচা ছেলে অনেকবার ঘুরে ফিরে পরখ করে গেল তাকে। হাঁদুর অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। দাওয়ায় বসে বসে সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলতে লাগল।

অনেকক্ষণ বাদে ছুকরি মেয়েটা এসে ডাকল, এই যে, ওঠো তো, পুকুরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও। ভাত বাড়া হচ্ছে।

এই কথায় হাঁদুর খিদের কথা মনে পড়ল, হাত মুখ ধোয়ার কথা মনে পড়ল। রওনা হওয়ার আগে স্বামীনাথ দুধমুড়ি খেয়ে এসেছে। তাকে কিছু দেয়নি।

উঠোন ডিঙিয়ে পুকুরঘাটে যাওয়ার সময় হাঁদু চারদিকে চেয়ে বুঝে ফেলল, এরা বড়ো গরিব। বাড়িটার কেমন হাড়হাভাতে চেহারা। পুকুরের দিকে যেতে বড়ো বড়ো কচুপাতা গায়ে লাগছিল হাঁদুর। আগাছা জন্মেছে খুব। একটা কুলগাছ শুঁয়োপোকায় ছেয়ে আছে। বোঝা যায়, দেখাশোনার লোক নেই এ বাড়িতে।

যখন পুকুরে নেমে জল ছুঁয়েছে তখনই স্নান করার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে চাগাড় দিল। শরীরটা তেতে আছে। ধুলোও খেয়েছে খুব। কিন্তু পরনের একখানা বাড়তি ট্যানাও নেই, গামছাও দূরস্থান। গায়ের চাদরখানা অবশ্য পরে নেওয়া যায়, গেঞ্জিখানা দিয়ে গামছার কাজ চলে যেতে পারে।

দোনোমোনো করে নেমেই পড়ল জলে হাঁদু। কী ঠান্ডা, কী মিষ্টি জল! অনেকক্ষণ স্নান করল, কয়েকবার সাঁতরে এপার—ওপার করল পুকুরটা। তারপর গেঞ্জিটা ধুয়ে গা মুছল, চাদরটা লুঙ্গি করে পড়ল।

খেতে বসে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল হাঁদু। এরা ভাত দিয়েছে একটা কাঁসার কানা—উঁচু থালায়। গরম ভাত, একথাবা শাক। ভাতে ধোঁয়া উঠছে। এরকমটায় অভ্যাস নেই হাঁদুর। জন্মে সে কলাইকরা বা অ্যালুমিনিয়ামের থালা ছাড়া খায়নি। থালার সামনে আবার একখানা আসন পাতা। এক গেলাস জল। সামনে সেই ছুকরি মেয়েটা ডালের বাটি আর ঝোলের একখানা বোকনো মতো নিয়ে বসে আছে। পরিবেশন করবে।

ভারি লজ্জায় পড়ল হাঁদু। লজ্জায় লজ্জায় খেতে খেতে বলল, স্বামীনাথবাবু কী চলে গেছে?

না, খেয়ে উঠে বিশ্রাম করছে। বিকেলে যাবে। তুমি ওঁকে চেনো?

হাঁদু মাথা নেড়ে বলল, পরশুই আলাপ। আগে চিনতাম না।

শুনলাম তুমি নাকি এখন এ বাড়িতেই কিছুদিন থাকবে। তা তোমার জিনিস কোথায়?

জিনিস! বলে হাঁদু একগাল হাসল, না জিনিস নেই। আমার কিছু লাগে না।

বহুকাল পরে বড়ো ভালো খেল হাঁদু। তেমন কিছু নয়, শাক ডাল আর একখানা ঝোল। কিন্তু ভারি যত্ন করে দিল। এমনকী খাওয়ার পর এঁটো বাসনটাও নিজেই নিতে গিয়েছিল মেয়েটা। হাঁদু জিব কেটে প্রায় কেড়ে নিয়ে মেজে এনেছে ঘাট থেকে।

বাড়িটা বড়ো ভালো লেগে গেল হাঁদুর। দুপুরটা সে দাওয়ায় বসে বসে অনেক ভাবল। ভাবতে ভাবতে একটু ঢুলুনি এসেছিল। হঠাৎ ধীরেন খুব কাছ থেকে ফিসফিস করে বলল, তোর হয়ে গেল। বেঁচে গেলি রে ব্যাটা...

ভারি চমকে উঠল হাঁদু। ইতিউতি চাইল। ধীরেনের গরম শ্বাসটা যেন এখনও কানে লেগে আছে।

বেলা থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ল স্বামীনাথ। যাওয়ার আগে ধূর্ত চোখদুটো মিটমিট করতে করতে হাঁদুকে বলল, তোমরাও সদগোপ, আমরাও সদগোপ। এ বাড়িতে আপনজনের মতোই থাকো। বেশি বার—টার হয়ো না। গা—ঢাকা দিয়ে থাকো। সময় হলে আমি খবর পাঠাব। আর মুখ বন্ধ রাখবে। স্পিকটি নট।

হাঁদু দু—দিন আগে যেমন হাঁদারাম ছিল তেমনটা যেন আর নেই। সেই যে ভয় খেয়ে মাঠ ভেঙে দৌড় লাগিয়েছিল তখনই কেন কে জানে তার মাথায় নানা চিত্তির—বিচিত্তির বুদ্ধির ঝিকিমিকি খেলছে। স্বামীনাথের দিকে তার মনে হল, এ লোকটাকে বিশ্বাস করার চেয়ে গোখরো সাপের সঙ্গে ঘর করাও ভালো।

বেলা পড়বার আগেই উঠে হাঁদু জিজ্ঞেস করে খুঁজে পেতে কোদাল আর দা বের করল। উঠোনের আশেপাশের আগাছা সাফ করে ফেলল লহমায়! দুটো বেশ বড়োসড়ো কচু তুলে আনল জঙ্গল থেকে। উঠোন দাওয়া ঝাঁটপাট দিল।

সে টের পাচ্ছিল, এ বাড়িতে এক রুগির এখন—তখন অবস্থা। গিন্নিমা আর মেয়েটার মুখ শুকনো, বাচ্চাগুলোরও মুখে হাসিখুশি নেই। কাজ করতে করতেই এসব লক্ষ করল হাঁদু।

মেয়েটা এক ফাঁকে এসে তাকে বলল, কাকা তোমাকে এখানে রেখে গেল কেন বলো তো!

কাঁচুমাচু হয়ে হাঁদু বলল, আমার বড়ো বিপদ কিনা।

মেয়েটা অকপট চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, তোমার বিপদ তা কাকা কী করবে?

হাঁদু মাথা চুলকে বলল, শুনেছি মুরুব্বি লোক। ক্ষমতা আছে।

মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, তোমাকে দেখে মনে হয় বেশ সোজা সরল মানুষ।

আজ্ঞে আমি চোর—টোর নই, কোনো দোষঘাটও করিনি। খেটে খাই। দোষের মধ্যে একটা খুন স্বচক্ষে দেখে ফেলেছিলুম।

খুন! বলে মেয়েটা অবাক হয়ে চাইল।

হাঁদু লুকোছাপা করল না কিছু, সব বলে দিল।

মেয়েদের চোখ ছলছল করতে লাগল। শুনে। বলল, ইস, খুব মুশকিলে পড়েছ তো?

আজ্ঞে, ভীষণ মুশকিল।

আমাদেরও বড়ো বিপদ। বাবা বোধহয়...। কী যে হবে!

হাঁদুরও চোখ ছলছল করতে লাগল শুনে। দু—জনেই দু—জনের দিকে চেয়ে থাকল একটুক্ষণ। দু—জন অচেনা যুবক যুবতীর পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকার মধ্যে যে লজ্জা আছে তা তাদের হচ্ছিল না। কারণ, তাদের তো সেরকম তাকানো নয়। দু—জনেই বড়ো দুঃখী।

সন্ধে পার হওয়ার পর দাওয়ায় বসে হাঁদু গুনগুন করে গান গাইছিল। গুটে গুটে তিনটে ছেলে ঘরে লম্ফ জ্বেলে পড়তে বসেছে। গিন্নিমা রান্নাঘরে। মেয়েটা রুগির কাছে।

ঠিক এই সময়ে মেয়েটা চেঁচাল, মা... ওমা...

হাঁদু উঠে গেল।

কী হয়েছে?

লম্ফের আলোয় দেখল, মেয়েটার চোখ বড়ো বড়ো, ঘন শ্বাস পড়ছে। ঘ্যাসঘ্যাসে ভয়—খাওয়া গলায় বলল, আবার এসেছিল।

কে এসেছিল?

রোজ যে আসে লেবু ঝোপ থেকে।

লাবণ্যও মেয়ের ডাক শুনে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। চোখের দৃষ্টি কেমনধারা।

নামিনাথ ঘোর হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে 'অঃ অঃ' একটা শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

তিন দিন এ বাড়িতে কেটে গেছে হাঁদুর। আর তিন দিনেই হাঁদুর মনে হতে লেগেছে এ বাড়ি তার নিজের বাড়ি। একটুও পরপর লাগছে না এদের। সবচেয়ে বড়ো কথা, যেদিন এ বাড়িতে এল তার পরদিন রাত না পোহাতেই জীবনে প্রথম পিরান পেয়ে গেল হাঁদু। লাবণ্য তোরঙ্গ হাঁটকে নামিনাথের একটা পুরোনো জামা বের করে দিল। বলল, বড্ড শীত পড়েছে, এটা গায়ে দিও।

পিরান পর্যন্তই থেমে থাকেনি ব্যাপারটা, জুতো অবধি গড়িয়েছে। নামিনাথেরই পুরোনো একজোড়া ক্ষয়া জুতো ছিল। নামিনাথ জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছে বলে পড়েই ছিল। হাঁদুকে দিয়ে দিল লাবণ্য।

হাঁদু অবশ্য গায়ে গতরে খেটে শোধ দিচ্ছে। হিসেব কষে সে বুঝল, নামিনাথ লোকটা এক নম্বরের কুঁড়ে। নইলে বাড়ির হাতায় যে বাগানখানা রয়েছে তাতে চাষ দিলেও সারাবছর সবজির অভাব হবে না। লাউ কুমড়ো তো মেলাই করা যায়। চাষের জমির যা হিসেব পেল তা নিজে লাঙল চষলে হেসে—খেলে বছরের ধান ঘরে উঠে আসে। যদি অবশ্য আকাল না পড়ে।

হাঁদু প্রথমটায় বাগানের পিছনে লেগে গেল। আগাছা নিড়িয়ে মাটি কুপিয়ে চৌরস করে ফেলতে লাগল। মুঠোর মধ্যে কোদাল যেন চিতাবাঘের শক্তি ধরে। তার গা দগদগ করে ঘামে। শরীর গরম হয়ে ফেটে পড়তে চায়।

লেবুঝোপটা খুব ভালো করে নিড়িয়ে সে তকতকে করে দিয়েছে। কিছু ঝুপসিগাছের বাড়তি ডালপালা কেটে ফেলায় বাড়িতে দিব্যি রোদ আর হাওয়ার আনাগোনা শুরু হয়েছে।

বলতে কি এখন আর লাবণ্য বা চকমকি লেবুঝোপের ছায়াটাকে দেখছে না। হাঁদু আসার পর ওই একবারই দেখা গিয়েছিল। এদিকে কে জানে কেন ধীরেনেরও ফিসফাস বন্ধ। নামিনাথ ধুঁকছে বটে, কিন্তু টিকেও আছে।

জমি কোপাতে কোপাতে একেবারে পশ্চিমধারে কলাঝোপের কাছ বরাবর চলে গিয়েছিল হাঁদু। বাগানখানা মস্ত বড়ো। কলাঝোপের কাছ থেকে চাইলে বাড়িটা গাছপালার আড়ালে আর দেখাই যায় না।

কাঁধ দুটো ধরে গিয়েছিল বলে হাঁদু কোদাল ছেড়ে কলাঝোপের দিকে একটু সরে দাঁড়াল। আর দাঁড়াল বলেই দেখল।

যা দেখল তাতে তার রক্ত জল হয়ে যাওয়ারই কথা।

একটু দূরে একটা শিবমন্দির আছে। পুব—দক্ষিণ কোনাকুনি। বটগাছের নীচে। সকাল—বিকেল ওখানে গাঁয়ের লোকদের একটু জটলা হয়। দুপুরে একদম ফাঁকা। সেই বটতলায় দু—জন লোক দাঁড়িয়ে। স্বামীনাথকে চিনতে কষ্ট হয় না। অন্যজনও খুব চেনা হাঁদুর। গদাধর। স্বামীনাথ এ বাড়ির দিকে আঙুল তুলে কী যেন দেখাচ্ছে গদাধরকে।

কলাঝোপের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁদু দৃশ্যটা বেশ স্থির হয়েই দেখল। লক্ষ করল, স্বামীনাথ আর এদিক পানে এগোল না। ফিরে চলল পায়ে হেঁটে। একটু বেশ জোরেই হাঁটছে।

হাঁদুর বুদ্ধি অনেক পাকা হয়েছে। মাথা এখন তার বেশ সাফ। স্বামীনাথ যে গদাধরের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে এসেছে তাতে তার আর সন্দেহ নেই। তবে কিনা মানুষের ওপর রাগ করে লাভ নেই। মানুষ এরকমও হয়। ভালোর ভালো খুব ভালো যেমন আছে, তেমনি এরকমও আছে। সবরকম না হলে কি ভগবানের চিড়িয়াখানা ভরভরাট হয়!

ধীরেন যে তার কানে কানে বলেছিল, মন্দ থেকেই ভালোটা বের করে নিতে হয় সে কথাটাও চড়াক করে খেলে গেল মাথায়।

গদাধর ইতিউতি চেয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। মুখ—চোখ বেশ বিভ্রান্ত। একটা মরিয়া ভাব। ফাঁসির দড়ি চোখের সামনে ঝুলছে তো দিন—রাত।

কিন্তু গদাধরকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে করল না হাঁদুর। সে বাগানের বেড়াটা টপকে গেল এক লাফে। তারপর শুখা খালের খাঁড়িতে নেমে বেড়ালের মতো এগিয়ে গেল।

গদাধর চারদিকে চেয়ে একটু বেকুবের মতো মুখে সদরে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

পিছন থেকে হাঁদু এগিয়ে গেল চোরের পায়ে। তারপর যে লাফটা মারল তা হনুমান দেখলেও লজ্জা পেত।

গদাধর মাথা ঘোরানোর সময় পেল না। গদাম করে পড়ে গেল মাটিতে। হাঁদু দেখল, গদাধরের মুঠোয় তখনও একটা ভোজালির বাঁট ধরা। ছাড়েনি।

হাঁদু ভোজালিটা তুলে জঙ্গলের দিকে ছুড়ে দিয়ে গদাধরকে গর্দান ধরে দাঁড় করিয়ে দুটো ঝাঁকুনি দিল। দিয়ে নিজেই অবাক হল সে। ক—দিন আগেও গদাধরকে দেখলে সে নেংটি ইঁদুরের মতো পালাত নিশ্চয়।

গদাধর একটু হাপসে গিয়েছিল। বলল, ছাড় বলছি। জানে মেরে দেব।

মারতেই তো এসেছিলে। এখন তোমাকে পুঁতে ফেললে কেমন হয়?

বলেই কোকসায় একটা হাঁটুর গুঁতো বসাল হাঁদু।

গদাধর কোঁক করে উঠল।

হাঁদু বলল, মারব না। তোমার বিপক্ষে সাক্ষীও দেব না। কিন্তু আমার একটা কাজ করে দিয়ে জন্মের মতো বিদেয় হবে। কথা দাও।

কী কাজ?

একজনের পাথুরি হয়েছে। ভালো করে দিতে হবে। তুমি মেলা ওষুধ জানো।

গদাধর কথাটা বিশ্বাস করল না বোধহয়। হাঁদুর দিকে চেয়ে বলল, সাক্ষী দিবি না, বিশ্বাস করি কী করে?

হাঁদুর কী দায় সাক্ষী দেওয়ার? আমি মিছে কথা বলি না।

মায়ের নামে কিরে কাটতে পারবি?

পারব।

গদাধর নরম হল। বোধহয় দ্বিতীয় খুনটা করার খুব ইচ্ছে তারও ছিল না। ধুতির খুঁটে মুখটা মুছে বলল, কাজটা করে ফেলেছি, এখন আর ঝুলিয়ে কিই বা করতিস। চল তোর রুগি দেখি।

স্বামীনাথ কত টাকা খেয়েছে?

দুশো। সে টাকা উশুল হয়ে যাবে। চল।

গদাধর রুগি দেখল। খুব মন দিয়েই দেখল। তারপর কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিয়ে বলল, ভালো হয়ে যাবে। পাথুরি বটে তবে তেমন ঘোরালো হয়নি। নেমে যাবে।

হাঁদুর পিরান হল, জুতো হল। বউও হয় হয়।

আমরা

সেবার গ্রীষ্মকালের শেষদিকে দিন চারেক ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগে উঠলেন আমার স্বামী। এমনিতেই তিনি একটু রোগা ধরনের মানুষ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর তাঁর চেহারাটা আরও খারাপ হয়ে গেল। দেখতাম তাঁর হনুর হাড় দুটো গালের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, গাল বসা, চোখের নীচে কালি, আর তিনি মাঝে মাঝে শুকনো মুখে ঢোক গিলছেন— কণ্ঠাস্থিটা ঘনঘন ওঠা—নামা করছে। তাঁকে খুব অন্যমনস্ক, কাহিল আর কেমন যেন লক্ষ্মীছাড়া দেখাত। আমি তাঁকে খুব যত্ন করতাম। বিট—গাজর সেদ্ধ, টেংরির জুস, দু—বেলা একটু একটু মাখন, আর রোজ সম্ভব নয় বলে মাঝে মধ্যে এক—আধটা ডিমের হাফবয়েল তাঁকে খাওয়াতাম। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার এক মাস পরেও তাঁর চেহারা ভালো হল না, বরং আরও দুর্বল হয়ে গেল। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে তিনি ভয়ংকর হাঁফাতেন, রাত্রিবেলা তাঁর ভালো ঘুম হত না, অথচ দেখতাম সকালবেলা চেয়ারে বসে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি ঢুলছেন, কষ বেয়ে নাল গড়িয়ে পড়ছে। ডাকলে চমকে উঠে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেত যে তিনি স্বাভাবিক নেই। বরং অন্যমনস্ক এবং দুর্বল দেখাচ্ছে তাঁকে।

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম— তোমার কী হয়েছে বলো তো!

তিনি বিব্রতমুখে বললেন,— অনু, আমার মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা আমার এখনও সারেনি। ভিতরে ভিতরে আমার যেন জ্বর হয়, হাড়গুলো কটকট করে, জিভ তেতো—তেতো লাগে। তুমি আমার গা—টা ভালো করে দ্যাখো তো!

গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা। সে কথা বলতেই তিনি হতাশভাবে হাত উলটে বললেন— কী যে হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার বোধহয় একটু একসারসাইজ করা দরকার। সকাল বিকেলে একটু হাঁটলে শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন থেকে খুব ভোরে উঠে, আর বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তিনি বেড়াতে বেরোতেন। আমি আমাদের সাত বছর বয়সের ছেলে বাপিকে তাঁর সঙ্গে দিতাম। বাপি অবশ্য বিকেলবেলা খেলা ফেলে যেতে চাইত না, যেত সকালবেলা। সে প্রায়ই এসে আমাকে বলত— বাবা একটুও বেড়ায় না মা, পার্ক পর্যন্ত গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে, আর রেলিঙে ঠেস দিয়ে ঢুলতে থাকে। আমি বলি, চলো বাবা, লেক পর্যন্ত যাই, বাচ খেলা দেখে আসি, আমাদের স্কুলের ছেলেরাও ওখানে ফুটবল প্র্যাকটিস করে, কিন্তু বাবা রেললাইন পারই হয় না। কেবল ঢুলঢুল চোখ করে বলে, তুই যা, আমি এখানে দাঁড়াই, ফেরার সময় আমাকে খুঁজে নিস।

আমাদের স্নানঘরটা ভাগের। বাড়িওয়ালা আর অন্য এক ভাড়াটের সঙ্গে। একদিন সকালবেলা অফিসের সময়ে অন্য ভাড়াটে শিববাবুর গিন্নি এসে চুপিচুপি বললেন— ও দিদি আপনার কর্তাটি যে বাথরুমে ঢুকে

বসে আছেন, তারপর আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমার কর্তাটি তেল মেখে কখন থেকে ঘোরাফেরা করছেন, এইমাত্র বললেন— দেখি তো, অজিতবাবু তো কখনো এত দেরি করে না—

শুনে ভীষণ চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি বাথরুমের দরজায় কান পাতলাম। কিন্তু বাথরুমটা একদম নিশ্চুপ। বন্ধ দরজার ওপাশে যে কেউ আছে তা মনেই হয় না। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম— ওগো, কী হল—

তিনি বললেন— কেন?

—এত দেরি করছ কেন?

তিনি খুব আস্তে, যেন আপনমনে বললেন— ঠিক বুঝতে পারছি না— তারপর হুড়মুড় করে জল ঢেলে কাক—স্নান সেরে তিনি বেরিয়ে এলেন।

পরে যখন জিজ্ঞেস করলাম, বাথরুমে কী করছিলে তুমি? তখন উনি বিরসমুখে বললেন, গা—টা এমন শিরশির করছিল যে জল ঢালতে ইচ্ছে করছিল না। তাই চৌবাচ্চচার ধারে উঠে বসে ছিলাম।

—বসেছিলে কেন?

—ঠিক বসেছিলাম না। জলে হাত ডুবিয়ে রেখে দেখছিলাম ঠান্ডাটা সয়ে যায় কি না।

বলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে এক সময়ে বললেন— আসলে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের ভিতরটা কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা, জলে অন্ধকার, আর চৌবাচ্চচা ভরতি জল ছলছল করে উপচে বয়ে যাচ্ছে খিলখিল করে— কেমন যেন লাগে!

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম— কেমন?

উনি ম্লান একটু হাসলেন, বললেন— ঠিক বোঝানো যায় না। ঠিক যেন গাছের ঘন ছায়ায় বসে আছি, আর সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে—

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন— বুঝলে, ঠিক করলাম এবার বেশ লম্বা অনেকদিনের একটা ছুটি নেব।

—নিয়ে?

—কোথাও বেড়াতে যাব। অনেকদিন কোথাও যাই না। অনু, আমার মনে হচ্ছে একটা চেঞ্জের দরকার। শরীরের জন্য না, কিন্তু আমার মনটাই কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। অফিসে আমি একদম কাজকর্ম করতে পারছি না। আজ বেলা তিনটে নাগাদ আমার কলিগ সিগারেট চাইতে এসে দেখে যে আমি চোখ চেয়ে বসে আছি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছি না। সে ভাবল, আমার স্ট্রোক—ফোক কিছু একটা হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে সবাইকে ডেকে আনল। কী কেলেঙ্কারি! অথচ তখন আমি জেগেই আছি।

—জেগেছিলে! তবে সাড়া দাওনি কেন?

—কী জানো! আজকাল ভীষণ অলস বোধ করি। কারও ডাকে সাড়া দিতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এমনকী মাঝে মাঝে অজিত ঘোষ নামটা যে আমার তা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। কেউ কিছু বললে চেয়ে থাকি কিন্তু বুঝতে পারি না। ফাইলপত্র নাড়তে ইচ্ছে করে না, একটা কাগজ টেবিলের এধার থেকে ওধারে সরাতে, পিনকুশনটা কাছে টেনে আনতে গেলে মনে হয় পাহাড় ঠেলার মতো পরিশ্রম করছি। সিগারেটের ছাই কত সময়ে জামায় কাপড়ে উড়ে পড়ে— আগুন ধরার ভয়েও সেটাকে ঝেড়ে ফেলি না—

শুনে, আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক করে উঠল। বললাম— তুমি ডাক্তার দেখাও। চলো, আজকেই আমরা মহিম ডাক্তারের কাছে যাই।

—দূর! উনি হাসলেন, বললেন— আমার সত্যিই তেমন কোনো অসুখ নেই। অনেকদিন ধরে একই জায়গায় থাকলে, একই পরিবেশে ঘোরাফেরা করলে মাথাটা একটু জমাট বেঁধে যায়। ভেবে দ্যাখো, আমরা প্রায় চার—পাঁচ বছর কোথাও যাইনি। গতবার কেবল বিজুর পৈতেয় ব্যান্ডেল। আর কোথাও না। চলো,

কাছাকাছি কোনো সুন্দর জায়গা থেকে মাসখানেক একটু ঘুরে আসি। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন জায়গায় যাব সেখানে একটা নদী আছে, আর অনেক গাছগাছালি—

আমার স্বামী চাকরি করেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফিসে। কেরানি। আর কিছুদিন বাদেই তিনি সার্বর্ডিনেট অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের পরীক্ষা দেবেন বলে ঠিক করেছেন। অঙ্কে তাঁর মাথা খুব পরিষ্কার, বন্ধুরা বলে— অজিত এক চান্সে বেরিয়ে যাবে। আমারও তাই বিশ্বাস। কিছুদিন আগেও তাঁকে পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখতাম। দেখে খুব ভালো লাগত আমার। মনে হত, ওঁর যেমন মনের জোর তাতে শক্ত পরীক্ষাটা পেরিয়ে যাবেনই! তখন সংসারের একটু ভালো ব্যবস্থা হবে। সেই পরীক্ষাটার ওপর আমাদের সংসারের অনেক পরিকল্পনা নির্ভর করে আছে। তাই চেঞ্জের কথা শুনে আমি একটু ইতস্তত করে বললাম— এখন এক—দেড় মাস ছুটি নিলে তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না?

উনি খুব অবাক হয়ে বললেন— কীসের পড়াশুনো?

—ওই যে এস—এ—এস না কী যেন!

শুনে ওঁর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল! ভীষণ হতাশ হলেন উনি। বললেন— তুমি আমার কথা ভাব, না কি আমার চাকরি—বাকরি, উন্নতি এইসবের কথা? অনু, তোমার কাছ থেকে আমি আর—একটু সিমপ্যাথি আশা করি। তুমি বুঝতে পারছ না আমি কী একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আছি!

আমি লজ্জা পেলাম, তবু মুখে বললাম— বাঃ, তোমাকে নিয়ে ভাবি বলেই তো তোমার চাকরি, পরীক্ষা, উন্নতি সব নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়। তুমি আর তোমার সংসার এ ছাড়া আমার আর কি ভাবনা আছে বলো?

উনি ছেলেমানুষের মতো রেগে চোখ—মুখ লাল করে বললেন— আমি আর আমার সংসার কি এক?

অবাক হয়ে বললাম— এক নও?

উনি ঘনঘন মাথা নেড়ে বললেন— না। মোটেই না। সেটা বোঝো না বলেই তুমি সবসময়ে আমাকে সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে দ্যাখো, আলাদা মানুষটাকে দ্যাখো না।

হেসে বললাম— তাই বুঝি!

উনি মুখ ফিরিয়ে বললেন— তাই। আমি যে কেরানি তা তোমার পছন্দ না, আমি অফিসার হলে তবে তোমার শান্তি। এই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমি চিরকাল, এইরকম কেরানিই থাকব, তাতে তুমি সুখ পাও আর না পাও।

থাকো না, আমি তো কেরানিকেই ভালোবেসেছি, তাই বাসব।

কিন্তু উনি এ কথাতেও খুশি হলেন না। রাগ করে জানালার থাকের ওপর বসে বাইরের মরা বিকেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বেড়াতে গেলেন না। দেখলাম, জ্বর আসার আগের মতো ওঁর চোখ ছলছল করছে, মাঝে মাঝে কাঁপছে ঠোঁট, হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে তুলে এমনভাবে বসে আছেন যে রোগা দুর্বল শরীরটা দেখে হঠাৎ মনে হয় বাচ্চচা একটা রোগে ভোগা ছেলেকে কেউ কোলে করে জানালার কাছে বসিয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা পাগল। আমাদের ছেলের বয়স সাত, মেয়ের বয়স চার, আজকালকার ছেলে—মেয়ে অল্প বয়সেই সেয়ানা। তার ওপর বাসায় রয়েছে ঠিকে ঝি, ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার ছেলে—মেয়ে— এতজনের চোখের সামনে ভরসন্ধেয় কী করে আমি ওর রাগ ভাঙাই। তবু পায়ের কাছটিতে মেঝেতে বসে আস্তে আস্তে বললাম— লক্ষ্মী সোনা, রাগ করে না। ঠিক আছে, চলো কিছুদিন ঘুরে আসি। পরীক্ষা না হয় এবছর না দিলে, ও তো ফি—বছর হয়—

উনি সামান্য একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন— তবু দ্যাখো, পরীক্ষার কথাটা ভুলতে পারছ না। এ বছর নয় তো সামনের বার। কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি কোনোদিন আমি পরীক্ষা দেব না—

—দিয়ো না। কে বলেছে দিতে। আমাদের অভাব কীসের! বেশ চলে যাবে। এবার ওঠো তো—

আমার স্বামীর অভিমান একটু বেশিক্ষণ থাকে। ছেলেবেলা থেকেই উনি কোথাও তেমন আদরযত্ন পাননি। অনেকদিন আগেই মা—বাবা মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই মামাবাড়িতে একটু অনাদরেই বড়ো হয়েছেন। বি.এসসি পরীক্ষা দিয়েই ওঁকে সে—বাড়ি ছেড়ে মির্জাপুরের একটা মেসে আশ্রয় নিতে হয়। সেই মেসে দশ বছর থেকে চাকরি করে উনি খুব নৈরাশ্যবোধ করতে থাকেন। তখন ওঁর বয়স তিরিশ। ওঁর রুম মেট ছিলেন আমার বুড়োকাকা। তিনিই মতলব করে ওঁকে একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এলেন। তারপর মেসে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে? উনি খুব লজ্জা—টজ্জা পেয়ে অবশেষে বললেন— চোখ দুটি বেশ তো! তারপরই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা উঠলাম এসে লেক গার্ডেন্সের পাশে গরিবদের পাড়া গোবিন্দপুরে। যখন এই একা বাসায় আমরা দু—জন, তখন উনি আমাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতেন দুরন্ত অভিমানে— এই যে আমি অফিসে চলে যাই, তারপর কি তুমি আর আমার কথা ভাবো! কী করে ভাববে, আমি ত্রিশ বছরের বুড়ো, আর তুমি কুড়ির খুকি। তুমি আজ জানালায় দাঁড়াওনি...কাল রাতে আমি যে জেগেছিলাম কেউ কি টের পেয়েছিল! কী ঘুম বাব্বা!

ওঁর অভিমানে দুরন্ত হলেও সেটা ভাঙা শক্ত না। একটু আদরেই সেটা ভাঙানো যায়। কিন্তু এবারকার অভিমান বা রাগ সেই অনাদরে বড়ো হওয়া মানুষটার ছেলেমানুষি নেই—আঁকড়ে ব্যাপার তো নয়! এই ব্যাপারটা যেন একটু জটিল। হয়তো উনি একেবারে অমূলক কথা বলছেন না। আমি সংসারের ভালোমন্দর সঙ্গে জড়িয়েই ওঁকে দেখি। এর বাইরে যে একা মানুষটা, যার সঙ্গে অহরহ বাইরের জগতের একটা অদৃশ্য বনিবনার অভাব চলছে তার কথা তো আমি জানি না। নইলে উনি কেন লোকের ডাকে সাড়া দেন না। কেন চৌবাচ্চচার জলে হাত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন, তা আমি বুঝতে পারতাম।

রাত্রিবেলা আমাদের ছেলে—মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে উনি হঠাৎ চুপিচুপি আমার কাছে সরে এলেন। মুখ এবং মাথা ডুবিয়ে দিলেন আমার বুকের মধ্যে। বুঝতে পারলাম তাঁর এই ভঙ্গির মধ্যে কোনো কাম ইচ্ছা নেই। এ যেমন বাপি আমার বুকে মাথা গোঁজে অনেকটা সেরকম। আমি কথা না বলে ওঁকে দু—হাতে আগলে নিয়ে ওঁর রুক্ষ মাথা, আর অনেকদিনের আ—ছাঁটা চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গভীর আনন্দের একটা শ্বাস টেনে নিলাম। বুক ভরে গেল। উনি আস্তে আস্তে বললেন— তোমাকে মাঝে মাঝে আমার মায়ের মতো ভাবতে ইচ্ছে হয়। এরকম ভাবাটা কি পাপ?

কী জানি! আমি এর কী উত্তর দেব? আমি বিশ্ব সংসারের রীতি নীতি জানি না। কার সঙ্গে কীরকম সম্পর্কটা পাপ, কোনটা অন্যায় তা কী করে বুঝব! যখন ফুলশয্যার রাতে প্রথম উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেদিনও আমার শরীর কেঁপে উঠেছিল বটে। কিন্তু সেটা রোমাঞ্চে নয়— শিহরণেও নয়, বরং মনে হয়েছিল— বাঁচলাম। এবার নিশ্চিন্ত। এই অচেনা, রোগা কালো কিন্তু মিষ্টি চেহারার দুর্বল মানুষটির সেই প্রথম স্পর্শেই আমার ভিতরে সেই ছেলেবেলার পুতুলখেলার এক মা জেগে উঠেছিল। ছেলে—মেয়েরা যেমন প্রেম করে, লুকোচুরি করে, সহজে ধরা দেয় না, আবার একে অন্যকে ছেড়ে যায়— আমাদের কখনো সেরকম প্রেম হয়নি।

উনি বুকে মুখ চেপে অবরুদ্ধ গলায় বললেন— তোমাকে একটা কথা বলব কাউকে বোলো না। চলো জানলার ধারে গিয়ে বসি।

উঠলাম। ছোট্ট জানলার চৌখুপিতে তাকের ওপর মুখোমুখি বসলাম দু—জন। বললাম— বলো।

উনি সিগারেট ধরালেন, বললেন— তোমার মনে আছে, বছর দুই আগে একবার কাঠের আলমারিটা কেনার সময় সত্যচরণের কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার করেছিলাম?

—ওমা, মনে নেই! আমি তো কতবার তোমাকে টাকাটা শোধ দেওয়ার কথা বলেছি! আমার স্বামী একটা শ্বাস ফেলে বললেন— হ্যাঁ, সেই ধারটার কথা নয়, সত্যচরণের কথাই বলছি তোমাকে। সেদিন মাইনে পেয়ে মনে করলাম এ—মাসে প্রিমিয়াম ডিউ—ফিউ নেই, তা ছাড়া রেডিয়োর শেষ ইনস্টলমেন্টটাও গতমাসে দেওয়া হয়ে গেছে, এ—মাসে যাই সত্যচরণের টাকাটা দিয়ে আসি। সত্যচরণ ভদ্রলোক, তা ছাড়া

আমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ওরই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে— বড়োলোক বলা যায় ওকে— সেই কারণেই বোধহয় ও কখনো টাকাটার কথা বলেনি আমাকে। কিন্তু এবার দিয়ে দিই। তা ছাড়া ওর সঙ্গে অনেককাল দেখাও নেই, খোঁজখবর নিয়ে আসি। ভেবেটেবে বিকেলে বেরিয়ে ছ'টা নাগাদ ওর নবীন পাল লেনের বাড়িতে পৌঁছোলাম। ওর বাড়ির সামনেই একটা মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল যার কাচের ওপর লাল ক্রশ আর ইংরিজিতে লেখা— ডক্টর। কিছু না ভেবে ওপরে উঠে যাচ্ছি, সিঁড়ি বেয়ে হাতে স্টেথসকোপ ভাঁজ করে নিয়ে একজন মোটাসোটা ডাক্তার মুখোমুখি নেমে এলেন। সিঁড়ির ওপরে দরজার মুখেই সত্যর বউ নীরা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফরসা, সুন্দর মেয়েটা, কিন্তু তখন রুখু চুল, ময়লা শাড়ি, সিঁদুর ছাড়া কপাল আর কেমন একটা রাতজাগা ক্লান্তির ভারে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল ওকে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেস ফুঁপিয়ে উঠল— ও মারা যাচ্ছে, অজিতবাবু। শুনে বুকের ভিতরে যেন একটা কপাট হাওয়া লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি সত্যচরণ পূর্বদিকে মাথা করে শুয়ে আছে, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে রোদ এসে পড়েছে ওর সাদা বিছানায়। ওর মাথার কাছে ছোটো টেবিলে কাটা ফল, ওষুধের শিশি—টিশি রয়েছে, মেঝেয় খাটের নীচে বেডপ্যান—ট্যান। কিন্তু এগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। ঘরের মধ্যে ওর আত্মীয়স্বজনও রয়েছেন কয়েকজন। দু—জন বিধবা মাথার দু—ধারে ঘোমটা টেনে বসে, একজন বয়স্কা মহিলা পায়ের দিকটায়। একজন বুড়ো মতো লোক খুব বিমর্ষ মুখে সিগারেট পাকাচ্ছেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, দু—জন অল্পবয়সি ছেলে নীচু স্বরে কথা বলছে। দু—একটা বাচ্চাচাও রয়েছে ঘরের মধ্যে। তারা কিছু টের পাচ্ছিল কি না জানি না, কিন্তু সেই ঘরে পা দিয়েই আমি এমন একটা গন্ধ পেলাম— যাকে— কী বলব— যাকে বলা যায় মৃত্যুর গন্ধ। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না কিন্তু আমার মনে হয় মৃত্যুর একটা গন্ধ আছেই। কেউ যদি কিছু নাও বলত, তবু আমি চোখ বুজেও ওই ঘরে ঢুকে বলে দিতে পারতাম যে ওই ঘরে কেউ একজন মারা যাচ্ছে। যাকগে, আমি ওই গন্ধটা পেয়েই বুঝতে পারলাম নীরা ঠিকই বলেছে, সত্য মারা যাচ্ছে। হয়তো এখুনি মরবে না, আরও একটু সময় নেবে। কিন্তু আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আমি ঘরে ঢুকতেই মাথার কাছ থেকে একজন বিধবা উঠে গেলেন, পায়ের কাছ থেকে সধবাটিও। কে যেন একটা টুল বিছানার পাশেই এগিয়ে দিল আমাকে বসবার জন্য। তখনও সত্যর জ্ঞান আছে। মুখটা খুব ফ্যাকাশে রক্তশূন্য আর মুখের চামড়ায় একটা খড়ি—ওঠা শুষ্ক ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে বলল— কে? বললাম— আমি রে, আমি অজিত। বলল— ওঃ অজিত! কবে এলি? বুঝলাম একটু বিকারের মতো অবস্থা হয়ে আসছে। বললাম— এইমাত্র। তুই কেমন আছিস? বলল — এই একরকম, কেটে যাচ্ছে। আমি ঠিক ওখানে আর বসে থাকতে চাইছিলাম না। তুমি তো জানো ওষুধ —টষুধের গন্ধে আমার কীরকম গা গুলোয়! তাই এক সময়ে ওর কাছে নীচু হয়ে বললাম— তোর টাকাটা দিতে এসেছি। ও খুব অবাক হয়ে বলল— কত টাকা! বললাম— পঞ্চাশ। ও ঠোঁট ওলটাল— দূর, ওতে আমার কী হবে! ওর জন্য কষ্ট করে এলি কেন? আমি কি মাত্র পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলাম তোর কাছে? আমি তো তার অনেক বেশি চেয়েছিলাম! আমি খুব অবাক হয়ে বললাম— তুই তো আমার কাছে চাসনি। আমি নিজে থেকেই এনেছি, অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম— তোর মনে নেই? ও বেশ চমকে উঠে বলল— না, ধারের কথা নয়। কিন্তু তোর কাছে আমি কী একটা চেয়েছিলাম না? সে তো পঞ্চাশ টাকার অনেক বেশি। জিজ্ঞেস করলাম— কী চেয়েছিলি? ও খানিকক্ষণ সাদা ছাদের দিকে চেয়ে কী ভাবল, বলল— কী যেন— ঠিক মনে পড়ছে না— ওই যে— সব মানুষই যা চায়— আহা, কী যেন ব্যাপারটা। আচ্ছা দাঁড়া বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, মনে পড়বে। বলে ও ওঠার চেষ্টা করল। সেই বিধবাদের একজন এসে পেচ্ছাপ করার পাত্রটা ওর গায়ের ঢাকার নীচে ঢুকিয়ে ঠিক করে দিল। কিছুক্ষণ— পেচ্ছাপ করার সময়টায়, ও বিকৃত মুখে ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করলে শুয়ে—শুয়ে। তারপর আবার আস্তে আস্তে একটু গা ছাড়া হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল— তোর কাছেই চেয়েছিলাম না কি— কার কাছে যে— মনেই পড়ছে না। কিন্তু চেয়েছিলাম— বুঝলি— কোনো ভুল নেই। খুব আবদার করে গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে

চেয়েছিলাম, আবার ভিখিরির মতো হাত বাড়িয়ে ল্যাং—ল্যাং করেও চেয়েছিলাম, আবার চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়েও চেয়েছিলাম— কিন্তু শালা মাইরি দিল না...। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কী চেয়েছিলি! ও সঙ্গে সঙ্গে ঘোলা চোখ ছাদের দিকে ফিরিয়ে বলল— ওই যে— কী ব্যাপারটা যেন— নীরাকে জিজ্ঞেস কর তো, ওর মনে থাকতে পারে— আচ্ছা দাঁড়া— একশো থেকে উলটোবাগে গুনে দেখি, তাতে হয়তো মনে পড়বে। বলে ও খানিকক্ষণ গুনে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল— না, সময় নষ্ট। মনে পড়ছে না। আমি তখন আস্তে আস্তে বললাম— তুই তো সবই— পেয়েছিস! ও অবাক হয়ে বলল—কী পেয়েছি—অ্যাঁ—কী? আমি মৃদু গলায় বললাম—তোর তো সবই আছে। বাড়ি, গাড়ি, ভালো চাকরি, নীরার মতো ভালো বউ, অমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা দার্জিলিঙে কনভেন্টে পড়ছে। ব্যাঙ্কে টাকা, ইন্সিওরেন্স— তোর আবার কী চাই? ও অবশ্য ঠোঁটে একটু হাসল, হলুদ ময়লা দাঁতগুলো একটুও চিকমিক করল না, ও বলল— এসব তো আমি পেয়েইছি। কিন্তু এর বেশি আর—একটা কী যেন— বুঝলি— কিন্তু সেটার তেমন কোনো অর্থ হয় না। যেমন আমার প্রায়ই ইচ্ছে করে একটা গাছের ছায়ায় বসে দেখি সারাদিন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে অথচ এই চাওয়াটার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না। ঠিক সেইরকম— কী যেন একটা— আমি ভেবেছিলাম তুই সেটাই সঙ্গে করে এনেছিস! কিন্তু না তো, তুই তো মাত্র পঞ্চাশটা টাকা— তাও মাত্র যেটুকু ধার করেছিলি — কিন্তু কী ব্যাপারটা বলত, আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না—! অথচ খুব সোজা, জানা জিনিস সবাই চায়!

আমার স্বামীকে অন্ধকারে খুব আবছা দেখাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভাবসাব লক্ষ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। উনি একটু বিমনা গলায় বললেন— অনু, সত্যচরণের ওখান থেকে বেরিয়ে সেই রাত্রে প্রথম বর্ষার জলে আমি ভিজেছিলাম— তুমি খুব বকেছিলে— আর পরদিন সকাল থেকে আমার জ্বর— মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

—সত্যচরণ তার তিনদিন পর মারা গেছে। সেই কথাটা শেষপর্যন্ত বোধহয় তার মনে পড়েনি! কিন্তু আমি যতদিন জ্বরে পড়েছিলাম ততদিন, তারপর জ্বর থেকে উঠে এ পর্যন্ত কেবলই ভাবছি কী সেটা যা সত্যচরণ চেয়েছিল। সবাই চায়, অথচ তবু তার মনে পড়ল না কেন?

বলতে বলতে আমার স্বামী দু—হাতে আমার মুখ নিয়ে গভীরভাবে আমাকে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন— তবু সত্যচরণ যখন চেয়েছিল তখন আমার ইচ্ছে করছিল সত্যচরণ যা চাইছে সেটা ওকে দিই। যেমন করে হোক সেটা এনে দিই ওকে। কিন্তু তখন তো বুঝবার উপায় ছিল না ও কী চাইছে। কিন্তু এখন এতদিনে মনে হচ্ছে সেটা আমি জানি—

আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কী গো সেটা?

আমার স্বামী শ্বাস ফেলে বললেন— মানুষের মধ্যে সব সময়েই একটা ইচ্ছে বরাবর চাপা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। কোথাও কেউ একজন বসে আছেন প্রসন্ন হাসিমুখে, তিনি আমার কিছুই চান না, তবু তাঁকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার কথা। টাকা—পয়সা নয়, আমার বোধবুদ্ধি—লজ্জা—অপমান—জীবনমৃত্যু— সবকিছু। বদলে তিনি কিছুই দেবেন না, কিন্তু দিয়ে আমি তৃপ্তি পাব। রোজগার করতে করতে, সংসার করতে করতে মানুষ সেই দেওয়ার কথাটা ভুলে যায়। কিন্তু কখনো কখনো সত্যচরণের মতো মরবার সময়ে মানুষ দেখে সে দিতে চায়নি, কিন্তু নিয়তি কেড়ে নিচ্ছে, তখন তার মনে পড়ে— এর চেয়ে স্বেচ্ছায় দেওয়া ভালো ছিল।

সম্পর্ক

লাচ্চু আমেরিকায় গিয়েছিল জাহাজে। তখন তার কুড়ি বছর বয়েস। ডাকাবুকো, উচ্ছৃঙ্খল এবং বন্ধনহীন। বাপের সঙ্গে বনিবনা ছিল না, কারণ তার বাবা ননীগোপাল রাগি মানুষ। ছেলেকে শাসন করাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। লাচ্চুকে মাঝে মাঝে বদমায়েশির জন্য এমন মার দিতেন যে পরে ডাক্তার ডাকতে হত। কতবার যে বাবার মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে লাচ্চু তার হিসেব নেই।

বিশ বছর পেরোয়নি তখনও, লাচ্চু তার এক বন্ধুর দাদাকে ধরে মালের জাহাজে খালাসির চাকরি পেল। মতলব ছিল জাহাজ আমেরিকায় যদি কখনো যায় তখন লাচ্চু পালাবে।

সুযোগ এল প্রায় সাত মাস বাদে। সাত মাসে জাহাজে সি সিকনেস, আমাশা এবং দু—জন সমকামী খালাসির অত্যাচার তাকে সইতে হয়েছিল। তবে তার বাড়ির জন্য মন কেমন করত না। বরং একটা জ্বালা ছিল, একটা প্রতিহিংসাপরায়ণতাও।

জাহাজটা ছিল স্প্যানিশ। হামবুর্গ থেকে মাল নিয়ে সাত মাসের মাথায় নিউইয়র্কে পৌঁছোল। পৌঁছোনোর কথা ছিল না। আটলান্টিকে প্রবল ঝড়ে জাহাজ যায়—যায় হয়েছিল। তিন দিন টানা ঝড়। লাচ্চু বাঁচার আশাই করেনি। যখন নিউইয়র্কে পৌঁছোল তখন মনে হল, বেঁচে যখন আছি তখন একটা কিছু করতেই হবে।

ভয়ডর জাহাজেই কেটে গিয়েছিল লাচ্চুর। অচেনা, অজানা জায়গা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বিপদের আশঙ্কা, ধরা পড়ার সম্ভাবনা এসব নিয়ে সে বিশেষ মাথা ঘামাল না। তবে হুট করে না পালিয়ে সে দিনতিনেক অপেক্ষা করল। তারপর একদিন ডকে নেমে সুযোগ বুঝে ভিড়ে মিশে গেল।

দেশটা কঠিন। চট করে যে এখানে কিছু করে বা হয়ে ওঠা যাবে না এটা সে জানত। আর জানত কোনো গির্জা—টির্জা বা মিশনারির আশ্রয় নিলে বেঁচে যাবে। প্রথম দিনদুয়েক মাইনের টাকা ভেঙে খেল আর বড়ো বড়ো ফ্লাই ওভারের নীচে শুয়ে রাত কাটাল। ভাগ্য ভালো যে তখন শীতকাল ছিল না।

নিউইয়র্ক শহরে পায়ে হেঁটে ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন বাস্তবিক ভাগ্যক্রমে একটা হোম ফর দি ডেস্টিটিউটস পেয়ে যায়। তারা যে তাকে দু—হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল তা নয়, তবে সে কাজকর্ম করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ঠাঁই হয়ে গেল।

কাজকর্ম মেলাই ছিল। লাচ্চু খাটত খুব। মাসখানেক পরে ইতালিয়ান একটা দোকানে চাকরি হল তার। থাকত নিউইয়র্কের কুখ্যাত বস্তিতে, যেখানে হেন পাপ নেই যা হয় না। এখানেই সে শেখে, মার্কিনিরা যেসব

জিনিস ফেলে দেয় সেগুলো কুড়িয়ে এনে কিছু লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়।

লাচ্চুর মাথা পরিষ্কার। লেখাপড়ায় মাথাটা না খুললেও তার প্রিয় হল যন্ত্রপাতি, কলকবজা ইত্যাদি। মাঝে মাঝে সে জাঙ্ক থেকে টিভি বা টু—ইন—ওয়ান কুড়িয়ে এনে খুলে ফেলে ভিতরকার মেকানিজম বুঝবার চেষ্টা করত। দিনকতক চেষ্টার পর সে একটা টিভি সেট সারিয়ে ফেলল। মেরামত করল একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর এবং একটা বাতিল ক্যামেরা। আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল তার।

আমেরিকানরা বেশিরভাগ জিনিসই খারাপ হলে ফেলে দিয়ে নতুন একটা কেনে। এই যে গারবেজ করার প্রবণতা এর কারণ অনুধাবন করে লাচ্চু বুঝল, জিনিস খারাপ হলে তা সারাতে যে মজুরি লাগে তা ভয়াবহ। তার চেয়ে নতুন কেনাই লাভজনক।

লাচ্চু একটা হোম সার্ভিস খোলার চেষ্টা করতে লাগল। টিভি বা ছোটোখাটো ইলেকট্রনিক জিনিস খারাপ হলেই ফেলে না দিয়ে অল্প পয়সায় সারিয়ে নিতে আমেরিকানদের কেমন লাগবে? সব আমেরিকানই তো আর বড়োলোক নয়।

কষ্টে কিছু টাকা জমিয়ে এবং ফাঁকে ফাঁকে সারাইয়ের কাজ লিখে লাচ্চু তৈরি হতে লাগল। সে আলাপি এবং মিশুকে ছেলে। টকাটক বেশ কিছু জানপয়চান হয়ে গেল তার। যন্ত্র সারানোর ডাকও আসতে লাগল ঘনঘন। সেইসঙ্গে ডলার।

দু—বছর বাদে জেনারেল অ্যামনেস্টি ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমেরিকান নাগরিক হয়ে গেল। বাঁচোয়া। ব্রংকস বরোতে একটা ঘিঞ্জি পাড়ায় শেয়ারে একটা দোকানঘর করল সে। সেখানে পুরোনো যত ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে পার্টস খুলে নিয়ে গুছিয়ে রাখত সে। পরে অন্য সব মেশিনে সেগুলো লাগাত।

মজা হল আমেরিকানরা সব জিনিসই খারাপ হলে ফেলে দিতে চায় না। কোনো জিনিসের সঙ্গে হয়তো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কাজেই লাচ্চু যখন স্থানীয় একটা দৈনিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিল তখন তার দোকানে বেশ খদ্দের আসতে লাগল, এবং ডলারও।

নর্মা নামে একটি মার্কিন মেয়েকে সে বিয়ে করে তেইশ বছর বয়সে। কিন্তু মেয়েটা বড্ড উড়নচণ্ডী। বিয়েটা আপোশে ভেঙে গেল এক বছর বাদে। দ্বিতীয় বিয়েটা সে করল পঁচিশ বছর বয়সে। ছাব্বিশে সেটাও ভাঙল। পরের বিয়েটা সে করল একটা বাঙালি মেয়েকে। দেখা গেল, মেয়েটা পাগল। বাপ—মা পাগলামির কথা চেপে রেখে বিয়ে দিয়েছিল যখন মেয়েটার কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিকত্ব ফিরে এসেছিল। সাতাশ বছর বয়সের মধ্যেই তিন—তিনটে বিয়ে ও বিচ্ছেদ থেকে লাচ্চুর ধারণা হল, বিয়ে তার কপালে নেই, ও তার সইবে না। সে টাকা রোজগারে মন দিল।

উনত্রিশ বছর বয়সে লাচ্চু এখন মাঝারি ধনী। তার তিনটে দোকান বেশ রমরম করে চলে। লাচ্চুর সঙ্গে একদিন দেখা হল পুরোনো এক বন্ধুর। সে আমেরিকায় পড়তে এসেছিল। লাচ্চুর সঙ্গে বাড়ির কোনো যোগাযোগই ছিল না। শমিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ম্যানহাটনের রাস্তায়। অনেক কথার পর অবশেষে বন্ধু শমিত বলল, বাড়ির কোনো খবর রাখিস না?

না। কেন বল তো!

তোর বাবা চার বছর আগে মারা গেছেন।

সে কী!

তুই পালিয়ে যাওয়ায় শক পেয়েছিলেন তো। তাই—

লাচ্চুর মনটা তার অত্যাচারী বাবার শোকে বেশ কাতর হয়ে পড়ল। চোখে জল এল। ঠিক কথা যে, ছেলেবেলা থেকে বাবার আদর বা প্রশ্রয় সে পায়নি। রাগি বাবা কারণে—অকারণে বেধড়ক মারত। এও সত্যি বাবার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই সে বাড়ি থেকে পালায়। বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদও সেইখানেই ঘটে যায়। তবু আজ হঠাৎ মৃত্যুসংবাদটা পেয়ে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল তারও।

সে বলল, মা কি বেঁচে আছে?

শমিত একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আছে।

কিন্তু শমিতের মুখের ভাব অন্য কথা বলছে। লাচ্চু বলল, তুই একটা কিছু চাপছিস। খুলে বল।

তুই পালিয়ে আসার পর তোর মা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি—বাড়ি ঘুরে তোকে খুঁজত। সারা রাত সদর দরজা খুলে বসে থাকত। তারপর একদিন পিছনের পুকুরে ভোরবেলা তার লাশ পাওয়া যায়।

লাচ্চু অস্থির হল না। কিন্তু কাঁদল। বাবার মৃত্যু নয়, মায়ের মৃত্যুর জন্য সে সরাসরি দায়ী। বলল, বাবা কি আবার বিয়ে করেছিল?

হ্যাঁ। তো সেই মা বেঁচে আছে।

আমার ছোটো বোনটা! তার খবর কী?

বিয়ে হয়ে গেছে।

তারা কি জানে যে, আমি এখানে আছি?

শমিত মাথা নাড়ল, না। তোর খবর কেউই তো জানে না। সবাই ধরেই নিয়েছে, হয় তুই বেঁচে নেই, না হলে সাধু হয়ে গেছিস। কিন্তু তুই তো দেখছি আমেরিকায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছিস।

অনেক লড়াই করতে হয়েছে, ধৈর্য ধরতে হয়েছে।

শমিত একটু হতাশার গলায় বলল, আমি তো অনেক লেখাপড়া শিখে এসেছি, এখানেও পিএইচ ডি করলাম, কিন্তু আমার যা সাকসেস বা টাকা হয়েছে বা হবে তুই তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছিস।

কুইনসে একটা বাড়ি কিনেছে লাচ্চু। বেশ বড়ো বাড়ি। দু—খানা দামি গাড়ি আছে তার। শমিতকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে একদিন আটকে রাখল সে।

শমিত বলল, এত বড়ো বাড়িতে একা থাকিস, বিয়ে করিসনি কেন?

করেছি। তিনবার। তারপর নাক—কান মলেছি, আর বিয়ে নয়।

কেন রে? বিয়ে কি টিকল না?

প্রথম দুটো বউ ছিল আমেরিকান। প্রথমটা তো একেবারে দুশ্চরিত্র। দ্বিতীয়টার ছিল টাকার খাঁই। বছরখানেকের মধ্যেই টাকাপয়সা একেবারে দুয়ে নিয়েছে। তিন নম্বরটা পাগল।

বলিস কী! তোর কথা শুনে তো বিয়ের কথা ভাবতেই ভয় করছে।

এ দেশে বিয়ে করিস না। দেশে গিয়ে করিস।

আজকাল বাঙালিরাও কি আর ভালো আছে?

তা হয়তো নেই, কিন্তু তারতম্য হয়তো আছে। তবে আমার মনে হয়, বিয়ে জিনিসটাই বাজে। তুই তা হলে সিঙ্গল থাকবি?

অবশ্যই।

তোর গার্ল ফ্রেন্ড আছে?

না, তাও নেই। আমার মাথায় কাজের চিন্তা এত প্রবল যে সেক্স নিয়ে ভাবিই না।

তা হলে তোর রাত কাটে কী করে?

লাচ্চু হাসল, মোষের মতো ঘুমোই। শোন, আমার একটা বউয়ের দরকার ছিল বটে, কিন্তু বেড পার্টনার হিসেবে নয়। বউ হতে পারত আমার ব্যবসার মস্ত সহায়। আমার বিশ্বাসযোগ্য একজন বন্ধু। নইলে একটা মেয়েমানুষকে তার শরীরের জন্য পুষব এই আইডিয়াটাই আমার ভালো লাগে না।

যাই হোক, তোর একজন পার্টনার কিন্তু দরকার।

সে পরে ভাবা যাবে। আমার কাছে দু—দিন থাক তা হলেই বুঝবি আমার দিন কেমন উড়ে যায়। রোমান্সের ছিটেফোঁটাও নেই। তবে টাকা আছে।

তুই কি অনেক টাকা করেছিস?

এখানে অনেক মানেও তো যথেষ্ট নয়। নিউইয়র্কে চারদিকে চেয়ে টাকার কী খেলাটাই না দেখতে পাই। না রে, আমেরিকার তুলনায় আমার কিছুই সম্বল নয়। তবে চলে যায়।

লাচ্চু নিজে কথা বলতে—বলতে বারবার মা—বাবার কথা ভাবছিল।

শমিত বলল, তুই আজ খুব আনমনা।

লাচ্চু মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। অনেকদিন ডলার ছাড়া আর কিছুই চিন্তাই করিনি। এখানে এসে কষ্ট আর লড়াই কম করতে হয়নি। মা—বাবা বা বোনটার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ত বটে কিন্তু টাকা ছিল না। আজ হঠাৎ তোর মুখে মা আর বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে হঠাৎ কেমন রুটলেস লাগছে। বাংলায় বোধহয় ছিন্নমূল বলে।

শমিত তিন নম্বর দুঃসংবাদটা দিল বিদায় নেওয়ার আগে। লাচ্চু তাকে বলেছিল, দেখ, দুনিয়ায় তো আমার আপনজন বলতে এখন শুধু বোনটা। তার ঠিকানা জানিস?

শমিত একটু দ্বিধায় পড়ল। তারপর বলল, দেখ, তোকে পরপর খারাপ খবর দিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। তবু দিচ্ছি। তার কারণ, লক্ষ করলাম তুই বেশ শক্ত মানুষ। শোক—সংবাদগুলো তোকে কাহিল করেনি তেমন।

লাচ্চু উদবেগের সঙ্গে বলে, তার মানে কী? সাবিত্রী কি বেঁচে নেই?

না। বিয়ের এক বছর বাদে বাচ্চচা হতে গিয়ে ইনফেকশানে মারা যায়।

লাচ্চু মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, মা—বাবার তবু বয়স হয়েছিল, কিন্তু সাবুটার তো অল্প বয়স। হ্যাঁ রে, তিন—তিনজন মরে গেল? এরকমও হয় নাকি?

ব্যাড লাক রে ভাই, কী করবি?

তা হলে কি আমার আর কেউ নেই?

ভারচুয়ালি না। তবে যদি সৎমাকে ধরিস তা হলে বলতে হবে, আছে।

দূর! সৎ মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক কীসের?

শমিত কথাটা স্বীকার করল। বলল, হ্যাঁ, সৎমায়েদের সম্পর্কে আমরা ভালো কথা কখনো শুনিনি বিশেষ। তবে এই ভদ্রমহিলাকে আমি দেখেছি। খুবই রোগাভোগা মানুষ। দুটো বাচ্চচা, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। তোর বাবা তো তোর বোনের বিয়ে দিতে গিয়েই ফতুর হয়ে যান, ফলে এদের জন্য বিশেষ কিছু রেখে যাননি। ভদ্রমহিলা খুব সামান্য একটা আয়া বা ওই ধরনের কাজ করেন। খুব কষ্ট।

লাচ্চুর ভিতরে কথাগুলো ঢুকলই না। তার চোখে আজ বারবার জল আসছিল। অতীতটা একেবারেই মুছে গেল। শিকড়ের আর কোনো বন্ধন নেই। তিনটে মুখ বারবার ঘুরেফিরে স্মৃতিতে ভেসে উঠছিল। মা, বাবা, সাবি।

এক উইক এন্ডের শেষ রবিবার বিকেলে শমিত চলে যাওয়ার পর একা হল লাচ্চু। একা হয়েই বুঝতে পারল, কতখানি একা সে। চারদিকটা যেন খাঁ খাঁ করছে। ধু—ধু করছে। কুড়ি বছর বয়সে যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল তখন লাচ্চুর পিছুটান ছিল না। সামনে ছিল শুধু অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, বুকে ছিল বেপরোয়া সাহস এবং আত্মনির্ভরতা। উনত্রিশ বছর বয়সে এখন লাচ্চু আর তা নেই। আমেরিকার কাজ পাগল সমাজে এমনিতেই মানুষ একটু একা। তার ওপর এখানে পারিবারিক বন্ধন জিনিসটা তেমন দৃঢ় নয়, তাই মানুষ আরও একা। কাজ নিয়ে থাকে, তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। লাচ্চু আমেরিকান নাগরিক বটে, কিন্তু চরিত্রে তা নয়। ফলে তার মধ্যে একটা হঠাৎ অসহায় একাকিত্ব আজ বারবার গুমরে উঠছে। কুইনসের এই মাঝারি বাড়িটা যেন বড্ড ছমছম করছে। লাচ্চু রাতে খেল না। অনেক রাত অবাধ কাঁদল। ফুঁপিয়ে—ফুঁপিয়ে।

শেষ রাতে একটু ঘুমোল। সকালে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিত্যদিনের কাজে। কাজ, কাজ ছাড়া এই একাকিত্বকে ভুলে থাকবার কিছু নেই। সে মেরামতির কারবার একজন গুজরাটিকে বিক্রি করে দিয়েছে।

এখন সে কম্পিউটারে ব্যবসা করে। বেশিরভাগই কন্ট্রাক্ট মেইনটেনেন্স। তাতে তার প্রচুর ডলার আয় হয়।

লাচ্চুর সংসার নেই, মদ খায় না, ফুর্তি করে না, বেড়াতে ভালোবাসে না। সুতরাং তার ডলার শুধু ব্যাঙ্কে জমা হয়। কিছু খাটে শেয়ার বাজারে। এই অর্থাগমটা তার ক—দিন হল অর্থহীন লাগছে।

মাসখানেক বাদে সে শমিতকে ফোন করল। এ—কথা সে—কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সেই ভদ্রমহিলার নাম কী বল তো!

কোন ভদ্রমহিলা?

আমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের কথা বলছি।

কেন বল তো?

ভাবছি, ভদ্রমহিলা কষ্টে আছেন, কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব।

শমিত উৎসাহের গলায় বলল, ভালোই হবে রে, এটা বেশ ভালো একটা ডিসিশন নিয়েছিস। তবে একটা কথা বলে রাখি তোকে, উনি কিন্তু খুব পারসোনালিটিওলা মহিলা। সহজে কারও কাছে হাত পাতেন না। তোর বাবা মারা যাওয়ার পর অনেকেই ওকে পরামর্শ দিয়েছিল কোনো এম.এল.এ—র কাছে যেতে। উনি যাননি। একটা পুজো কমিটি থেকে কিছু সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, তাও নেননি আত্মসম্মানবোধ খুব বেশি। যদি টাকা পয়সা পাঠাস তাহলে একটা নরম করে চিঠি দিস।

যদি রিফিউস করে তাহলে?

সম্ভাবনা আছে।

তা হলে থাক বাবা, পাঠানোর দরকার নেই।

তবু নামটা জেনে রাখ। ওঁর নাম সবিতা রায়।

লাচ্চু প্যাডে নামটা নোট করে নিল বটে, কিন্তু সেটা যেকোনো কাজে লাগবে না তাও মনে হল তার।

লাচ্চুর হাড়ভাঙা পরিশ্রম এবং ছোটাছুটির মধ্যে আবার হারিয়ে গেল সবিতা রায় এবং তার দুই বাচ্চার কথা। মনে রাখার কথাও নয় লাচ্চুর। নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটির সঙ্গে লাচ্চুর মাখামাখি না থাকলেও সম্পর্ক আছে। বাঙালিদের অনুষ্ঠানে চাঁদা দেয়, বাংলা নাটক দেখতে যায়, বাঙালি গায়ক—গায়িকা এলে টিকিট কেটে গান শুনে আসে, দুর্গাপুজো বা বঙ্গ সম্মেলনেও যায় ফি বছরই। তবে এসব বাঙালিয়ানার ব্যারাম তার কাছে গভীর কিছু নয়। কুইনসে উইক এন্ডের এক দুর্গাপুজোয় হাজির ছিল লাচ্চু। বাঙালিদের বেশ সুন্দর একটা জমায়েত। খিচুড়ি রান্না হচ্ছে, চমৎকার নিরামিষ তরকারির গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। পেপার মাসের তৈরি দুর্গামূর্তির সামনে রেকাবিতে ডলার প্রণামী জমা হচ্ছে। মন্ত্রপাঠ, অঞ্জলি, কোনোটাই বাদ নেই। সেই জমায়েতে এক বৃদ্ধ এসে তাকে ধরলেন, তুমি লাচ্চু না?

লাচ্চু চিনল। তাদের পাড়ার মোহিতবাবু। ছেলে আমেরিকায় এসেছে বছরদুয়েক। সেই সুবাদেই এসেছেন। এ—কথা সে—কথার পর বললেন, তুমি যে বেঁচে আছ এটাই তো জানা ছিল না আমাদের। তোমার পুরো ফ্যামিলিটাই তো শেষ। তবে সবিতা আছে, সে বড়ো ভালো মেয়ে।

লাচ্চু বলল, আমি তো ওঁকে চিনি না।

না চেনারই কথা।

ওঁরা খুবই কষ্টে আছেন?

কষ্ট বলে কষ্ট? তোমার বাবা তো কিছু রেখে যাননি। সবিতারও বাপের বাড়ি বলতে কিছু নেই, এক মামার কাছে মানুষ। খুবই কষ্ট ওদের। বাড়িটা আছে বলে রক্ষে। নইলে ভেসে যেত।

লাচ্চু আবার ভাবনায় পড়ল। তার অনেক টাকা। যদি বিয়ে না করে বা পুষ্যি না নেয়, তা হলে তার মৃত্যুর পর টাকাপয়সার গতি কী হবে কে জানে! না, সবিতা রায় বা তার ছেলে—মেয়ে তার আপনজন নয়, তবু ক্ষীণ একটা সম্পর্ক আছে বোধ হয়।

অনেক ভাবল সে। তারপর তার পার্টনারকে ব্যবসা চালানোর ভার দিয়ে সে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে ভারতমুখী প্লেনের টিকিট কেটে উড়ে গেল।

দুই

সবিতার রোগাভোগা শরীরের মধ্যে প্রকট মাত্র দুটি চোখ। লোকে বলে সবিতার চোখ নাকি জ্বলে। সবিতা অবশ্য সে—খবর রাখে না। তার জীবনটা কেটেছে আদ্যন্ত ঘৃণা ও আক্রোশের এক বলয়ের মধ্যে। শিশুকালে পিতৃ—মাতৃহীন সবিতা ছিল মামার গলগ্রহ। আক্ষরিক অর্থেই তাকে লাথি—ঝাঁটা খেয়ে বড়ো হতে হয়েছে। সে ছিল কার্যত মামার বাড়ির বিনা পয়সার ঝি। খাণ্ডার মামি দুনিয়ার যত ঝাল ঝাড়ত তারই ওপর। মামাও যে ভালো কিছু ছিল তা নয়। সবিতাকে ক্লাস ফোর অবধি পড়িয়েছিল মামা। তার পর স্কুল থেকে ছাড়িয়ে পুরোপুরি গৃহকর্মে লাগিয়ে দেয়। সবিতার প্রাণের জোর ছিল বটে। নইলে একবার কলেরা, একবার টাইফয়েড এবং সবশেষে প্লুরিসি হয়েও সে বেঁচে যায়। প্রতিবারই তাকে পাঠানো হয়েছিল অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালের জেনারেল বেড—এ। টি বি হয়েছিল আঠারো বছর বয়সে। মামা বা মামি কেউই তাকে ঘরে ঠাঁই দিতে রাজি ছিলেন না আর। সবিতা কার্যত আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। শেষে যাদবপুরের টি বি হাসপাতালে ঠাঁই হয়। এবং আশ্চর্যের বিষয়, নিছক প্রাণশক্তির জোরেই সে আরোগ্য লাভ করে। মামা—মামি সন্দিহান থেকেও তাকে ফের ঘরে ঠাঁই দেন বটে, কিন্তু খুশি হয়ে নয়। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তার বিয়ের জোগাড় হল। পাত্রর বয়স ছাপ্পান্ন, বিপত্নীক।

বিয়ের আনন্দ কিছু ছিল না, শুধু স্থান বদলের স্বস্তিটা আশা করেছিল সবিতা। এই বয়স্ক পুরুষের কাছ থেকে প্রত্যাশাই বা কী ছিল তার? লোকটাকে ভালোবাসার কোনো চেষ্টা সে করেনি, সম্ভবও ছিল না। তবে লোকটা দুঃখী মানুষ। ছেলে নিরুদ্দেশ, বউ মারা গেছে, ঘরে বয়সের মেয়ে। এই মেয়ে সাবিত্রীর বিয়ে দিতে হবে বলেই লোকটা সবিতাকে বিয়ে করেছিল পাঁচ হাজার টাকা নগদ নিয়ে। সেই পাঁচ হাজার আর সবিতার দেড় ভরি গয়না নিয়ে আর কিছু ধারকর্জ করে সাবিত্রীকে পার করল। তারপর বছর না ঘুরতেই সাবিত্রী গেল, তারপর লোকটাও গেল। রেখে গেল দুটো সন্তান।

ঘৃণা আর আক্রোশ ছাড়া সবিতা জীবনে কিছুই পায়নি। এখনও সে মানুষের কাছ থেকে তাই পায় এবং তাতেই স্বস্তি বোধ করে। মানুষ তাকে দয়া বা করুণা করলেই বরং সে ভয়ংকর অস্বস্তি বা অপমান বোধ করে। ও তার অভ্যস্ত জিনিস।

তথাকথিত স্বামীর মৃত্যুর পর সবিতা তথাকথিত বিধবা হল। সধবা আর বিধবার তফাত সামান্যই। দুর্দশা বা দুর্গতি যেমন ছিল তেমনই রইল। দুটো সন্তান তার কোনো ভালোবাসার ফসল নয়। তবু সন্তান আঁকড়েই বেঁচে থাকার একটা চেষ্টা করতে হল তাকে। লেখাপড়া জানা নেই, কোনো হাতের কাজটাজও শেখেনি, চাকরিটা হবে কীসে? সবিতা কারও কাছে হাত পাতল না, অযাচিত সাহায্য ফিরিয়ে দিল এবং চাকরি খুঁজতে লাগল। মেয়েটা ছয় বছরের, ছেলেটা পাঁচ। ছয় বছরের মেয়ে প্রয়োজনের তাগিদে শিশু বয়েসেই সাবালিকার মতো দায়িত্ব নিতে শিখে গেল। প্রয়োজনে মানুষ সব পারে। তার হেফাজতে ছেলেকে রেখে সবিতা বাইরে বেরুতে লাগল। কাজ জুটল আয়ার। এক হাসপাতালে।

আয়ার কাজে বাঁধা মাইনে নেই। কাজ পেলে বাঁধা রেটে টাকা। কখনো—সখনো বকশিশ বা শাড়িটা জামাটা পাওয়া যায়। গ্রাসাচ্ছাদন চলে বটে তার। কিন্তু এত কষ্ট যে বলার নয়। সবিতাকে পাঁচ—দশ পয়সারও হিসেব করে চলতে হয়। অসুখ বিসুখ হলে অগাধ জল।

তার তথাকথিত স্বামী বাড়িটাই যা রেখে গেছেন। ছোটো এবং পুরোনো দু—ঘরের এই বাড়িটুকুই এই গোটা দুনিয়ায় তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তবে পাড়া—পড়শিরা অনেকেই তাকে ভয় দেখায়, আছ তো বাপু ভালোই, কিন্তু লাচ্চু যদি ফিরে আসে তা হলে এই বাড়িতে কি থাকতে পারবে? সে তোমাকে তাড়িয়ে ছাড়বে। ভীষণ বদমাশ ছেলে। লাচ্চুর কথা সে তার তথাকথিত স্বামীর কাছে শুনেছে। হ্যাঁ, লাচ্চু

মস্ত দাবিদার। যদি ফিরে আসে এবং সবিতাকে তাড়ায় তাহলে সে কোথায় যাবে তা ভেবে পায় না। এই একটা ভয় তার আছে। লাচ্চু। কেউ কেউ বলে, সে সাধু হয়ে গেছে, কেউ বলে মরে গেছে, কেউ বলে সে জীবনে উন্নতি করে ফেলেছে। লাচ্চুর আসল খবর কারও জানা নেই। এবং সেইটেই চিন্তা এবং ভয়ের বিষয়।

পাশের বাড়িটা পরেশ সাহার। পরেশবাবু ইদানীং হঠাৎ ব্যবসা—বাণিজ্যে উন্নতি করেছে। ইদানীং তিনি মাঝে মাঝে সবিতার কাছে বাড়িটা কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন। দামটা খারাপ দেবেন না। কিন্তু সবিতা রাজি হয়নি। তার কারণ টাকা সে রাখতে পারবে না। মাঝখান থেকে পৃথিবীর শেষ আশ্রয়টুকু হাতছাড়া হবে। তার ওপর এ বাড়ি তো আর একার নয়। লাচ্চুরও ভাগ আছে। পরেশবাবু অবশ্য বলেছেন, লাচ্চু বেঁচে নেই বউমা। যদি থাকেও তা হলে তার দায় আমার। আমি ওর সঙ্গে বুঝে নেব।

পরেশ সাহাকে ইদানীং একটু ভয় পাচ্ছে সবিতা। টাকার ক্ষমতা যে অনেক তা সে জানে। পরেশ সাহা ইচ্ছে করলে তাকে যে—কোনো উপায়ে উচ্ছেদ করে দিতে পারে।

কিন্তু সবিতা তো কখনো স্বস্তিতে থাকেনি। তার সারা জীবনটাই তো নানা বিরুদ্ধতার সঙ্গে বেঁচে থাকা মাত্র। ভয় সে পায় বটে, কিন্তু খুব একটা অসহায় বোধ করে না। বস্তি আছে, ফুটপাত আছে। বাচ্চচা দুটোকে নিয়েই যা চিন্তা।

খুব সম্প্রতি মাত্র দু—দিন আগে পরেশ সাহার লোক বাসু বলে একটা ছেলে এসেছিল। সে একটু চোখ রাঙিয়ে ঘর দেখতে গিয়েছিল।

সন্ধেবেলা ফিরে সে এখন জিরোচ্ছে একটু। মেয়েটা পড়তে বসেছে। ছেলেটা তার কাছ ঘেঁষে বসে আছে। তার ছেলে এবং মেয়ে দু—জনেই শান্ত। ওইটুকু বাচ্চচা, তবু তারা মায়ের শ্রান্তি ক্লান্তি হতাশা এবং মেজাজ টের পায়।

দরজায় কড়া নাড়তেই মেয়েটা উঠে গিয়ে খিল খুলল।

দরজার বাইরে একজন ভালো পোশাক—পরা যুবক দাঁড়িয়ে। দাড়ি আছে, গোঁফ আছে, চোখে কালচে চশমা, হাতে একটা সুটকেস।

বলল, ভিতরে আসতে পারি?

সবিতার চোর ডাকাতের ভয় নেই। চোর এলে বরং সবিতার পক্ষে লজ্জারই ব্যাপার। তবে এরকম সম্ভ্রান্ত চেহারার যুবককে দেখে সন্ত্রস্ত হল। তাড়াতাড়ি উঠে বলল, আসুন।

ছেলেটা ঘুরে ঢুকে বলল, আমি কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি।

সবিতা বলল, তার মানে?

ছোকরা সুটকেসটা নড়বড়ে টেবিলটার ওপর রেখে খুলে ফেলল। তারপর একগাদা জিনিস বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগল। চকোলেট বার, সিরিয়াল, টিনের দুধ, খেলনা, সেন্ট, সাবান কত কী।

সবিতা সভয়ে বলল, এসব কী!

ছেলেটা হেসে বলল, আমি একটা বড়ো কোম্পানির সেলসম্যান। আমরা এসব জিনিস তৈরি করি। এগুলো ফ্রি স্যাম্পল। আপনাকে দাম দিতে হবে না। যদি ব্যবহার করে পছন্দ হয় তবেই কিনবেন।

সবিতা কাঁদো—কাঁদো হয়ে বলল, আমরা বড্ড গরিব। ওসব জিনিস কেনার সাধ্য আমাদের নেই। আপনি নিয়ে যান।

ছেলেটা হেসে বলল, তাতে কী? না কিনলে, না কিনবেন। কোম্পানি তো এগুলো ফ্রি—ই দিচ্ছে।

ছেলেটা চারদিকে একটু চেয়ে বলল, এটা কি আপনার বাড়ি?

হ্যাঁ, একরকম তাই। আমার স্বামীর বাড়ি। তবে কতদিন রাখতে পারব জানি না।

কেন বলুন তো?

আমরা গরিব তো, পয়সাওয়ালারা তুলে দিতে চাইছে। অনাথা বিধবা, কিছু তো করার নেই।

ও! আচ্ছা, আজ আসি।

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর সবিতা টেবিলের কাছে এসে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছ। মাখন, চিজ থেকে শুরু করে বিস্কুট, টিনের খাবার, এসব ছাড়াও একটা হাতঘড়ি অবধি দিয়ে গেছে। এরকম হয় নাকি? সে স্বপ্ন দেখছে না তো!

ছেলে—মেয়েরা জীবনে এত সুখাদ্য খায়নি। সবিতার রাতে ভালো করে ঘুম হল না। বারবার ছেলেটার দাড়িওলা মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

দু—দিন বাদে পরেশ সাহা এক সকালে এসে হাজির। মুখে বিরক্তি। বউমা, এসব কী? বাড়ি বিক্রি করবে না তো সাফ জানিয়ে দিলেই হত। পুলিশে খবর দিতে গেলে কেন?

সবিতা অবাক হয়ে বলল, খবর দিইনি তো!

না দিলে তারা এসে আমাকে এমনি শাসিয়ে যায়?

আরও দিনসাতেক পরে ছেলেটা এক সন্ধেবেলা এসে হাজির। আজও হাতে সুটকেস।

সবিতা তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে একটা চেয়ার পেতে বসতে দিয়ে বলল, সেদিন আপনি ভুল করে একটা ঘড়ি রেখে গেছেন।

না, ভুল করে নয়।

ভুল করে নয়?

না, ভুল করে রাখব কেন?

আপনার কোম্পানি কি ঘড়িও তৈরি করে?

ছেলেটা হেসে বলল, না। তবে সেলস প্রমোশনের জন্য কাস্টমারকে ছোটোখাটো উপহার দেওয়া হয়।

কিন্তু আমি তো কাস্টমার নই!

আমরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করি। আপনার নাম আমাদের কম্পিউটারই সাজেস্ট করেছে।

এসব কথার অর্থ জানে না সবিতা। তবে সে আজ এই সুঠাম যুবকটিকে ভালো করে দেখল। স্বাস্থ্যবান, ছমছমে চেহারা, সবিতার মতোই বয়স হবে। হ্যাঁ, এরকম একটি যুবকের সঙ্গেই তো বিয়ে হতে পারত তার। এক অক্ষম, গরিব, বৃদ্ধ দোজবরের সঙ্গে নামমাত্র বিয়ে কেন হল তার? সবিতার ব্যর্থ যৌবন কোনো পুরুষকেই আকাঙ্ক্ষা করতে পারেনি ভয়ে। আজ অযাচিত সাহায্যকারী এই যুবকের দিকে মুগ্ধ চোখে একটু চেয়ে রইল সে। লাচ্চুও চেয়েছিল। মহিলার বয়স ত্রিশ—একত্রিশ হতে পারে। দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবী রসকষহীনতাকে বাদ দিলে মহিলা সুশ্রীই। স্বাস্থ্য ফিরলে এঁর রূপ উপেক্ষা করার মতো হবে না।

লাচ্চু সুটকেস খুলে বলল, আজ কিন্তু পোশাক—আশাক আছে। রেখে যাচ্ছি।

যেসব জিনিস সুটকেস থেকে বেরোল তা দেখে আতঙ্কিত সবিতা বলল, এসব কী করছেন? আমাকে বিক্রি করলেও যে দাম উঠবে না।

কয়েকটা শাড়ি, ফ্রক, জামা—প্যান্ট নামাল লাচ্চু। তারপর সবিতার দিকে ফিরে বলল, আপনার বাড়িটার সংস্কার দরকার।

হ্যাঁ। কিন্তু আমার সাধ্য তো নেই।

শুনুন। আমাদের ফার্মটা হচ্ছে ফ্রেন্ড অফ দি আনলাকিজ। অর্থাৎ যাদের ভাগ্য খারাপ আমাদের ফার্ম তাদের সাহায্য করে। কিন্তু সেটা দয়া বা করুণা নয়। আপনাকে কোম্পানির তরফ থেকে কুড়ি হাজার টাকার একটা লোন দিয়ে যাচ্ছি। এখন নয়, দশ বছর পর থেকে আপনি লোনটা ধীরে ধীরে শোধ করবেন।

সবিতার কেমন যেন ধন্ধ লাগছিল। সে হঠাৎ বলল, আমার এসব কথা কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। এরকম হয় না।

হয়। হবে না কেন?

সবিতার আত্মসম্মানবোধ প্রবল। কিন্তু এই সুঠাম যুবকটির দিকে চেয়ে আজ তার বুকে একটা অদ্ভুত দোলা আর আবেগ কাজ করছে। সে একে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না। সবিতার চোখে জল এল। সে স্খলিত কণ্ঠে বলল, আপনি আমাকে দয়া করছেন।

একদম নয়। আমার সঙ্গে লোনের কাগজপত্র আছে। আপনি পড়ে সই করে দিন।

একটুও বিশ্বাস করল না সে ছেলেটাকে। কিন্তু এক চোরা আনন্দে বুক ভেসে যাচ্ছিল তার এমনকী হতে পারে যে, এই যুবক তার প্রেমে পড়েছে? সবিতা সই করল এবং করকরে কুড়ি হাজার টাকা নিল।

দু—দিন বাদে ছেলেটা একটা ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে এল সকালবেলায়।

চলুন, আপনাদের একটু আউটিং—এ নিয়ে যাই।

সবিতা মুচকি হেসে বলল, এটাও কি সেলস প্রমোশন?

হ্যাঁ, এ সবই সেলস প্রমোশন।

ছেলেটার দেওয়া নতুন শাড়ি পরল সবিতা, বাচ্চাদেরও সাজিয়ে নিল। এবং জন্মে যা কখনো করেনি আজ তাও করল সে, একটু সাজল। চোখে কাজল, কপালে টিপ।

ছেলেটা নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়। রেস্টুরেন্টে দারুণ খাওয়াল এবং কিনে দিল আরও নানা দামি উপহার। সেই উপহারের মধ্যে সবিতার চার ভরি সোনার একটা হার, চার গাছা সলিড সোনার চুড়ি এবং বাচ্চাদের জন্য হার আর আংটি।

সবিতা বারণ করার অনেক চেষ্টা করেও পারল না। ঠিক কথা আজ সবিতা অনেকটা বিবশ, রসস্থ। সে তেমন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতেও পারল না। তার মনে হচ্ছে, তার জীবনে এই প্রথম একজন সত্যিকারের পুরুষের সবল প্রবেশ ঘটছে। সে ঠেকাবে কেন সেই অনুপ্রবেশ? জীবনে সে তো কিছুই পায়নি।

বিকেলে তারা একটা থিয়েটার দেখল। বাচ্চাদের একপাশে রেখে সবিতা ইচ্ছে করেই ছেলেটার পাশে বসল। অন্ধকারে সে ইচ্ছে করেই হাত ধরল ছেলেটার। ধরে রইল।

ছেলেটা আসতে লাগল ঘন ঘন। সবিতার এখন পুষ্টিকর খাবারের অভাব হচ্ছে না। বাড়িটার শ্রী ফিরছে। বেশ ভালো সময় যাচ্ছে তার। তবে ছেলেটা কখনো প্রেমের কথা বলে না। তাকায় আর হাসে। সবিতার কাছে তাই যথেষ্ট।

সবিতা এক সন্ধেবেলা একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও? চাইলে মুখ ফুটে বলো না কেন?

তিন

লাচ্চু একেবারে একটা খাদের কিনারায় এসে ঠেকেছে। লাফ দেবে? সম্পর্কটা সংস্কার ছাড়া আর কী? ভদ্রমহিলাকে তার বৃদ্ধ বাবা অন্যায়ভাবে বিয়ে করেছিল। সেই অন্যায়কে স্বীকৃতি না দিলে ক্ষতি কী? দুনিয়া তো চলেছে সংস্কার ভাঙার দিকেই। সবিতাকে কয়েকদিন দেখে তার মেয়েদের সম্পর্কে অনেক বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে গেছে। দারিদ্র্য, অপমান, অবিচার সয়ে বড়ো হওয়া এই মহিলা যেমন সাহসী— তেমন সহনশীলা। লাচ্চু কি চোখ বুজে লাফটা দেবে? আমেরিকার মুক্ত সমাজে সব চলে। অতীত লুপ্ত হয়ে যাবে। দেবে লাফ?

লাচ্চুর অতীত বলতে যা, সেটা মনে না রাখলেও চলে। সব ভুলে যাওয়া যায়। একটা দুটো কথা মাঝে মাঝে হানা দেবে ঠিকই। কিন্তু ওসব মাছির মতো উড়িয়ে দেওয়া যাবে। নতুন একটা সম্পর্ক হোক।

সন্ধেবেলা লাচ্চু গিয়ে দেখল আজ বাড়িটা একটু সাজানো হয়েছে। টেবিলের ওপর তার বাবার ছবি বসানো, গলায় মালা, সামনে ধূপ জ্বলছে।

এসব কী?

সবিতা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, বিলু তার বাবার জন্মদিন পালন করছে।

আজ কি বাবার জন্মদিন?

হ্যাঁ। এসব বিলুই মনে রাখে। বাবাকে খুব ভালোবাসত তো? আঠাশে কার্তিক কবে আসে ঠিক হিসেব রাখে।

ও।

ওর বাবা ওকে বলত একটা ছেলে ছিল, একটা মেয়ে, কাউকেই আদর দিতে পারিনি। দুটোই হারিয়ে গেল। তোরা হারিয়ে যাস না। আমাকে মনে রাখিস। শোনো, আজ তুমি এখানেই খেয়ে নাও। রান্না করছি।

লাচ্চু খেল। মাথা নীচু করে, শক্ত হয়ে এবং কথা না বলে। এ—বাড়িতে বাবার একটা ছবি ছিল, এটা খেয়াল ছিল না তার। টেবিলের ওপর বাবার গড়ানে বয়সের ছবি থেকে একজোড়া চোখ তাকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল।

একটা ছবি সব ভণ্ডুল করে দিল নাকি? বড়ো গ্লানি লাগছে যে ভিতরে।

লাচ্চু পরদিন রাতে প্লেন ধরল। ফিরে এল নিউইয়র্কে তার কুইনসের বাড়িতে। চুপচাপ এবং একা কাটাল দুটো দিন। তারপর সাহস করে একটা এয়ারোগ্রাম বের করে সবিতার ঠিকানায় লিখল। তারপর আরও একটু সাহস করে পাঠ লিখল, শ্রীচরণেষু মা...

ত্রয়ী
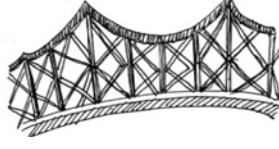
১. সুপারম্যান

সুপারম্যানের সঙ্গে আমার দেখা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। বলছি।

পাপড়িকে বলা যায় আমার প্রেমিকা। সাদামাটা বাংলায় এর চেয়ে জুৎসই শব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পাপড়ি যথারীতি একটু বোকা এবং ইংলিশ মিডিয়ম। প্রেমিকার সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে প্রেম কথাটি। অর্থাৎ লায়লা—মজনু, রোমিও—জুলিয়েট বা রাধাকৃষ্ণ। পাপড়ি এবং আমার সম্পর্ক অবশ্যই তেমন নয়। আমরা দু—জনেই দু—জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ইংরিজিতে যাকে বলে ওয়েল উইশার। আমাদের বিয়ে কোনোদিন হতেও পারে, না—ও হতে পারে। হলে যে আমরা দারুণ খুশি হব তা নয়, না হলে যে ভীষণ দুঃখ পাব এমনটিও মনে করার কারণ নেই।

আপাতত পাপড়ি একটু সমস্যায়। ওর মা আর বাবার মধ্যে ডিভোর্সের মামলা চলছে। ওর বাবা ইতিমধ্যে এক পাঞ্জাবি মহিলার সঙ্গে দিল্লিতে বসবাস করছেন। ওর মা প্রাণপণে বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পাপড়ির মাকে আমি পাত্র নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কাজটা সহজ নয়। বয়স, মেচেতা বা মেদ কোনোটাই বড়ো বাধা নয়। কথা হল, ঝাড়াই বাছাইয়ের পর যে দু—টি পাত্র ঠিক করা গেছে তাদের মধ্যে কোনজন? রাম জালান, না সোমনাথ বসু?

সেদিন রাত প্রায় সাড়ে দশটা অবধি পাপড়িদের সাততলার ফ্ল্যাটে আমি, পাপড়ি আর পাপড়ির মা একটা ফাইন্যাল ডিসিশনে আসার চেষ্টা করছিলাম।

পাপড়ি বলল, দেখো মা, রাম সব দিক দিয়েই ফিট। ব্যাচেলর, ওয়েল কানেকটেড, ডিগনিফায়েড অ্যান্ড এভরিথিং। কিন্তু আমার ওপর ওর একটু উইকনেস আছে। বয়সে তোমার চেয়ে ঢের ছোটো। তুমি যদি ওকে নজরে নজরে রাখতে না পারো তা হলে এনি নাইট হি মাইট বি ল্যান্ডিং ইন মাই বেড।

পাপড়ির মা বললেন, সোমনাথের যে ছেলে নিয়ে প্রবলেম। একটা পাগল ছেলে বাড়িতে থাকলে দেয়ার উইল বি নো কমফোর্ট।

বস্তুত সোমনাথ বসুকেই পাত্র হিসেবে আমার আর পাপড়ির কিছু বেশি পছন্দ। তবে বাধা ওই ছেলেটা। বেশ লম্বা চওড়া চেহারার চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে। কিন্তু তার রোগ হল, সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে। নড়াচড়া কম করে, কথা বলেই না, শুধু চারদিকে চেয়ে একটা সন্দিহান তীক্ষ্ন নজরে সব কিছু দেখে যায়। সোমনাথ এই ছেলে নিয়ে উদবিগ্ন, তটস্থ, স্বস্তিহীন। নইলে বিপত্নীক, বড়ো কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ ছিল না।

রাত সাড়ে দশটা অবধি সিদ্ধান্তে আসতে না পারায় আমরা তিনজনই বেশ গরম হয়ে গেলাম। পাপড়ির মা একটা চমৎকার ককটেল করে দিলেন। সেটা খেয়ে যখন আমি বিদায় নিলাম তখন পাপড়ি সিঁড়ির মুখ অবধি এগিয়ে দিতে এসে বলল, জন, তুমি কিছু করতে পারো না?

কী করার কথা বলছ?

সোমনাথকেই আমি নতুন বাবা হিসেবে চাই।
আমিও চাই।
পাপড়ি চোখ বড়ো করে বলল, তোমার নতুন বাবা হিসেবে?
ওর বোকামি দেখে বিরক্ত হয়ে বললাম, আরে না। তোমার নতুন বাবা হিসেবে।
কিন্তু হবে কী করে? বলে পাপড়ি প্রায় ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলে আর কি।
আমি ওর হাতটা ধরে বললাম, মেনে নাও।
কী মেনে নেব?
সোমনাথের ছেলেটাকে।
মেনে নেওয়াটা আবার কীরকম?
লেট হিম বি দেয়ার।
মা যে পাগলদের ভীষণ ভয় পায়।

অর্থাৎ সমস্যাটা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে যাচ্ছে। এক চুল নড়ছে না। দিন তিনেক বাদে আবার যখন সিটিং বসল তখন সুষমা দেবী, অর্থাৎ পাপড়ির মা পরিষ্কার বললেন, দেখো জন, দেখো পাপড়ি, আমার কিন্তু বয়স হয়ে যাচ্ছে। এরপর খুব দেরি হয়ে যাবে।

পাপড়ি আমার দিকে চাইল, আমি পাপড়ির দিকে।

সুষমা বললেন, আমি জানি তোমরা সোমনাথকেই আমার হাজব্যান্ড হিসেবে চাও। বেশ ভালো কথা। সেক্ষেত্রে তোমাদের কিছু কনস্ট্রাকটিভ কাজ করতে হবে। কিডন্যাপ দ্যাট বয় অ্যান্ড রিমুভ হিম টু এ মেন্টাল হোম।

আমরা দু—জনেই সমস্বরে বলে উঠলাম, কিডন্যাপ। সে কী?

সুষমা বিরক্তির গলায় বললেন, এ মাইনর সিন। এমনকী রিস্কি কাজও নয়। ওয়াটগঞ্জে ডাক্তার সানি সেনগুপ্তর একটা পাকা এস্টাব্লিশমেন্ট আছে। অল ফাইভ স্টার অ্যারেঞ্জমেন্টস। ইটস আ মেন্টাল হোম ফর একস্ট্রিমলি রিচ পিপল।

পাপড়ি খুব ঘাবড়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু আমি আইডিয়াটা নাড়াচাড়া করে দেখলাম, প্রস্তাবটার মধ্যে মাল আছে। ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

সুষমা দেবী বললেন, আমাকে সুখী দেখার জন্য তোমরা এটুকু নিশ্চয়ই করতে পারো। মে বি দি বয় উইল পুল আউট অফ দ্যাট স্টুপর ইন এ গুড মেন্টাল হোম। সোমনাথটা বোকা আর অবসেসড বলে ছেলেটাকে ওরকম আগলে রেখেছে।

আমি বললাম, দ্যাটস ওকে। কিন্তু ছেলে নিরুদ্দেশ হলে সোমনাথ খেপে যাবে না! হি হিজ অ্যান একস্ট্রিমলি স্ট্যাবোর্ন ম্যান।

সুষমা বললেন, তুমি ভীষণ বোকা জন মাই ডারলিং। সোমনাথ খেপে যাবে তো ঠিকই। কিন্তু তারপর কী করবে? হি উইল সার্চ এভরিহোয়্যার, হি উইল গো টু পুলিশ, হি উইল ইনসার্ট অ্যান অ্যাড ইন নিউজপেপারস। দেন হোয়াট? যখন কিছুতেই কিছু হবে না তখন ওয়ান ডে হি উইল কাম টু মি উইথ টিয়ারস ইন হিজ আইজ। তখন আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেব। শুধু ভালোবাসা দিয়ে। বুঝলে?

সুষমা এমনভাবে বিবরণটা দিচ্ছিলেন যেন সব ব্যাপারটা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল, চোখ স্বপ্নাতুর। ওর ওপর আমার খুব একটা শ্রদ্ধা হল। ভদ্রমহিলা বুদ্ধিমতী, দূরদর্শী।

একটা গলা খাঁকারি দিয়ে আমি বললাম, দ্যাটস ও কে। কিন্তু অত বড়ো একটা ছেলেকে কিডন্যাপ করা খুব সহজ কাজ নয়। ছেলেটা বেশ শক্তপোক্ত চেহারারও। রেজিস্ট্যান্স দেবে।

সুষমা বললেন, রাফ হ্যান্ডলিং আমি পছন্দ করি না। তবে ছেলেটার দুটো অবসেশন আছে। হাই পাওয়ার মোটর বাইক অ্যান্ড বিউটিফুল গার্লস।

সুষমা এইটুকু বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার আর পাপড়ির দিকে তাকালেন। আমার একটি হোন্ডা মোটরবাইক আছে, আর বলাই বাহুল্য পাপড়ি সুন্দরী। সুতরাং সোমনাথ বসুর পাগল ছেলেকে গুম করার দায়িত্ব নিঃশব্দে আমাদের ওপরেই বর্তাল। আমাদের মধ্যে একটু অনিচ্ছা হয়তো দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সুষমা চোখ এবং ব্যক্তিত্ব দিয়ে সেটাকে শাসন করে দিলেন।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ আমি আমার হোন্ডার পিছনে পাপড়িকে চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে সোমনাথের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিই। সোমনাথ অফিসে গেছে। বাড়িতে ছেলেটা একা। চারদিকে রোদ ঝলমল করছে এবং শীতকাল। নির্জনতাই যথেষ্ট। উপরন্তু পাগলের ভয়ে সোমনাথের বাড়িতে কাজের লোক থাকে না বলে বাড়িতেও পরিবেশ খুব জনহীন। উঁকিঝুঁকি দেওয়ার কেউ নেই।

কিন্তু মুশকিল হল পাপড়িকে নিয়ে। তার মুখ সাদা এবং শুকনো। চোখে ভয়। মিনমিনে গলায় বলল, জন, আমিও যে পাগলদের ভীষণ ভয় পাই।

আমি ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে বললাম, সেল্ফ স্যাক্রিফাইস করা ছাড়া আমি তো আর অন্য কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

তুমি কি যথেষ্ট কাছাকাছি থাকবে?

চেষ্টা করব। বিপদে পড়লে চেঁচিও। কিন্তু চেঁচামেচি করার জন্য তুমি আসোনি। এসেছ ছেলেটার সঙ্গে একটু ইয়ে করতে। মনে রেখো।

পাপড়ি বিপন্ন গলায় বলে, আমি যে—কোনো পাগলের সঙ্গে কখনো প্রেম করিনি জন। এক্সপেরিয়েন্স নেই।

অভিজ্ঞতাটা তা হলে আর বাকি থাকে কেন। হয়ে যাক।

পাপড়ি অগত্যা দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে গেল। আমি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম, উৎকর্ণ এবং কিছুটা উদবিগ্ন হয়ে।

ঘণ্টাখানেক বাদে যখন পাপড়ি বেরিয়ে এল তখন তাকে দেখে কে বলবে এ সেই পাপড়ি। আমি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। পাপড়ি সুন্দরী, কিন্তু এখন তার মুখ চোখ সমেত সমস্ত শরীর যেন এক অদ্ভুত আলোয় ঝলমল করছে। দুই চোখ স্বপ্নাতুর। মুখে এক সম্মোহিতের ভাসমান হাসি। আর যখন তাকে স্পর্শ করলাম তখন স্পষ্ট টের পেলাম তার সমস্ত শরীরে একটা কাঁপুনি— না, কাঁপুনি নয়— একটা ঝংকার রিনরিন করছে।

পাপড়ি আমার চোখে এক আনমনা চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা জন, পাগলদের কি আলাদা কোনো ল্যাংগুয়েজ থাকে?

সবসময়ে নয়। তবে কারও কারও থাকে। কেন?

পিঙ্কুর আছে, জানো? ওর কথার একটি বর্ণও আমি বুঝতে পারনি। কিন্তু তবু আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত কমিউনিকেশন হয়ে গেল। আর কী দুষ্টু জানো? প্রথমদিনেই...মা গো...

বলে কাচ—ভাঙা হাসি হাসতে হাসতে শতখান হয়ে পড়ছিল পাপড়ি। আমি হোন্ডায় একটা লাথি মারলাম। সেটা ঘেউ ঘেউ করে গর্জে উঠল।

পরদিন সোমনাথের বাড়ির সামনে আমার হোন্ডা থামতে না থামতেই পাপড়ি হালকা পায়ে লাফিয়ে নেমে একখানা রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে ভিতরে চলে গেল। আমার দিকে ফিরেও চাইল না। পৃথিবীতে আত্মত্যাগের মহান সব ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সোমনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে তিন ঘণ্টার ওপর সময় নিল পাপড়ি। আমি আমার হোন্ডার সিটে বসে বার দুই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একবার একজন বুড়ি ও আর একবার এক পুলিশ আমাকে সজাগ করে

দিয়ে নাগরিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে খানিকটা অবহিত করে যায়।

আজ পিঙ্কু পাপড়ির শরীরে নানাবিধ রহস্যময় সুইচ অন করে বিচিত্র সব আলো জ্বেলে দিয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছিল, পাপড়ি যে দেয়ালির রাতের এক বাড়ি। সার সার পিদিম জ্বলছে, তারাবাতি ফুলকি ছড়াচ্ছে এবং সলতের আগুন ধরানো একটা বিকট বোমা অপেক্ষা করছে বিস্ফোরণের জন্য।

পাপড়ি আজ খুব ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছিল, নিচ্ছিল। আমার পিছনে বসে ও শ্বাসের শব্দের মতোই ফিসফিস করে বলল, বিজন ডারলিং, আজ তোমাকে এমন একটা কথা বলব যা শুনে তুমি চমকে উঠবে।

সাঙ্ঘাতিক উত্তেজনার কিছু না ঘটলে পাপড়ি আমাকে সহজে বিজন বলে ডাকে না। বিজন নামটা ভ্যাতভ্যাতে, ন্যাতানো, বি বাদ দিলেই নামটা পাঁচ হাজার মাইলের দূরত্ব রচনা করে।

যাই হোক, আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, কী কথা?

পিঙ্কু কিন্তু মানুষ নয়।

চলন্ত হোন্ডা গোঁত্তা খেয়ে একটা ট্যাক্সির পিছনে গিয়ে গুঁতো দিচ্ছিল আর কি, অতি কষ্টে সামলে নিলাম। হেসে বললাম, তবে কি রোবোট?

পাপড়ি ভেজা গলায় বলে, ও যে আসলে কী তা আমি এখনও জানি না। তবে ওর আই কিউ ঢের ঢের উঁচুতে।

পাগল নয় বলছ?

পাগল তো বটেই।

তা কী করে হয়?

পাগল না হলে— বলে কী ভেবে চুপ করে গেল পাপড়ি।

আমি বললাম, ডাক্তার সেনের ফাইভ স্টার মেন্টাল হোমে ওকে পাচার করতে আর দেরি করা উচিত নয় পাপড়ি।

পাপড়ি শ্বাসের শব্দ তুলে বলল, কাল।

পরদিন যখন আমরা সোমনাথের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম তখন অবাক হয়ে দেখি, সোমনাথের তথাকথিত পাগলু—বোকা—আখাম্বা ছেলেটি কাঁধে একটা ঝুলন্ত ব্যাগ নিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। চোখে তীক্ষ্ন ও সন্দিগ্ধ একটা দৃষ্টি। মোটরবাইক থামাতে না থামাতেই আমাদের অবাক করে দিয়ে ও টপ করে পাপড়ির পিছনে সিটে উঠে বসে পড়ল।

আমি একটু বুরবক বনে গেলাম। এ রকম কথা ছিল কি না তা আমার জানা নেই। নীচু স্বরে পাপড়িকে জিজ্ঞেস করলাম, ও কি জানত যে ওকে আমরা নিয়ে যেতে আসছি।

না। এরকম কথা হয়নি।

তা হলে?

চুপ করো। ওর আই কিউ কিন্তু অনেক বেশি। এ সব টের পায়।

আমার গা—টা কেমন ছমছম করতে লাগল। প্রকাশ্য দিবালোকে এবং আব্রুহীন মোটরবাইকে বসেও। অন্য সময়ে মোটরবাইকের পিছনে বসে পাপড়ি আমার গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে, কোমর জড়িয়ে ধরে আলতো হাতে। আজ আমি টের পাচ্ছিলাম, পাপড়ি আমাকে জড়িয়ে তো ধরেইনি, এমনকী আমাকে স্পর্শও করছে না। তিনজনে যাচ্ছি, বেশ চাপাচাপি হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ওরা দু—জনে যে পিছনে আছে তা আমি টেরও পাচ্ছি না, পিছু ফিরে দেখতে আমার সাহস হল না। আমি শুধু ঝুঁকে পড়ে মোটরবাইকের সবটুকু শক্তি নিংড়ে দিতে লাগলাম গতিতে। চারপাশে ঘূর্ণি ঝড় তুলে ছুটছে হোন্ডা। ভীষণ শব্দে গজরাচ্ছে মেশিন। কানের পাশে ফেটে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া। ওয়াটগঞ্জ কি এখনও অনেক দূর?

জন! জন! আরও জোরে। আরও জোরে! পিছন থেকে কাতর স্বরে বলে উঠল পাপড়ি।

কেন বলল? কী হচ্ছে পিছনে? আমি পিছু ফিরে না তাকিয়েই মাথা নেড়ে বললাম, আর স্পিড তোলার উপায় নেই পাপড়ি। আমরা ওয়াটগঞ্জে প্রায় পৌঁছে গেছি।

পাপড়ি কান্নার ফোঁপানির মতো শব্দ তুলে চেঁচিয়ে বলল, আমরা কোনো দিন ওয়াটগঞ্জে পৌঁছোতে পারব না জন।

কথাটা শুনে আমার ভয় করল। বড়ো ভয় করল। তবু আমি আরও ঝুঁকে পড়লাম। মিশে যেতে লাগলাম মেশিনের সঙ্গে।

বলতে নেই, মোটরবাইক আমি ভালোই চালাই। বিশেষ করে নিজস্ব এই হোন্ডা বাইকটির সঙ্গে আমার সমঝোতা চমৎকার। তবু ঘটনাটা ঘটল আদি গঙ্গার পোল পেরোনোর পর।

যে যে কারণে দুর্ঘটনা ঘটে তার কোনোটাই দায়ী নয়। তবু যে কী করে ঘটে গেল সেটাই বিস্ময়ের। আমার শুধু মনে হল, কোনো বৃহত্তর ইচ্ছাশক্তি, কোনো অতিমস্তিষ্ক খুব হিসেব—নিকেশ করে ছোট্ট একটা টাল খাইয়ে দিল ভারসাম্যে, একটু দোল, একটু ভয়, আত্মবিশ্বাসে এক সেকেন্ডের দ্বিধা। মোটরবাইকটা খুব অসহায়ভাবে আকাশে উঠল। তারপর স্তূপাকার হয়ে ভীষণ শব্দে ঝরে পড়ল আমাদের ধ্বংসস্তূপ।

সেই ধ্বংসস্তূপে ভাঙা দুটি ডল পুতুলের মতো পড়ে রইলাম আমি আর পাপড়ি। দুটি গাড়ল, বুদ্ধু, আহাম্মক মানুষ ও মেয়েমানুষ। কিছুই করার নেই আমাদের। শুয়ে, ঘাড় গুঁজে নিজেদের ক্ষত ও বেদনার জন্য শোক অনুভব করতে করতে আমরা দেখলাম, ছেলেটা নিষ্কলুষ সেই ধ্বংসস্তূপে উঠে দাঁড়িয়েছে। ক্ষত নেই, দাগ নেই। কাঁধে ব্যাগ। চোখে সেই সন্দিহান তীক্ষ্ন দৃষ্টি। একবারও আমাদের দিকে ফিরে তাকাল না। একটু দীর্ঘ পদক্ষেপে ধীরে ধীরে ফিরে যেতে লাগল, যে পথ ধরে আমরা এসেছি সেই পথে।

২. ভূতের গল্প

বাথরুম থেকে আমার নতুন বউ চেঁচিয়ে উঠল ভূত! ভূত!

আমি দৌড়ে গেলাম, কী হয়েছে?

আমার বউ চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, ভূত!

কী রকম ভূত?

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছিল। খোঁনা সুরে বলল, নতুন বিয়ে বুঝি? বেশ বেশ। মজা বুঝবে।

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললাম, আর কিছু বলেনি তো!

বলেছে।

কী বলেছে?

আমার বউ মাথা নেড়ে বলল, সেটা তোমাকে বলা যাবে না।

আমার বুকটা একটু কেঁপে উঠল। ভূতকে আমি ভয় পাই নানা কারণে। সবচেয়ে বড়ো কারণটা হল, ভূত আমাদের নানা গুপ্ত কথা জানে। আমার মতো ছা—পোষা লোকেরও গোপন করার মতো কিছু কথা আছে, ঠিক জানি না ছা—পোষা লোকদেরই গুপ্ত কথা বেশি থাকে কি না। যেমন, আমি ছশো বিয়াল্লিশ টাকা পঁচিশ পয়সা মাইনে পাই। বিয়ের আগে আমার হবু শ্বশুর মশাই খুব কুণ্ঠিতভাবে কথাটা তুললেন, তা বাবাজি কি হাজার খানেকের মতো পাচ্ছ আজকাল? আমি কিন্তু তখন খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম, আজ্ঞে ওরকমই, আমার নতুন বউও তাই জানে। আর একটা ব্যাপার হল, পটল। ভারি গেছো মেয়ে। অন্তত তেরোবার সে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। কারও সঙ্গেই তিনদিনের বেশি টিকতে পারেনি। ত্রয়োদশতম ব্যক্তিটি ছিলাম আমি। পটলের সঙ্গে পালানোর মতো বুকের পাটা আমার ছিল না। বলতে গেলে সে—ই আমাকে নিয়ে পালায়। ব্যান্ডেল অবধি পৌঁছে আমি বিস্তর কান্নাকাটি করতে থাকায় পটল আমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিল। একটা অসভ্য গালাগালও দিয়েছিল বটে, কিন্তু সে কথা থাক। কথাটা হল গোপন কথা

আমার মতো লোকেরও কিছু আছে। আর ভূতেরা সবজান্তা। কাজেই আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভূতটা আমার বউকে কী এমন বলেছে যা আমার জানা বারণ?

রাত্রিবেলা খেতে বসে আমি আমার নতুন বউকে বললাম, বাড়িটা যখন ভূতুড়ে তখন ছেড়ে দিলে কেমন হয়?

বউ একটু কূট চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, ভালোই হয়। তবে কয়েকটা দিন যাক। ভূতটার কাছে আমার কয়েকটা কথা জানার আছে।

শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। গলাটা আটকে এল। কিছু বলতে পারলাম না। এমনকী বউয়ের চোখে চোখ রাখতেও কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

বউ ঘুমোনোর পর নিশুত—রাতে আমি ভূতটাকে পাকড়াও করতে উঠলাম। ভূত সম্ভবত ঘুষ খায় না, ভয় খায় না এবং সহজে পোষও মানে না। তাদের ব্ল্যাকমেল করাও বোধহয় সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমার মতো ছোটোখাটো লোককে পাত্তা দেওয়ারও কোনো কারণ নেই। তবু আমাকে তো চেষ্টা করতেই হবে।

অন্ধকার বাথরুমে দাঁড়িয়ে আমি জানলার দিকে চেয়ে ফিস ফিস করে বললাম, ওহে, অ মশাই, শুনছেন!

হিঃ হিঃ করে একটা রক্ত—জল—করা হাসি শোনা গেল। জানলায় ভেসে উঠল একটা অতিকায় খচ্চর ও ধূর্ত ভূতের মুখ। সে মুখের বর্ণনা দিতে যাওয়া বৃথা। ভূতেরা যেমন হয় তেমনই। গোল গোল চোখ, বড়ো বড়ো দাঁত, কাঠ—কয়লার মতো চামড়ার রং।

মাথা চুলকে আমি বিনীতভাবেই বললাম, আমার বউকে আপনি কি কোনো ইনফর্মেশন দিয়েছেন?

ভূতটা হিঃ হিঃ করে হেসে বলল, তাতে ক্ষতি কী? তোমাকেও দু—একটা দিই তোমার বউ সম্পর্কে।

আমি অবাক হয়ে বলি, আমার বউ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

খুব জানি। এই তো গত বছর বিজয়া দশমীর দিন বলাইদের ছাদে বলাই ওকে...। তা ছাড়া বিদ্যুতের সঙ্গে সেবার মধুপুরে গিয়ে...। আরও আছে শুনবে?

আমার কান বেশ গরম হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে বললাম, একদিনে বেশি সইতে পারব না। আস্তে আস্তে হবে।

আবার সেই হিঃ হিঃ হাসি, আরে বাবা কলির তো সবে সন্ধে। আরব্য রজনীর মতো হাজার এক রাত কেটে যাবে তবু তোমার বউয়ের কেচ্ছা ফুরোবে না। তবে বউয়ের বি—এ সার্টিফিকেটখানা একবার দেখতে চেয়ো।

আমি তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলাম। মাথাটা কেমন করছিল। বউয়ের পাশে এসে যখন ফের শুলাম তখন গা—টা রীতিমতো রি রি করছে।

পরদিন সকালেই আমাদের ঝগড়া লাগল। বলতে গেলে বিয়ের পর সেটাই আমাদের প্রথম ঝগড়া। তবে ঝগড়াটা বেশিদূর গড়াল না। আমার বউ পটলের কথা তুলতেই আমি বলাই এবং বিদ্যুতের কথা তুললাম। বউ আমার মাইনের কথা তুলতেই আমি ওর বি—এ সার্টিফিকেট দেখতে চাইলাম।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আমার বউ কাঁদতে বসল। আমি গুম হয়ে রইলাম। আমরা দু—জনেই হেরেছি, না হয় দু—জনেই জিতেছি। কিন্তু কোনটা তা বুঝতে পারছিলাম না। আড়াল থেকে ভূতটা হেসে উঠল, হিঁ হিঁ!

আবার একদিন রান্নাঘর থেকে আমার বউয়ের চিৎকার এল, ভুত! ভূত!

দৌড়ে গেলাম, কী হয়েছে?

তোমার যে বাহান্ন টাকা মাইনে বেড়েছে তা আমাকে বলোনি তো!

একটু মাথা চুলকে বললাম, আমার শখের রনসন লাইটারটা যে গোপনে তুমি তোমার ভাইকে দিয়েছ তাও তো তুমি আমাকে বলোনি। বরং খুঁজে না পাওয়ায় তুমি বলেছিলে নিশ্চয়ই লাইটারটা পকেটমার হয়েছে।

বউ অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমিও ওর দিকে। আড়ালে শোনা গেল, হিঁ হিঁ।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পরস্পর সম্পর্কে বিস্তর তথ্য জেনে গেলাম। পরস্পরের পরিবার সম্পর্কেও। বলা বাহুল্য এর ফলে আমাদের মধ্যে রোজই ঝগড়া লাগতে লাগল। এবং কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করতেই আমরা আর বাকি রাখলাম না। আমাদের দাম্পত্য জীবন একটা অশরীরী হিঁ হিঁ হাসিতে ভরে যেতে লাগল।

তবে বলতেই হবে যে, ভূতটি ছিল ভারী নিরপেক্ষ। পক্ষপাতশূন্য ভাবেই সে দু—জনকে দু—জন সম্পর্কে জানাত। কারও দিকে টানত না।

একদিন সে আমার বউকে চুপি চুপি বলল, কী গো ভালোমানুষের মেয়ে, বড়ো যে দিনের পর দিন হেঁসেল ঠেলেই চলেছ! কর্তাটি দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে মোচ তাইয়ে অফিস আর বাড়ি মাকু মারছে। তা তোমার কি এভাবেই চলবে? তার অফিস আছে, আড্ডা আছে, তোমার কী আছে বলো! এবার ধরে পড়ো, তোমাকে নিয়ে গিয়ে কোথাও বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসুক। সিনেমা বায়োস্কোপেও তো যাও না। আর রূপটান, শাড়ি, গয়না এসেন্স এসবও কি লাগে না তোমার?

এর পরই সে আমাকে কানে কানে বলল, রোজ ওই ট্যালট্যালে ঝোল আর ভাত খেয়ে খেয়ে অরুচি হয় না তোমার? কোথায় গেল মায়ের হাতের সেই মোচার ঘণ্ট, পোলাও, মুড়িঘণ্ট, নিমঝোল? বউ যা রাঁধে তাই সোনা হেন মুখ করে খাও, ও কেমন ধারা? পুরুষ হবে পুরুষের মতো। হুকুম করবে, তামিল হবে। বিয়ের শালটা রিপু করতে পারে, ঘরদোর চকচকে ঝকঝকে রাখতে পারে, ডালের বড়ি দিতে পারে, কত কী করার আছে মেয়েদের। করছে কী?

তাই বলছিলাম, ভূতটি ভারি নিরপেক্ষ।

যাই হোক এরকমভাবে বেশি দিন চলে না। ভূতের ষড়যন্ত্রে আমার ও বউয়ের মধ্যে সম্পর্কটা এমনই ঘোরালো হয়ে উঠল যে, আমরা পরস্পরকে রীতিমতো এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কেউ কাউকে একদম সইতে পারি না। একদিন বউ বলল, ভূতটা দিন দিন খুব পেয়ে বসছে।

আমি সায় দিয়ে বললাম, ব্যাটাকে আর পাত্তা দেওয়াটা ঠিক হবে না।

তা হলে কী করবে? বাড়ি ছাড়বে?

ছাড়তে তো অরাজি নই। কিন্তু বাড়ি পাওয়া কি সোজা? ভাড়ার রেটও দ্বিগুণ বেড়েছে।

এরকম কথাবার্তা বলতে বলতে আমি আমার বউয়ের বাঁ গালে কালো জড়ুলটার সৌন্দর্য লক্ষ করলাম। আমার বউও মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার লম্বা নাকটার দিকে চেয়েছিল।

অনেক দিন বাদে সেই রাত্রে বিভ্রমবশে দু—জনে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ামাত্র আড়াল থেকে একটা গলা খাঁকারির আওয়াজ এল। খোনা গলায় ভূতটা বলে উঠল, দেখছি কিন্তু।

বউ ছিটকে সরে গেল। আমিও ঠান্ডা মেরে গেলাম। কিন্তু দু—জনেই বুঝলাম, এভাবে পারা যায় না।

খুবই সংকোচের সঙ্গে বাড়িওয়ালাকে কথাটা বললাম, দেখুন ইয়ে...এ বাড়িতে বোধহয় একজন ইয়ে আছেন। তা সেটাকে যদি তাড়ানোর একটা ব্যবস্থা করা যায়...

বাড়িওয়ালা তেড়িয়া হয়ে বললেন, পছন্দ না হলে বাড়ি ছেড়ে দিন না মশাই, আমার তিনশো টাকার অফার আছে। আর ভূতের কথা বলছেন তো! ও আমার সেজোকাকার ভূত। বড়ো ভালোবাসতেন আমায়। ওঁকে তাড়ানোর কথা মুখেও আনবেন না।

মুখ চুন করে ফিরে আসতে হল। বউকে বললাম, এভাবে হবে না। শোনো, এরপর থেকে ভূতটা গায়ে পড়ে কিছু বলতে এলে পাত্তা দিয়ো না।

তুমিও পাত্তা দিয়ো না।

দিনসাতেক আমরা ভূতটার কোনো কথাই তেমন গ্রাহ্য করলাম না। বলা বাহুল্য, গ্রাহ্য করার মতো অনেক কথাই কিন্তু ভূতটা বলেছিল সাত দিনে। অনেক ন্যায্য কথাই। তবু আমরা না শোনার ভান করে

রইলাম।

এমনকী একদিন তিন মাস খরার পর আমি আর আমার বউ পরস্পরকে একটুখানি চুমুও খেয়ে ফেললাম। অবশ্য একথাও ঠিক যে, চুমু খাওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং বলা ভালো একটা অসৎ শক্তির বিরুদ্ধে ওটা ছিল আমাদের বাঁচার লড়াই।

ঠোঁট থেকে ঠোঁট ভালো করে সরাইনি তখনও, হিংসুটে ভূতটা ফঁত করে আমাদের দু—জনের মুখের ওপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, ওটা কী হল শুনি! ঘেন্না করল না তোমাদের? লজ্জা হল না?

বলতে কী আমাদের একটু ঘেন্না আর লজ্জা হতে লাগল। একটু সরেও গেলাম দু—জনে। যথেষ্ট রুক্ষ করে তুলতে গিয়েও খুব করুণ শোনাল আমার গলা, কী করব বলুন, আমাদেরও বাঁচতে হবে।

বাঁচার জন্য চুমু খেতে হয় জন্মে শুনিনি বাবা। যাও গিয়ে মুখ—টুখ ভালো করে ধুয়ে ফেলো। তারপর মাঝখানে পাশবালিশ রেখে দু—জনে দু—জনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে থাকো।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। খুবই অসহায় লাগল। ভূতটা ভূত হলেও আসলে বাড়িওয়ালার সেজোকাকা। অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় বড়োমানুষ। তার চোখের সামনে ঢলাঢলি করাই বা যায় কী করে?

আমরা মুখ ধুয়ে এলাম। মাঝখানে পাশবালিশ রেখে পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুলামও। কিন্তু শোওয়ার আগে বউয়ের জড়ুলটার দিকে নজর গেল। ভারি টানছে জড়ুলটা। বউও দেখি আমার লম্বা নাকটার দিকে বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছে।

পরদিন আর সত্যিই পারা গেল না। দোষ আমাদের নয়, বউয়ের জড়ুল আর আমার লম্বা নাকের। বলতে কী, পাশবালিশ অতিক্রম করায় পাপ আমাদের নয়, তাদের।

কিন্তু দৈববাণীর মতো বাড়িওয়ালার সেজোকাকার ভূত বারংবার সাবধান করতে লাগল, ওরে, ও কাজ করিসনি। ওসব কি ভালো? ছিঃ ছিঃ, তোরা না ভদ্রলোকের ছেলে—মেয়ে? ওরে শোন, বউয়ের সঙ্গে আমারও মাঝে মাঝে ওরকম ভাব ভালোবাসা হত। তবু আমি দু—বার সন্নিসি হই, তিনবার সুইসাইড করতে যাই, একবার মাথা খারাপ হয়। শেষ দিকে মদ গাঁজা ধরে ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিলাম।...অ্যাই, খবরদার বলছি, ওসব করবি তো কাল এ ঘর থেকে জোড়া লাশ বেরোবে। একেবারে শেষ করে ফেলব।...তোদের পায়ে পড়ি, করিস না ওরকম তা হলে কিন্তু আমাকে সুইসাইড করতে হবে...হিঃ হিঃ, কী ঘেন্না...ওরে...ওফ...

ভূতের গলার স্বর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল। তারপর আর শোনা গেল না।

আমি আর বউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান খাড়া করে রইলাম।

ভূতটা যে মরেছে মাসচারেক বাদে সে বিষয়ে আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমার বউয়ের পেটে সেই ভূত এখন ভবিষ্যৎ হয়ে নড়াচড়া করছে।

৩. এখন ক'টা বাজে?

এক যন্ত্রণাময় মৃত্যুর পর আমি অন্য এক জগতে চোখ মেললাম।

আলো—আঁধারিতে পথ ভালো দেখা যাচ্ছিল না। তবে আবার বাঁ ধারে একটা অন্তহীন কাঁটা তারের বেড়া চলেছে। মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটি। নজরদারও আছে বলে শুনেছি।

আমি বাঁ ধারে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলাম। ওদিকটায় গাছপালার আভাস দেখা যায়। এ ধারে কিছু নেই। একদম কিছু নেই। ন্যাড়া, এবড়োখেবড়ো জমি আর তার ওপর দিয়ে একটা পায়ে—হাঁটা পথ।

একটু দূরে টাওয়ার। খুব উঁচু! অনেক সিঁড়ি। ফুরোতেই চায় না, একটার পর একটা ধাপ। আমার হাঁফ ধরছে না। উঠছি তো উঠছিই।

ওপর থেকে চটপটে পায়ে একটা ছেলে নেমে আসছিল। থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

একজনকে সি অফ করে আসছি। আপনি ওপরে যান, ওখানে অনেকেই আছে।

ছেলেটা নেমে গেল। আমি একটু ভাবতে ভাবতে উঠতে লাগলাম। ছেলেটাকে চিনি না তো, তবু এমনভাবে কথা বললাম যেন কত কালের চেনা। কাকে সি অফ করতে গেল? কোথায়?

ক—টা বাজে তা জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু লক্ষ করলাম, আমার হাতে ঘড়ি নেই। যে ছেলেটা নেমে গেল তার কবজিও ফাঁকা।

একটা চাতালে উঠে এলাম। বেশ উঁচু, এখান থেকে নীচেটা ধু ধু রহস্যের এক গভীর কুয়োর মতো ভয়াবহ। এত উঁচুতেও দু—জন লোক— মাঝবয়সি— রেলিঙের ওপর পাশাপাশি বসে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

হাঁপাইনি, নিশ্বাস নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু আমি দু—দণ্ড দাঁড়াই।

একজন লোক অন্যজনকে জিজ্ঞেস করে, সময় জিনিসটা কী বল তো?

একটা ধারণা, বোগাস।

দুর বোকা।

তা হলে?

সময় হল গতি। ছোটো থেকে একটা মানুষ যে বড়ো হয় সেটা তার হয়ে ওঠার গতি। মানুষ সেটা বোঝে না। দিন থেকে যে রাত হয় সেটাও গতি। সূর্যের, পৃথিবীর, তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায়।

আমার ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করি, ক—টা বাজে?

ওরা হয়তো জবাব দিত না। দু—জনেই নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে আছে কুয়াশার মতো আবরণের দিকে। চারদিকেই ওই আবরণ। কী যেন আছে আবরণের আড়ালে! নাকি কিছুই নেই?

একটু ভয়—ভয় করল আমার। আমি ফের উঠতে লাগলাম।

একটা সাদা খরগোশ মুখ তুলে তাকাল। মুখে সবজি কচি ঘাস। নীচু হয়ে তাকে একটু আদর করলাম। সে গ্রাহ্য করল না। সরেও গেল না, ভয়ও পেল না। ঘাস খেয়ে যেতে লাগল।

অনেক ওপরে আর একজন কে যেন উঠছে। তার পায়ের শব্দ শুনছি। সে কে তা জানবার আগ্রহ বোধ করলাম না। আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করছিল, এখন ক—টা বাজে।

উঠছি, উঠছি, উঠছি। একজন যুবতী আচমকা পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যেতে হরিণ—পায়ে একটু থমকায়। তারপর তাকায়।

এলেন?

আসারই তো কথা ছিল। তাই না?

যুবতীটি হাসল। মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, যাই?

তাড়া আছে নাকি?

না, না। আমি তো বরাবরই এরকম। একটু তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভাঙতে ভালোবাসি।

কত সিঁড়ি, তাই না?

হ্যাঁ, কত সিঁড়ি!

আচ্ছা এখন...

বলতে গিয়েও আমি সতর্ক হই। 'কটা বাজে' কথাটা আর উচ্চচারণ করি না। যাক গে, জেনে নিলেই হবে। তাড়া নেই।

যুবতী উঠে যায়।

একজন মিস্ত্রি সিঁড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে উবু হয়ে বসে। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট কি? গায়ে শার্ট? না, আমার চোখের ভুল।

একটু দাঁড়াই। দেখি। লোকটা উবু হয়ে বসে সিঁড়ির খুঁটিনাটি দেখছে। হাতে মেরামতির যন্ত্র।

কী দেখছেন?

দেখছি কোথাও ভেঙেছে কি না।

পেলেন কিছু?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, না, শালারা ভালোই বানায়।

কোথায়ও ভাঙেনি? ফাটেনি?

না। কতকালের সিঁড়ি, তবু কী মজবুত!

কতকালের...?

বলেই আমি জিব কাটি। অনেকটা 'কটা বাজে' গোছের প্রশ্ন। আজকাল মিস্ত্রিদের হাতে ঘড়ি থাকে। এ লোকটার হাতে নেই।

উঠছি। উঠছি। উঠছি। বেশ লাগছে। গরম নেই, শীত নেই। আলোর সঙ্গে অন্ধকার অবিরল মিলে মিশে যাচ্ছে চারদিকে।

কাকু!

মায়ের কোলে একটা ছেলে। রেলিঙের পাশে দাঁড়ানো তার মায়ের কোল থেকে আমার দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে।

একটু হাসলাম। হাত নাড়লাম।

ওপরে যাচ্ছ কাকু?

যাচ্ছি।

আমার বাপিকে দেখলে বোলো...।

বলব।

কী বলব তা জিজ্ঞেস করলাম না, জানি, জানি? কিন্তু কী করে জানি?

উঠছি। হাঁফ ধরছে না। ক্লান্তি নেই। তবু একটু দাঁড়াই। উঠতেই তো হবে। উঠতে উঠতে যতদূর দেখা যায়।

কিন্তু দেখার কিছু নেই। ম্লান গোধূলি, সিঁড়ি, না শীত না গ্রীষ্ম।

মোটা একজন মানুষ ওপর থেকে নামছে।

কী খবর?

এই তো, আপনি?

ভালো ভালো। যান, ওপরে যান।

আপনি নীচে নামছেন বুঝি?

নামি একটু। নামাও যা, ওঠাও তাই। একই তো।

লোকটা একটু হাসল। লক্ষ করলাম, তার হাতে ঘড়ি নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ক—টা বাজে তা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি কি দু—ধাপ নামব? নামাও যা, ওঠাও তো তাই?

তবু আমি উঠছি। উঠছি। উঠছি। কোথাও যাচ্ছি কি? যাচ্ছি বোধহয়।

একটা রুমাল কে ফেলে গেছে সিঁড়িতে? আমি নীচু হই। হাত বাড়াই। সবুজ রুমালের এক কোণে হলুদ সুতোয় লেখা 'এস'। চোখে জল আসে। হাতটা গুটিয়ে নিই। জানি, রুমালে সুগন্ধ আছে, আছে আমন্ত্রণ। তবু নিই না। নিতে নেই। দেওয়ারও তো কিছু থাকতে পারে না এখানে। উঠতে উঠতে একবার পিছু ফিরে চাই। সিঁড়িতে পড়ে আছে সবুজ রুমাল। বহুকাল ধরে পড়ে আছে আমার জন্যই। যাক।

আমি উঠছি। উঠছি। মাঝে মাঝে শুধু জানতে ইচ্ছে করে, এখন ক—টা বাজে। এখন ক—টা বাজে!

বাঘ

এইখান দিয়ে একটু আগে একটা বাঘ হেঁটে গেছে। নরম মাটিতে এখনও টাটকা পায়ের দাগ। বাতাস শুঁকলে একটু বোঁটকা গন্ধও। বাঘটা শুধু যে বেড়াতে বেরিয়েছিল, এমন নয়। ফেরার পথে বাজারও করে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ বুড়ো হরিচরণের একটা বাছুরও নিয়ে গেছে মাঠ থেকে। তাই কাদা মাটিতে বড়ো বড়ো রক্তের চাপ পড়ে আছে। জেলির মতো জমে গেছে। হ্যাট মাথায় কয়েকজন হাফ প্যান্টপরা শিকারি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝোপে ঝাড়ে। বিটাররা নদীর ধারের জঙ্গলের ওপাশ থেকে টিন, ঘণ্টা আর যা পেয়েছে সব বাজাতে—বাজাতে আসছে। একজন পাইপ মুখে শিকারি বন্দুকটা ধাঁ করে মাঝখানটায় ভেঙে কার্তুজ পরীক্ষা করে নিল, তারপর ফড়াক করে আবার সোজা করল বন্দুক। সবাই তৈরি।

বাঘটা সেবার বেরোয়নি। কিন্তু বহুকাল আগের দেখা এই দৃশ্যটা আজও ভুলতে পারে না জোনাকিকুমার।

বাঘটা বেরোয়নি বলে কি আজও এইরকম অপেক্ষা করছে সে?

মাঝদুপুরে আজ বৃষ্টি নামল। তারপরই হঠাৎ থেমে গেল। আবার নামল, আবার থেমে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে জোনাকিকুমারও এক—একবার এক—একটা বাড়ির সদরে বা লবিতে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং এইভাবে সে ময়দানের কাছে একটা আঠারো তলা অফিসে বিল্ডিংয়ে পৌঁছেছে সীতানাথের সঙ্গে দেখা করবে বলে। দেখা হল না। সীতানাথ তেরোতলায় বসে। শুনল সে আজ ফুটবল খেলা দেখতে গেছে। জোনাকি একটু হতাশ আর নিঃসঙ্গ বোধ করে। সীতানাথকে পেলে কদমের মেস—এ গিয়ে তাস পেটানো যেত। হল না। কিন্তু তেরোতলা থেকে একঝলক ময়দান দেখে সে বড়ো অবাক হয়ে গেল। এ—বাড়িতে সীতানাথের অফিস সদ্য উঠে এসেছে, এই প্রথম সীতানাথের অফিসে এসেছে জোনাকি। তেরোতলা থেকে ময়দান সে আর কখনো দেখেনি। কী আশ্চর্য সবুজ! বিশ্বাস হয় না। কলকাতা নয়, ঠিক বিলেত বলে মনে হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা পর্যন্ত চেনা বলে মনে হয় না। নীচে চৌরঙ্গির রাস্তা, টিকিওলা ট্রাম যাচ্ছে, ভোঁতা ডবলডেকার গাড়ি— সবই অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। ছিমছাম এক ইউরোপের শহর যেন। ময়দান এত সুন্দর জানা ছিল না তো!

জোনাকি আবার লিফটে নেমে এল। আগাগোড়া বাড়িটা এয়ারকন্ডিশন করা, ভেজা গায়ে শীত করছিল। বেরোবার মুখে দেখল, ফের বৃষ্টি নেমেছে। নামুক। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই। এ ব্যাপারটা সে আজকাল মাঝে মাঝে টের পায়। কোথাও যাওয়ার নেই। এত কম লোকের সঙ্গে তার চেনাশোনা।

বছর দুই আগে তার একজন সুন্দরী প্রেমিকা ছিল, তিতির। দু—বছর আগে তিতিরের কাছে যাওয়ার ছিল। তখন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মনে হত— তিতির। অফিস ছুটি হলেও মনে হত— তিতির। ছুটির দিন

কাছে এলেই মন বলত— তিতির। তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। দু—বছর আগে তিতিরের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই জোনাকির জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ বৃষ্টি পড়ছে। গাছপালা, মানুষজন, চাষ—আবাদ সবই দেখতে হয় বৃষ্টিকেই। শেষ বর্ষায় সে তাই বকেয়া কাজ মিটিয়ে দিচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে অফিসের মুখটায়। তার মধ্যে জোনাকিও। তার কোনো জায়গার কথা মনে পড়ছে না, বৃষ্টির পর যেখানে গিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটানো যায়। তাই সে দাঁড়িয়ে—দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। বিটারটা বাজনা বাজাচ্ছে, শিকারিরা বন্দুক হাতে তৈরি। বাঘটা কি বেরোবে?

তা জীবনে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। জোনাকিরও বেরিয়েছিল। যে মফস্সল শহরে সে বাঘ দেখতে শহরতলি ছাড়িয়ে নদীর ধারের গাঁয়ে গিয়েছি, সেই শহরের একটা ইস্কুল থেকে সে স্কুল ফাইনালে দশম স্থান অধিকার করে। পড়াশুনোয় অবশ্য বরাবরই ভালো ছিল সে, ফার্স্ট হত ক্লাসে। পরীক্ষাও ভালোই দিয়েছিল। কিন্তু তা বলে দশম? নিজেই সে বড়ো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ঘটনার পর সবাই জোনাকির দিকে তাকাল ভালো করে। দারুণ জিনিস আছে তো ছেলেটার মধ্যে।

আর সেইটেই ছিল জোনাকির অস্বস্তির কারণ। তার ভিতরে যে তেমন কিছু নেই এটা সে হাড়ে হাড়ে টের পেত। মুশকিল হল, একবার দশম হয়ে গেলে পরে আর রেজাল্ট খারাপ করা যায় না, লোকে হাসবে! তাই জোনাকি খুব খেটে আই.এস.সি. দিল। ফার্স্ট ডিভিশনটাও হল না। তারপর থেকে সে হাঁফ ছেড়ে সাদামাটা হয়ে গেল। বি.এসসি.—তে পিওর ম্যাথমেটিকসে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেল, এম.এসসি. পড়ল না। চাকরি পেয়ে করতে লাগল।

সেই টেনথ হওয়ার কথা ভাবলে আজকাল ভারি লজ্জা করে। কেন যে সে টেনথ হতে গেল! ওই একবার টেনথ হওয়ার ফলে সবাই পরবর্তী জোনাকিকে দেখে দুঃখ করে। বলে— তোমার ব্রিলিয়ান্ট ক্যারিয়ার হওয়ার কথা ছিল যে জোনাকি, এ তুমি কী হলে? এরকম দুঃখ মাঝে মাঝে জোনাকিরও হয়।

কেউ কেউ বলে সায়েন্স না পড়ে আর্টস পড়লেই জোনাকি ভালো করত। কিন্তু তা জোনাকির মনে হয় না। সে তো সেই আই. এসসি. পড়ার সময় থেকেই বিস্তর খোঁজখবর রাখত। ই ইজ ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার, আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত ইকুয়েশন পর্যন্ত জানা ছিল তার। এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু মাস টাইমস দি স্পিড অফ লাইট স্কোয়ারড। ক—জন জানত তা? বি.এসসি. বই থেকে সে অঙ্ক কষত ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে। তবু পারা গেল না। আসলে বোধহয় জীবনে ওই একটাই ভুল করেছিল, সে স্কুল ফাইনালে দশম হয়ে। সেটা না হলে আজ কারও দুঃখ থাকত না। তার নিজেরও না।

যে চোখ বাঁধা ম্যাজিসিয়ান এতক্ষণ এলোপাতাড়ি তির ছুড়ছিল মাটিতে, সে এবার তার খেলা থামিয়েছে। বৃষ্টি ধরল। না ধরলেও ক্ষতি ছিল না। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই।

বেরোবার মুখে একজন বয়স্ক লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছিল। বলল— এরকম বৃষ্টির কোনো মানে হয়? বলুন তো?

জোনাকির মনে হয় মুখটা চেনা—চেনা। সে বলল— আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটা তার দিকে চেয়ে একটা চেনা—হাসি দিয়ে বলে— সীতানাথকে খুঁজতে এসেছিলেন? ওর ভীষণ ফুটবলের নেশা।

জোনাকি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে বলে— আপনি কি ওর অফিসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছেন আমাকে, মনে নেই বোধহয়। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি, সতীনাথের কাছে মাঝে মাঝে পুরোনো অফিসে আসতেন। তখন থেকেই চিনি। আপনি তো জোনাকি সেনগুপ্ত স্কুল ফাইনালে —

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জোনাকি তাড়াতাড়ি বলে লোকটাকে কথা শেষ করতে দেয় না।

—সীতানাথকে তো পেলেন না, এখন কোনদিকে যাবেন?

—ভাবছি। বলে জোনাকি।

—ভাবাভাবির আর কী? চলুন আমার বাসায় চলুন।

জোনাকি অবাক, বলে— আপনার বাসায়? লোকটা অমায়িক হেসে বলে— বেশিদূর নয়। বেকবাগান। আমার ছেলে—মেয়েরা কখনো স্ট্যান্ড করা ছাত্র দেখেনি। আপনাকে দেখলে খুব ইমপেটাস পাবে। চলুন না, সবাই খুব খুশি হব আমরা।

হঠাৎ জোনাকি রাজি হয়ে গেল, বলল— চলুন।

দুই

তিতিরের মাথায় নানারকম রান্নার পোকা ঘুরে বেড়ায়। যেমন আজ সন্ধেবেলা তিতির একটা অদ্ভুত রান্না করল, ডিমের সঙ্গে বেগুন দিয়ে ওমলেট। তার নাম দিল— ডিমবেগ। পাতলা করে কাটা বেগুনের চাক ফেটানো ডিমে ভিজিয়ে ডোবা তেলে ভাজা। মন্দ নয় খেতে, একটা চোখে দেখল তিতির। তেলটা বড্ড বেশি লাগে।

ভেবে একটু ভ্রূ কোঁচকায় তিতির। বেশি তেলের ব্যাপারটা তাকে খোঁচা দেয়। বাস্তবিক, এই তেল—টেল নিয়ে ভাবতে তার একদম ভালো লাগে না। ভাবার অবশ্য দরকার নেই। তার সংসারে অভাবের ছিটেফোঁটাও নেই, বরং সবই অঢেল আছে। আসছেও। কিন্তু তবু বেশি তেল লাগার ব্যাপারটা তাকে তার বাপের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানে এখনও তার আত্মীয়রা তেল, চাল ইত্যাদির ব্যাপারে বড়ো সতর্ক। সেই মানসিকতা আজও একটু রয়ে গেছে তিতিরের।

ফেটানো ডিম আর বেগুনের চাক সরিয়ে রেখে রান্না করার লোক চিত্তর দিকে তিতির তাকাল। সে রান্না করছে বলে চিত্ত এতক্ষণ সরে দাঁড়িয়ে অন্য কাজ সেরে নিচ্ছিল।

তিতির বলল— খাওয়ার সময় ওগুলো ভেজে দিও।

চিত্ত ঘাড় নাড়ে। তিতির চলে আসে।

কী বিশাল এই ফ্ল্যাটবাড়িটা! হাঁটলে যেন জায়গা ফুরোয় না। এক লাখের কাছাকাছি দাম পড়ল ফ্ল্যাটটার। তার ওপরে মেইনটেনেন্স চার্জও অনেক পড়ে যায় প্রতি মাসে। এসব নিয়ে ভাবার কিছু নেই। তবু হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়— কতগুলো টাকা!

এ—দেওয়াল ও—দেওয়াল জুড়ে জানালা। খুলে দিলে ঘরটা বারান্দা হয়ে যায়। সাত তলার ওপর থেকে নীচের দিকে তাকায় তিতির। এত ওপরে থেকে অভ্যাস নেই তো। মাথা ঘোরে। জানলাগুলোয় কেন যে ছাই গ্রিল দেয়নি ওরা! অমিতও অবশ্য গ্রিল লাগাতে রাজি নয়, বলে— গ্রিল দিলে খাঁচার মতো হয়ে যাবে। কিন্তু তিতিরের ভয় করে। আকাশটা যেন হাত বাড়িয়ে রয়েছে। একতলা পর্যন্ত বিশাল শূন্যের ব্যবধান যেন ক্রমাগত জানলা দিয়ে তাকে ডাকে— এসো, লাফিয়ে পড়ো।

তিতির সরে আসে। লাফিয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। তার জীবনে কোনো দুঃখ আছে?

অমিত দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফেরার সময়ে একটা মস্ত টেলিভিশন সেট নিয়ে এসেছে। সামনের ঘরে সেটা রাখা, ওপরে পুতুল, ফুলদানি। এখনও অবশ্য টেলিভিশনের পরদা অন্ধকার। কলকাতায় টিভি চালু হলে তারা দেখবে সেই আশায় আগে থেকে এনে রেখেছে অমিত। বিদেশ থেকে আনা কত কী তাদের ঘরে!

তিতিরের মুখখানা ছিল সুন্দর। বয়সকালে শরীরটা দেখনসই হয়েছিল। তার জোরেই না অসম্ভব ভালো পাত্র জুটে গেল তার! তিতির আয়না দেখল না, কিন্তু টিভি সেটের সামনে একটা গদির হেলানো চেয়ারে বসে নিজের মুখখানার কথা, সৌন্দর্যের কথা ভাবতে লাগল।

দু—বছর হয়ে গেল, অমিত এখনও ছেলেপুলে চাইছে না। কিন্তু পুরুষমানুষের ছেলেপুলের ঝোঁক থাকেই। কবে বলবে— তিতির এবার ছেলে দাও।

যতদিন তা না চায় অমিত, ততদিন তিতির বেশ আছে।

না, খুব ভালো অবশ্য নেইও তিতির। ওই যে শিকহীন গ্রিলহীন মস্ত জানলাগুলি, ও গুলোকেই ভীষণ ভয় তার। দিনের বেলায় রোদভরা আকাশ, রাতে আকাশভরা জ্যোৎস্না বা অন্ধকার, নক্ষত্ররাশি, হাওয়া সব কেমন হুহু করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে! ঘরটা যেন বাহির হয়ে যায়! একা থাকে তিতির। ওপরের ফ্ল্যাটে বা পাশের ফ্ল্যাটে কোনো শব্দই হয় না, কারও গলার স্বর কানে আসে না, নীচের রাস্তাটাও নির্জন— সেখান থেকে এত ওপরে কোনো শব্দ উঠে আসে না। আর এই গভীর নিস্তব্ধতায় ওই খোলা জানলা দিয়ে হাতির মতো ঢুকে আসে বাইরেটা। ভীষণ হু হু করে ঘরদোর। হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে সব উলটেপালটে দেখে, এঘর ওঘর খুঁজে বেড়ায়, বলে— খুব সুখী তুমি তিতির।

সুখীই তিতির। শুধু ওই খোলা জানলাগুলোই তাকে দুঃখ দেয়। আগে ছেলেপুলে হোক, তখন অমিতকে বলবে গ্রিল দিতে। ছোটো খোকা হামাগুড়ি দেবে, হাঁটতে শিখবে, ডিং মেরে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দেবে— মাগো তখন যদি পড়ে যায়? খোকার জন্য তখন ঠিকই গ্রিল দিতে রাজি হবে অমিত। কিন্তু এসব বাড়িতে গ্রিল দেওয়ার নিয়ম আছে কিনা কে জানে! হয়তো কোম্পানি থেকে বলে দেবে যে, গ্রিল—ট্রিল চলবে না, তাতে বাড়ির সৌন্দর্য থাকে না।

তিতির উত্তর দেবে— হ্যাঁ হাতিভাই, আমি খুব সুখী। তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যেও।

বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসে না। না আসাই স্বাভাবিক। ওরা আসতে ভয় পায়। সংকোচ বোধ করে। বড্ড বড়োলোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যে তিতিরের। সবসুদ্ধ তিন বোন তারা। তিতির ছোটো। বড়ো দুই দিদির ভালোই বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা এখন সূর্যের পাশে মাটির পিদিম হয়ে গেছে।

এসব ভাবতে বুকে একটু দুঃখ আর একটু সুখ, দুটি ঢেউ ভাঙে।

টুং করে কলিং বেল—এ পিয়ানোর একটা রিডের শব্দ ওঠে। রোজ এরকম শব্দ। দরজায় একটা কাচের চৌখুপি আছে। সেইটি দিয়ে দরজা খোলার আগে দেখে নেয় তিতির। হ্যাঁ, অমিত।

অমিত ঘরে আসে। আগে আগে দরজার কাছেই সর্বাঙ্গ দিয়ে চেপে ধরত তিতিরকে, মুখের সর্বত্র চুমু খেয়ে নিত। আজকাল খায় না। অত কী? রোজ তো খাচ্ছেই অন্য সময়ে।

অমিত ঘরে ঢুকে বলে— আজও?

তিতির চমকে বলে— কী?

—তুমি ম্লানমুখী।

তিতির লজ্জা পেয়ে বলে— না। জানো, আমি না ওই জানলাগুলোর কথা ভাবছিলাম। বড্ড ভীষণ ফাঁকা।

—ওঃ! আমি ভাবি, বুঝি তিতির তার কোনো পুরোনো প্রেমিকের কথা ভাবছে।

তিতির রাগ করে বলে— ভাবছি তো! সে এসে ওই জানলা দিয়ে ডাকে। একদিন ঠিক ঝাঁপ দেব।

অমিত একটু বেঁটে, কালো, একটু মোটাও। ইদানীং মেদ কমানোর জন্য স্লিমিং কোর্স নিচ্ছে। অফিসের পর সেখানে যায়। আলু মিষ্টি খায় না। কত খাবার বানায় তিতির। ও খায় না। কেবল একটুআধটু ড্রিঙ্ক করে। ওর বেহিসেবি হলে চলে না। কত কাজ ওর!

—আজ একটা নতুন খাবার করলাম মাথা খাটিয়ে।

—কী?

—ডিমবেগ। খেতে বসে দেখবে, আগে বলব না, কী দিয়ে তৈরি হয়েছে।

অমিত হেসে বলে— তোমার সেই নিরামিষ ডিমের কারিটা যেন কী দিয়ে করেছিলে?

—কেন? খারাপ হয়েছিল? ডিমের বাইরের সাদাটা করেছিলাম ছানা দিয়ে, আর ডালসেদ্ধ দিয়ে কুসুম।

—বেশ হয়েছিল। তবে কিনা ওসব বেশি খেলে আমার আবার না ফ্যাট বাড়ে।

—তা বলে না খেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেলবে নাকি? ওসব চলবে না। ঘরভরতি এত খাবার, খায় কে বলো তো?

তিন

ভদ্রলোকের নাম শচীন দাশগুপ্ত। ছেলে—মেয়েদের সামনে জোনাকিকে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন—এই ইনি স্কুল ফাইনালে—

জোনাকি লজ্জা পায় আজও। বাঘটা একবার বেরিয়েছিল, তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জোনাকিকে শচীনবাবু তাঁর ঘরের সবচেয়ে ভালো চেয়ারে বসালেন, এমনভাবে বসালেন যাতে মুখে ভালোভাবে আলো পড়ে। তাঁর চার—পাঁচজন ধেড়ে—ধেড়ে ছেলে—মেয়ে হাঁ করে দেখছিল, গিন্নিও এলেন। এক বুড়ো আত্মীয় কেউ এসেছেন, তিনি বাক্যহারা। স্ট্যান্ড করা ছেলে। ইয়ার্কি নয়।

কেবল জোনাকিই জানে— এটা কত বড়ো ইয়ার্কি। তবু খারাপ লাগে না। শচীনবাবুর বড়ো মেয়েটি যুবতী। সে বেশ চেয়ে থাকতে জানে। জোনাকির খারাপ লাগছিল না।

বুড়ো আত্মীয়টি জিজ্ঞেস করেন— কী করেন?

—চাকরি।

—আ হা, চাকরি করেন কেন? ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা এডুকেশন লাইনে থাকলে ছাত্ররা কত কী শিখতে পারে! বড়ো চাকরির লোভে কত ভালো ছেলে নিজেকে নষ্ট করে, দেশও বঞ্চিত হয়।

—আমি বড়ো চাকরি করি না। সামান্য কেরানি।

—সে কী? বলে শচীনবাবুর আত্মীয় চেয়ে থাকেন।

শচীনবাবু একটু মলম লাগানোর চেষ্টা করে বলেন— তাতে কী? উনি টেনথ হয়েছিলেন সেটা কি তা বলে মুছে গেছে? বোর্ডের খাতায় তো আর নামটা মুছে ফেলেনি। যাকে বলে দশজনের একজন।

—তা বটে। বলে আত্মীয়টি নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন বোধহয়।

জোনাকির লজ্জা করছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারল, শচীনবাবুর মেজো ছেলে তার মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে দোকানে গেল খাবার আনতে। শচীনবাবুর বড়ো মেয়ে জোনাকিকে একটুও অপছন্দ করছে না। কেবল আত্মীয়টি উঠে বললেন— চলি। রাত হল। কেউ তাকে থাকতে বলল না।

কথাবার্তা তেমন কিছু হল না। কী করে হবে, এদের সঙ্গে যে মোটেই পরিচয় নেই। তা ছাড়া টেনথ হওয়া ছেলে। মুখ ফসকে বেশি কথা বলা ভালোও দেখাবে না। মিষ্টি খেয়ে উঠে পড়ল জোনাকি।

শচীনবাবু আর তাঁর স্ত্রী বললেন— আবার আসবেন। খুব ভালো লাগল।

শচীনবাবুর বড়ো মেয়ে নিমি আলাদা করে বলল— আসবেন কিন্তু। আগে খবর দেবেন, আমার বন্ধুরাও আসবে দেখতে।

জোনাকির বড়ো লজ্জা করছিল। বাঘটা মোটে একবার—

বেরিয়ে এসে জোনাকি দেখল, এখনও মোটেই রাত হয়নি। বাড়ি গিয়ে কিছু করার নেই। বাবা সাত সকালে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মা বড়োমেয়ের বাচ্চার জন্য কাঁথা সেলাই করছে। সাঁঝ—ঘুমোনী ছোটো বোনটা বিবিধ—ভারতী চালিয়ে শুয়ে আছে। বড্ড ছোটো বাসা।

ওই বাসায় তিতিরকে মানাত না। তার চেয়ে বরং শচীনবাবুর বড়ো মেয়েকে বেশ মানায়। ভাবতেই হঠাৎ চমকে ওঠে জোনাকি। তাই তো! শচীনবাবুরা দাশগুপ্ত না! পালটি ঘর। তবে কি শচীনবাবু ভেবে—চিন্তে প্ল্যান মাফিক জোনাকিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে? আশ্চর্য নয়। হয়তো অফিসের গেট—এ তাকে দেখেই শচীনবাবুর মাথায় কল্পনাটা খেলে থাকবে। কেরানি হোক আর যা—ই হোক, এক সময়ের টেনথ হওয়া ছেলে তো!

ভাবতেও জোনাকির লজ্জা করছিল। এ হয় না। ওই টেনথ হওয়ার জন্যই এক সময়ে তিতিরও তাকে পছন্দ করেছিল। পরে, ভুল বুঝতে পারে। বাঘটা একবারই—

খুব একটা সুন্দর রাস্তা দিয়ে এখন হাঁটছে জোনাকি। এসব রাস্তায় তো বড়ো একটা আসা হয় না। চারদিকে বিশাল—বিশাল নির্জন সব অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠেছে, আরও কিছু বাড়ির কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। হুশ করে একটা দুটো মোটরগাড়ি চলে যায়। আর কোনো শব্দ নেই। কারা থাকে এখানে? শিকারি, না বাঘ?

বৃষ্টি এল। উপায় কী, জোনাকি দৌড়ে গিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় উঠে পড়ল। আসলে দরজাও ঠিক নয়, মস্ত গ্যারেজ ঘরের ফাঁকা জায়গা। দারোয়ান বসে বৃষ্টি দেখছে আর খইনির থুতু ফেলছে। তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। জোনাকি দাঁড়িয়ে অজস্র ঝিকিয়ে ওঠা অস্ত্রের মতো বৃষ্টির ধার দেখে। কিছু করার নেই। তবে অপেক্ষা করতে তার মন্দ লাগে না। কোথাও তো যাওয়ার নেই। সেই দু—বছর আগে, যখন তিতির ছিল, তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। তিতিরই তো একটা জায়গা। কত সুন্দর সব দৃশ্য ছিল তিতিরের নানা ভঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে।

সেই ভীতু বাঘটা কেন কোনোদিনই বেরিয়ে এল না? কেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ওইভাবেই লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ওইভাবেই লুকিয়ে থেকে সে কি মরে গিয়েছিল একদিন? কেন গর্জন করে বেরিয়ে আসেনি? সত্য বটে শিকারিরা ছিল, তাদের হাতে ছিল কার্তুজ—ভরা রাইফেল। কিন্তু এও তো সত্য যে ছিল অবারিত মাঠ, বিশাল পৃথিবীর মুক্তিও। সে উত্তাল গতিতে বেরিয়ে ছুটে চলে যেতে পারত, সেই মুক্তির দিকে। শিকারির গুলি কি সব বাঘের গায়ে লাগে। লাগলেই বা কী, তবু তো বুঝতে পারত, তার মৃত্যুও কারও—কারও প্রয়োজন! তাই অত শিকারির আনাগোনা, অত সতর্ক দৃষ্টি অত ক্যানেস্তারা পেটানো। কত গুরুত্ব তার!

একটা গাড়ি কেমন চমৎকার সবুজ। কী বিশাল তার চ্যাপটা আর সবুজ দেহখানি। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকল। একজন লোক নেমে চলে গেল লিফটের দিকে। ফিরেও তাকাল না। হতে পারত জোনাকিও ওরকম। যদি কেবলমাত্র দশম হওয়াটুকু বজায় রাখতে পারত সে। কেন পারেনি, তা আর একবার ভাববার চেষ্টা করল সে। ভেবে দেখল, পারেনি বলেই পারেনি। বড্ড বেশি সচেতন হয়ে গিয়েছিল নিজের সম্পর্কে। মফস্সলর স্কুলে এক গরিবের ছেলের অতটা হওয়ার কথা নয় তো! বড্ড বেশি পড়ত, তাতেই মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। কিংবা কী যে হয়েছিল এতদিন পর তা আর মনে পড়ে না।

যদি হত তবে জোনাকিকুমার আজ এরকম একটা মস্ত ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে পারত, গাড়ি চালাত। তার বউ হত তিতির বা ওরকমই কেউ। খুব সুন্দর। এই বৃষ্টি বাদলার পৃথিবীতে কেবলই পথ ছেড়ে উঠে এসে পরের দরজায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে বৃষ্টি দেখতে হত না। বেশ সুখেই থাকত এক সফল জোনাকিকুমার। নিমির মতো হাঘরে মেয়েরা তাদের তুচ্ছ ঘর—সংসারে তাকে ডাক দেওয়ার সাহসই পেত না।

এত বৃষ্টি! ঝড়ের হাওয়ার সমুদ্র থেকে উঠে আসে মেঘ। পরতে—পরতে আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। রাস্তায় প্রতিহত জলকণা উঠে চারদিক ঝাপসা করে দেয়। চেনা পথ ধুয়ে যায় বৃষ্টিতে, ঘরে ফেরার দিকচিহ্ন উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝড়। আজও মনে হয়, এই দুর্যোগেও কোথাও যাওয়ার নেই জোনাকির। এই তো বেশ দাঁড়িয়ে আছে। কেটে যাচ্ছে আসলে খানিকটা সময়। জোনাকির সময়ের অভাব নেই। সে যদি সফল জোনাকি হত তো থাকত। কত ব্যস্ততা, কত টেলিফোন, কত নানাজনের ডাক। সেসব নেই জোনাকির। মস্ত বাড়ির তলায় নীচু গ্যারাজ ঘরে এই কেমন ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছে। অনেকগুলো গাড়ি চলে এল গ্যারেজ ঘরে। কত গাড়ি! দারোয়ান উঠে আলো নেভাচ্ছে। এরপর দরজা বন্ধ করবে। তার আগে হয়তো বা চলে যেতে বলবে জোনাকিকে। সে বড়ো অপমান। এ—বাড়িতে তার ঘর নেই ঠিকই, কিন্তু তা বলে কোনো জায়গা থেকে কেউ চলে যেতে বললে আজও অপমান বোধ করে সে।

জোনাকি তাই বৃষ্টিতেই নেমে এল। কী প্রবল ধারা। গায়ে ছ্যাঁক করে শীতের ছোঁয়া লাগল প্রথমে। তার ফাঁকা মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা ডুগডুগ করে বেড়ে উঠল। লক্ষ আঙুল দিয়ে বৃষ্টি তাকে চিহ্নিত করে বলতে থাকে — ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!

কোথাও যাওয়ার নেই। তবু যাওয়া থেকেই যায় মানুষের। কেন যে যায়! থেমে পড়লেই তো হয় মাঝপথে! কেন কেবল যেতেই হবে?

রাস্তায় লোকজন নেই। একা জোনাকি হেঁটে চলেছে। চোখ অন্ধ ও শ্রবণ বধির করে দিয়ে অনন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে যেতে থাকে। পোশাক চুপসে যায়। কাঁপুনি উঠে আসে শরীরে। ভিজে—ভিজে হাঁটে জোনাকি চারদিকে মেঘ ডাকছে। একটা বজ্রপাতের শব্দ হয়। জোনাকি একবার বলে— জানো না তো তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার মধ্যে কীরকম আনন্দ আছে!

কাকে বলে কে জানে!

চার

—ওগো শোনো, কী ভীষণ ঝড় উঠল। তিতির ভয়ের গলায় বলে।

তাকে বুকে টেনে নিয়ে অমিত বলে— ঝড়! তাতে কী? এ—বাড়িতে কোনো ভয় নেই তো তিতির!

বড্ড হাওয়ার শব্দ হচ্ছে যে!

—এত ওপরে একটু বেশি হাওয়া তো লাগবেই। কিছু ভয় নেই। আমার তো ইচ্ছে করে এই ঝড়ের মধ্যে বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে পড়ি। খোলা হাওয়া বৃষ্টির জল আমাকে ধুয়ে মুছে দিক।

—আহা।

—সত্যিই। খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি তো যেতে দেবে না।

—দেব না—ই তো!

—জানি। বড্ড রুটিন হয়ে গেছে জীবনটা।

—রুটিন না হলে চলে? তোমার কত কাজ! তিতির ওকে একটু আদর করে বলে।

একটু ড্রিঙ্ক করেছিল অমিত। বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তিতিরের আর ঘুম আসে না। সে উঠে এয়ারকুলার বন্ধ করে দিল। ঠান্ডা লাগছে।

একটু ধূসর পরদায় জানলাগুলো ঢাকা। পরদা নড়ছে না। কিন্তু বাইরে হুঙ্কার দিয়ে ফিরছে ঝোড়ো বাতাস। কাচের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে অবিরল টোকা দেয় গোপন প্রেমিকের মতো। তিতিরকে ডাকে।

উঠতেই হয় তিতিরকে। একটা বাজ পড়ল কোথায়। বাড়িটা তার অজস্র কাচের শার্সি নিয়ে ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। ঘুম আসবে না। এরকম ঝড়বৃষ্টির রাতেই ভালো ঘুম আসে লোকের, কিন্তু তার আসবে না।

তিতির পরদাটি সরিয়ে দেখে, কলকল করে জলস্রোত নেমে যাচ্ছে শার্সি বেয়ে। নীচে একটা ডাইনির শহর— যত না তার আলো তত বেশি ভূতুড়ে অন্ধকার। বাড়ি—ঘর সব যেন নুয়ে গেছে, গাছপালা হয়ে গেছে কাল্পনিক গাছের ছবির মতো, আলোগুলো বৃষ্টিতে দিপদিপ করে। এত উঁচু থেকে সবই মনে হয় বড্ড দূরের। মাঝখানে শূন্য। আর এই গভীর রাত্রে শার্সি ভেদ করে সেই শূন্যটা ঘরের মধ্যে চলে আসতে থাকে।

বাতি জ্বেলে টিভি সেটটার মুখোমুখি এসে বসে তিতির। হাই তোলে। অমিতের জন্য একটা সোয়েটার বুনছিল, সেইটে নিয়ে বসে।

হাতিটা ভেজা গায়ে সামনে দাঁড়ানো, বলে— খুব সুখে আছ তুমি তিতির।

—হ্যাঁ হাতিভাই। কেবল ওই জানলার গরাদ লাগানো বাকি। সেটা হয়ে গেলে আর কী চাই!

—সেটা লাগাতে খুব বেশি দেরি কোরো না তিতির। কী জানি, কবে তোমাকে আমি চুরি করে নিয়ে যাই জানলা নিয়ে।

—ও কথা বোলো না হাতিভাই। আমি তো কোনো পাপ করিনি যে মরব। বরং এত সুখে থেকেও আমি কখনো আর দশজনের কথা ভুলি না। গত রবিবারে আমরা আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিয়ে এলাম। শিরাতে ছুঁচ ফুটিয়ে কত রক্ত বের করে নিল বলো তো! অনাথ আতুরদের জন্য যে ফান্ড খোলা হয়েছে তাতে আমরা প্রতি মাসে অনেক টাকা দিই, মাঝে মাঝে কালেকশনে বেরোই। মূক—

বধিরদের জন্য অন্ধদের জন্য, আমরা সব সময়েই ব্যথিত। যা পারি, যতখানি পারি করি। সুখী বলেই স্বার্থপর ভেবো না আমাদের।

হাই উঠছে। ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ। তবু ঘুমোতে গেলেই কী একটা হয়। এই ঝড় জলের রাতটা তার দুর্যোগ নিয়ে কেবলই ঢুকে আসে ফ্ল্যাটে। কেন যে এত বড়ো জানলা করেছে এ—বাড়িতে। কোনো মানে হয় না। আকশ ঢুকে পড়ে, বাতাস ঢুকে পড়ে। শূন্যতাও বেড়াতে আসে নির্লজ্জ প্রতিবেশীর মতো, এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিতিরের সুখ—দুঃখের খতিয়ান নিয়ে যায়, বিশ্রী। অমিত কিছুতেই তিতিরের একটা কথা শুনতে চায় না। ও কি বোঝে না যে জানলায় একটা প্রতিরোধ দরকার! ভীষণ দরকার!

টিভি—র পরদাটা ঢালু, তার আলোহীন কাচে কোনো ছবি দেখা যায় না। কবে যে কলকাতায় টিভি চালু হবে! শোনা যাচ্ছে, ওয়ার্ল্ড টেবিল টেনিস দেখাবে এবার। তাহলে কিছুদিনের জন্য বাঁচা যায়। স্নেহভরে একবার চমৎকার সেটটার দিকে চেয়ে থাকে তিতির।

হাতিটা এখনও যায়নি বুঝি! তিতিরকে ডেকে বলল— বলো তো সুখ কাকে বলে!

—সুখ! বলে তিতির ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। বলে— কী জানি বাবা! তোমার সব শক্ত প্রশ্ন। তবে মনে হয়, যার কখনো পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে না, যে কখনো অতীত নিয়ে ভাবে না, অনুতপ্ত বা দুঃখিত হয় না, যে কেবল প্রতিটি বয়ে যাওয়া মুহূর্তকে অনুভব করে— সেই সুখী।

উঠে ফের বাতি নিভিয়ে দেয় তিতির। বাইরে যে আজ কী প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে! মাগো, গরিব—দুঃখীদের বড়ো কষ্ট।

—তোমার কিছু মনে পড়ে না তিতির?

হাতিটা তবে এখনও যায়নি! তিতির ভ্রূ কুঁচকে বলে— ওঃ! হ্যাঁ চেষ্টা করলে আবছা সব মনে পড়ে। মনে পড়লে ভীষণ হাসি পায়।

—কীরকম?

—এই ধরো না, আমি একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করতাম। সে স্কুল ফাইনালে টেনথ হয়েছিল। তারপর আর কিছু হয়নি। মনে পড়ে খুব একটা প্রেম হয়েছিল। ভারি মজার নাম ছিল তার জোনাকি!

অন্ধকার হাতড়ে—হাতড়ে শোওয়ার ঘরের দিকে চলেছে তিতির। আর একা একা খুব হাসছে। এত হাসি পায়। জোনাকি! কী নাম বাবা।

শোওয়ার ঘরে এসে একটু চমকে যায় তিতির। পরদাটা সরানো। মস্ত জানলা কে অমন আদুড় করে দিল? বাইরে একটা ধূসর পাগলা ঝড়। মুহুর্মুহু কাচের শার্সিতে করাঘাত করছে এসে এক মহাশূন্য। বাতাস আকাশ। শার্সি জুড়ে এক বিশাল পরদার টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে এক মহাজগতের মহাপ্রলয়।

শিউরে ওঠে তিতির। ও মা! জানলার একটা ধারের ছোট্ট একটা পাল্লা কে কখন খুলে দিল। বৃষ্টির প্রবল ছাঁট আসছে, বাতাস ঘূর্ণির মতো পরদাটাকে ওড়াচ্ছে কোণের দিকটায়। তিতির জানলার কাছে দৌড়ে গেল। কিন্তু পাল্লার কাছে পৌঁছোতে পারল না। সেই আদিম পাগল ঝড়টা তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল— সরে যাও, সরে যাও, আমি তোমার ঘর তল্লাশি করতে এসেছি।

তিতির ভয় পেয়ে সরে আসে।

বিছানায় একটা হালকা চাদর গায়ে চাপা দিয়ে শুতে গিয়েই ফের ভীষণ চমকে ওঠে। অমিত কোথায় গেল?

—ওগো! বলে ভয়ার্ত তিতির উঠে বসে। কোনো উত্তর আসে না।

বাইরে হো হো করে হেসে ওঠে বাতাস। আকাশ বাঘের মতো ডেকে ওঠে শিকার খুঁজে পেয়ে।

—কোথায় গেলে তুমি?

অন্ধের মতো তিতির উঠে অন্ধকার ঘরে ঘুরতে থাকে। ঘরের একধারটা ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টিতে, বাতাসে। ওই রন্ধ্রপথে বারবার বাহির চলে আসে ঘরের মধ্যে। ঘরটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাইরে। আব্রু নষ্ট করে।

অমিতকেও কি নিয়ে গেল?

ককিয়ে কেঁদে ওঠে তিতির। ও একটু আগেই বলেছিল, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ওর চলে যেতে ভালো লাগে। তিতির ভীষণ চিৎকার করে বলে— এত তাড়াতাড়ি আমার সব কেড়ে নিও না। ওগো, কে তুমি বারবার আসো ঘরের মধ্যে? দয়া করো।

মস্ত ঘরের এককোণে একটু ছোট্ট দেশলাই কাঠির তিনকোণা আগুন জ্বলে ওঠে। অমিত বলে— তিতির, আমিও তোমাকে খুঁজছি। এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দিয়েছ, দমবন্ধ লাগছিল, তাই একটা পাল্লা খুলে দিয়ে বসে আছি।

—ডাকোনি তো! তিতির চোখ মুখে, কান্না গিলে হেসে ফেলে।

অমিত চুপ করে থাকে। তারপর বলে— সবসময়ে ডাকতে নেই তিতির। মানুষের মাঝে মাঝে একদম একা হওয়া দরকার। আমিও দেখো না, একা বসে ঝড় দেখছি কখন থেকে!

তিতির কাছে গিয়ে বলে— কেন গো?

—ওঃ তিতির। কী প্রকাণ্ড এই আকাশ, কী বিরাট শূন্যতা চারদিকে। আর কী ভয়ংকর শক্তিমান ঝড়। এ—সব দেখলে নিজেকে তুচ্ছ লাগে বড়ো। মাঝে মাঝে, নিজেকে তুচ্ছ ভাবতে কী যে আনন্দ হয়!

ঘরের পথ

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে। কেউই আর ফিরল না।

আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির। তাতে ফাটল ধরেছিল। যখন বাতাস বইত তখন সেই ফাটলের মুখে শিস দেওয়ার মতো শব্দ হত। যেন বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। কখনো কখনো রাত্রিবেলা সেই শব্দে ভয় পেয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম, মা আমাকে। মাটির দাওয়ায় কিংবা দেওয়ালে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখলেই মা আমাকে সেটি কেটে ফেলতে বলত। আশ্বত্থ চারা কাটতে কাটতে আমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবসর পেলেই আমি দা হাতে অশ্বত্থ চারা খুঁজে বেড়াতাম।

ঘরের চালে ভালো খড় ছিল না। বর্ষাকালে জল পড়লে আমাদের ভিজতে হত। সারা ঘর যখন জলে থইথই করত তখন মা আমাকে আধখানা আঁচলের আড়ালে রেখে আমাদের আগের দিনের সুখের গল্প বলত। আমাকে আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল মার স্বভাব। শীতে কিংবা বর্ষায় কিংবা ঝড়ে আমি মার আঁচলের আড়ালে চাপা থাকতাম। আমার বাবার একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা কোনো কাজ করত না। আমি ঘাস কেটে এনে ওকে খাওয়াতাম। ঘোড়াটাকে বাবা খুব ভালোবাসত। আমি বাবাকে দেখিনি। যখন আমি ছোটো ছিলাম, তখন বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। তারপর আর ফেরেনি। আমি বাবার ঘোড়াকে ভালোবাসতাম। ওর গায়ের গন্ধে আমার বাবার কথা মনে পড়ত।

বাবা ফিরল না দেখে মা পাহাড়ে কাঠ—পাতা কুড়োতে যেত। আমাদের গাঁয়ের গরিব মানুষেরা সবাই কাঠ কুড়োত। মা তাদের সঙ্গে খুব ভোরে চলে যেত। ফিরত সন্ধেবেলায়, কখনো কখনো রাত্রি হত। যাওয়ার সময় মা বলত, সারাদিনে ঘর পাহারা দিও। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিও। সন্ধেবেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটা আগুন জ্বেলে তার পাশে বসে থেকো। পাহাড় থেকে আগুনটি দেখতে পেলেই আমি বুঝব তুমি ভালো আছ, ঘরে আছ। তা হলেই আমার ভাবনা থাকবে না।

আমি সারাদিন ঘরে থাকতাম। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিতাম। আর সন্ধে হলেই শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটি মস্ত আগুন জ্বালতাম। আগুনের পাশে বসে দেখতাম দূরে বহু দূরে নীল পাহাড় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁ—দিকে মস্ত মাঠের ওপাশে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পাহাড়টি মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যেত। তবু পাহাড়টি আমার চোখ থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। ছবির মতো পাহাড়টা আমার চোখের ওপর স্থির থাকত। আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিবে আসত। পাহাড়টিকে আমার বড়ো ভয়। ওই পাহাড় পেরিয়ে আমার বাবা চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। মা কখন ফিরবে ভাবতে ভাবতে আমি কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ে মা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতাম।

কখনো কখনো মা আমাকে বাবার গল্প বলত। ওই পাহাড়ের ওপাশে অনেক নদী—নালা খাল—বিল পেরিয়ে বাবা বিদেশে গেছে। সেখানে যেতে হলে ক—টা নদী ক—টা পাহাড় পার হতে হয় মা জানে না। মা শুধু জানে, একদিন বাবা অনেক রোজগার করে ফিরে আসবে। তখন আমি নতুন জামা জুতো পরে একটা বাচ্চচা ঘোড়ায় চড়ে বাবার বুড়ো ঘোড়াটার পাশে পাশে টগবগিয়ে কোথাও চলে যাব।

মা কখনো কখনো পাহাড়টাকে অভিশাপ দিত, ওটা গোটা পৃথিবীটাকে আড়াল করে বসে আছে বলে। আবার কাঠ—পাতা কুড়োতে ওই পাহাড়েই যেত।

একদিন মা আর ফিরল না। অনেকক্ষণ জ্বলে জ্বলে আগুনটা নিবল। দূরের নীচে পাহাড় মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হল। মা আর ফিরল না।

ভোর হতেই আমি মার খোঁজে বেরোলাম।

যারা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরেছে, শুধু আমার মা বাদে। তাদের মধ্যে একজন বলল, তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। তুই ছিলি গলার কাঁটা, তাই তোকে ফেলে গেছে।

আমার বিশ্বাস হল না। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। আমার পিঠে চওড়া হাতের চাপড় মেরে বলল, 'তার জন্য ভাবনা কী, তুইও তো জোয়ান মরদ হয়ে উঠবি দু—দিন বাদে। খেটে খেতে পারবি না? চিরকাল কি মায়ের আঁচল চাপা থাকে কেউ, না কি আমাদের তাই করলে চলে?'

মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে সারা গাঁ পাতি পাতি করে খুঁজলাম। ওরা বলল,'খুঁজে কী করবি! তার চেয়ে পাহাড়ে চল। পাতা কুড়োবি।'

আমি পাহাড়ে গেলাম। কিন্তু কাঠ—পাতা কুড়োতে মন গেল না।

ওরা বলল, 'তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। আয়, কাঠ কুড়োবি।'

আমি জেনেছিলাম যে আমি আছি বলেই মার সুখ। সুখ মানেই দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। আমি আছি বলেই মার সেই শক্তি আছে। অনেক বড়ো হয়ে জেনেছিলাম যে আমিই মার দুঃখ, আমি ছিলাম বলেই মা সুখের খোঁজে চলে যেতে পারছিল না। দুঃখ মানেই সুখের পথ আগলে যে দাঁড়ায়।

আমার বাবা গেল পাহাড়ের ওপারে, আমার মা—ও আর ফিরল না। রইল শুধু ঘোড়াটা। সেই ঘোড়াটাও বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। কখনো মাঠে চরতে যায়, বেশিরভাগ সময়েই ঘরে বসে ঝিমায়। আমি ঘাস কেটে এনে খাওয়াই, জল দিই। যেমন বাপ বুড়ো হলে ছেলে তার কাজকর্ম করে। মাঝে মাঝে ওর প্রকাণ্ড বুড়ো মাথাটি আমার কাঁধে নামিয়ে রাখত। তখন ওর ঘন, গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। সে নিশ্বাসে ওর গায়ের চামড়া থরথর করে কাঁপত। ওর মুখে, চোয়ালে, ঘাড়ে শিরাগুলো থাকত ফুলে, ওর ভাঙাচোরা মুখটা ছিল গাছের কাণ্ডের মতো এবড়োখেবড়ো। ওর প্রকাণ্ড ঘাড়টা দু—হাতে জড়িয়ে থেকে আমার মনে হত যেন বহুদিনের পুরোনো একটা বটগাছ শাখাপ্রশাখা মেলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে।

একদিন ঘোড়াটিকে দেখে গাঁওবুড়ো বলল, 'ঘোড়াতে চেপে তোর বাপ বিয়ে করতে গিয়েছিল। ঘোড়াটি তোর বাপের মতন। ওকে যত্ন—আত্তি করিস!'

ঘোড়াটিকে নিয়ে ছিলাম মেতে। বাদবাকি সময়টা কাটত চুপচাপ দাওয়ায় বসে। সারাদিন বাতাস আমাদের ফাঁকা বাড়িটায় শিস দিয়ে খেলা করত। দেখতাম, গুড়মি শাকের জঙ্গলে চড়াই নেচে বেড়াচ্ছে, ধনে পাতার গন্ধে বাতাস ভারী, সরসর করে গাছের শুকনো পাতায় বাতাস বইছে। কুয়োর পারের ছোট্ট একটু গর্তে জমে থাকা জলে শালিক চান করছে জল ছিটিয়ে। ও চলে গেলে জলের কয়েকটা সরু রেখা থাকত মাটিতে, কয়েকটা পালক বাতাসে। আমার চকচকে দা—টাতে মরচে পড়ল। সারা বাড়িটায় অশ্বত্থ চারা উঠল গজিয়ে।

দিন কাটে। সন্ধে হলে পাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলে চুপ করে শুয়ে থাকি। আগুনটা মরে এলে তার নরম আঁচ অনেকটা মার শরীরের তাপের মতো মনে হয়। তাই কখনো ঘুম আসে শরীর অবশ করে দিয়ে।

যে দাই আমার নাড়ি কেটেছিল সে এসে একদিন বলল 'এমনি করে কি না খেয়ে মরবি? তার চেয়ে আমার কাছে চল। আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। দু—জনে বেশ থাকবি।'

'উহু। আমি রাতে স্বপ্ন দেখি বাবা ফিরে আসছে।'

'হ্যাঁ যেমন তোর মা মুখপুড়ী ফিরল। তা খাস কী?'

'শাকপাতা যখন যা হয়।'

বুড়ি গজগজ করে আমাকে বকতে বকতে চলে গেল।

তারপর থেকে দাইমার মেয়ে চন্দ্রা আমার জন্য ভাত আনত রোজ। ভাতের থালাটা মাটিতে রেখে বেড়ালের মতো খাপ পেতে আমার দিকে চেয়ে থাকত চন্দ্রা, যেন শহরের মানুষ দেখছে।

একদিন আমি বললাম, 'কী দেখছিস? কী দেখিস রোজ?'

ও বলল, তোকে। তুই একটা বুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে থাকিস কেন?'

'ওকে আমি আমার বাপের মতো ভালোবাসি।'

ও খিলখিল করে হাসল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে থামল। বলল, 'ভালোবাসার আর লোক পেলি না। ওটা চড়ে তুই কোন দেশ জয় করতে যাবি?'

আমি ভাবলাম, যা, একদিন যাব। পুবদিকে যাব— যে দিকে সূর্য ওঠে। একদিন আমি রাজা হয়ে ফিরব, দেখিস। আমি বললাম, 'জানি না রে।'

ও হাত তুলে আমাকে আমার ঘর দেখাল। বলল, 'ওই দেখ গাছের শেকড়গুলো সাপের মতো দেওয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তোর চারপাশের দেওয়াল আর বেশিদিন থাকবে না; ধসে পড়বে! সময় থাকতে শত্তুরগুলোকে মুড়িয়ে কাট!'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'ওরা আমার মায়ের মতো। কেটে ফেললে বাইরে থেকে ডালপালা দেখা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে ওদের শেকড় থাকে।'

শুনে ও রাগ করে চলে গেল। বলে গেল, 'তোর মরণ এসেছে ঘনিয়ে। একদিন তুই দেওয়ালচাপা হয়ে মরবি।'

আমি ভাবলাম, শেকড়গুলো গর্ত খুঁড়বে, আরও গভীর হবে। মনের দেওয়ালে চিড় ধরবে, ফাটল হবে। তারপর একদিন চৌচির হয়ে ভাঙবে। সেদিন আমি আমার বুড়ো ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে রওনা দেব। গাঁয়ের লোকেরা দেখবে আমার লাঠির আগায় বাঁধা পুঁটলিটা আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরে পাকা ধানের খেতের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওরা জানবে, আমি ফিরে আসব একদিন। রাজা হয়ে।

একদিন চন্দ্রা আমার ভাত নিয়ে এল না। ফাগনলালের ঘরের পাশ দিয়ে মৌরিখেতের কিনারায় কিনারায় যে পথটা ধরে চন্দ্রা আসে, সেদিকে চেয়ে সারা দুপুর কাটল। চন্দ্রা এল না। তারপর দিনও না। চন্দ্রা এল না দেখে আমি উঠে খুঁজে—পেতে আমার পুরোনো মরচে ধরা দা—টা বের করে পাথরে শান দিতে বসলাম।

সারাটা দুপুর পাথরে মুখ ঘষে দা—টা ঝকঝক করে হেসে উঠল, ওর গায়ে আগুন ছুটল। দা—য়ে শান দিয়ে দিয়ে আমার হাতপায়ের মাংসগুলো ফুলে উঠল, শিরায়—শিরায় গরম রক্ত ছুটল টগবগিয়ে। কেমন যেন খুশি লাগল। নেশা পেল।

ভেবেছিলাম সূর্য ডোবার আগেই অশ্বত্থের চারাগুলো কেটে ফেলবে। এমন সময় চন্দ্রা এল হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রোজ যেমন আসত।

আমি বললাম, 'এতদিন আসিসনি কেন?'

ও গম্ভীর হয়ে বলে, 'একটা বাঘ রোজ আমার পথ আগলে থাকে। বলে, কোথায় যাচ্ছিস? থালা নামিয়ে রাখ সামনে আর বসে বসে আমার লেজে হাত বুলিয়ে দে। নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাব। রোজ এমনি করে বাঘটা তোর ভাত খেয়ে ফেলে।'

আমি বললাম, জানি। এ গল্প আমি মার কাছে শুনেছি। এক বুড়ি রোজ তার ছেলের কাছে খাবার নিয়ে যেত, আর পথ আগলে থাকত বাঘ।'

'হ্যাঁ, শুনেছিস। তাতে কী? এমন বুঝি হয় না?'

আমি ভেবেছিলাম, বড়ো হয়ে আমি বাঘটাকে মেরে ফেলব, খিদেকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই, তেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। পথ আগলে যেই থাকবে তাকে সাফ করে দাও।

চন্দ্রা খিলখিল করে হাসল মুখে আঁচল দিয়ে। বলল, 'তুই বাঘটাকে মারবি, না ওর লেজে হাত বুলিয়ে দিবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

ও বলল, 'মা দেখছিল, তুই খিদের জ্বালায় আমাদের বাড়ি যাস কি না। মা তোকে যাচাই করছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মা বলেছে তুই মানুষ নয়। তোর বাপটা ছিল একটি গোঁয়ার, তাই একমুখো চলে গেছে। ঘরের পথ ফিরে চিনল না। তুইও যাবি, যাবি। কাঁদতে কাঁদতে মা ভাত বেড়ে দিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে চন্দ্রা বলল, 'কিন্তু আমি জানি তুই যাবি না।'

এই বলে ও চলে গেল। আমি আমার দা—টা হাতে নিলাম। এক—এক কোপে অশ্বত্থের মোটা মোটা ডালগুলো খসে পড়তে লাগল। আমার শরীর গরম হল, ছলাৎ—ছল করে রক্ত বইল শিরায় শিরায়। আমি আপন মনে হাসতে লাগলাম। শীতকালে আমাদের বুড়ো ঘোড়াটার গা থেকে ধোঁয়ার মতো একটা ভাপ বেরোত। সেই ভাপে ওর রক্তমাংস আর ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। নিজের শরীর থেকে আমি তেমনি এক গন্ধ পেলাম। মদের যেমন স্বাদ নেই, এ—গন্ধেরও তেমন ভালোমন্দ নেই। এ শুধু আমাকে মাতাল করে। আমি আপন মনে হাসলাম। যেন আমার নেশা হল। আমার ইচ্ছে নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করি। মাটির দাওয়ায় আমি শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম। আমার শরীরের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশল। শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে আমার কাছে এক বাঁশিওয়ালা এল। তখন বাতাসে টান লেগেছে। শুকনো পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে ঝরে শেষ হয়েছে। খেতে মটর শাকে পাক ধরল। যারা শুকনো কাঠ—পাতা কুড়োতে যেত তাদের দিন গেল।

এমনি একদিন শেষ দুপুরে অনেক দূর থকে বাঁশিওয়ালা এসে আমার দাওয়ায় বসল। তার গায়ে একশো রঙের একশো তালি দেওয়া একটা জোব্বা, মাথায় একটা মস্ত পাগড়ি। সেই পাগড়িটা তার কপালটিকে ঢেকে ফেলেছে। রোগা দুটো পা রাঙা ধুলোয় মাখা। আমি কখনো এই বাঁশিওয়ালাকে দেখিনি।

সে বলল, 'আমি বাঁশি বিক্রি করিনি। বাঁশির সুর বিক্রি করি।' এই বলে সে তার বাঁশিতে একটা অদ্ভুত সুর বাজাল।

আমি বললাম, বাঁশিতে তুমি কী সুর বাজালে? আমি তার কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।'

বাঁশিওয়ালা তার ঘন ভ্রূর নীচে গভীর গর্তের মতো চোখ দুটো দিয়ে আমায় দেখল। বলল 'এ সুর আমি কোথাও শিখিনি বাবা, কেউ আমাকে শেখায়নি। আমার কোনো গুরু নেই। আমি হাটে মাঠে ঘাটে যা শুনি তাই বাজিয়ে বেড়াই। কখনো নোঙর করা নৌকোয় জলের ঢেউ লাগবার সুর, কখনো শীতের শুকনো পাতায় বাতাস লাগবার সুর।'

সে আবার তার বাঁশিতে ফুঁ দিল। শেষে শীতের শুকনো বাতাসে বাঁশির টান লাগল। কয়েকটা সুর তীরের মতো আকাশে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে দুপুরটা মাতালের মতো টলতে লাগল। যেন অনেক দূর পথ! আমাদের এই মৌরি খেত ডিঙিয়ে ধানের আবাদের পাশ দিয়ে পাহাড় পেরিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কত গঞ্জ, কত ব্যাপারীর আস্তানা, কত বন্দর, ঘাট মাঠ পেরিয়ে যাওয়া দেশ। বাঁশির সুর সেই দূর—দূরান্তের আভাস মাত্র নিয়ে কোকিলের অস্পষ্ট ডাকের মতো নরম, বিষণ্ণ হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। সেই পথ ধরে, অনেক আলো, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে—আসছে—আসছে।

বড়ো ক্লান্ত পথ! বড়ো দীর্ঘ পথ! আমি চোখ বুজে ভাবলাম, সে আমার বাবা। কত দিন গেল, কত রাত গেল। ঘোড়াটি বুড়ো হল। বাবা আর ফিরল না।

বঁশিওয়ালা সুর পালটে নতুন সুর ধরল। কখন আমার চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে। এ কেমন সুর যা দিনের আলোকে অন্ধকার করে দেয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, এর মানে কী? আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

বাঁশিওয়ালা থামল না।

যেন এতদিন মাঠটা ছিল রোদে পোড়া, ফাটা ফাটা। একদিন পাহাড়ে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল। অঝোর ধারে বৃষ্টি। মাটির কোষে কোষে জল ঢুকল। বীজধান ফুলে উঠল। বুক ফাটিয়ে শিষ বার করল আকাশে।

বাঁশিওয়ালা থামল। বলল, 'এর অর্থ যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয় আস্তে আস্তে, তোমার চোখের আড়ালে অন্ধকারে যেমন করে আস্তে আস্তে পাপড়িগুলো মেলে দেয়, যেমন করে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে আবার নতুন পাতায় ছেয়ে যায় গাছ— তেমনি করে তোমার দেহেও একটা ঋতু আসে আর—একটা যায়।'

এই বলে বাঁশিওয়ালা আবার তার বাঁশিতে সুর দিল। যেন বলল, বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। এক—একটি ঋতু যায়, আর একটি আসে। দুঃখকে সহ্য করো। খেতে আগুন লাগলে ফসল ভালো হয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'এ সুর তুমি কোথায় পেলে?'

সে দাঁড়িয়ে উঠে হাসল।

আমি বললাম, 'আমাকে এ সুর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার মতো জোব্বা পরে বাঁশি বাজিয়ে বেড়াব।'

বাঁশিওয়ালা ফিরে বলল, 'তুমি আমাকে অবাক করলে বাবা, এ জোব্বা কি তোমাকে মানায়! আমি যেখানে যেমন পেয়েছি তেমন কুড়িয়ে ঘুরিয়ে এই কাপড়ের টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করে জোব্বা বানিয়েছি। যারা সুখে আছে এ জোব্বা তারা সাধ করে পরে না। আমার মনে রং নেই, তাই বাইরে এত রঙের বাহার।'

বাঁশিওয়ালা চলতে লাগল, আমি দেখলাম শীতের ঘন রোদে রোগা দুটো পায়ে রাঙা ধুলো মেখে সে আস্তে আস্তে আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকছে না। শেষ শীতের গরম দুপুরে সেই অদ্ভুত বাঁশিওয়ালা আর তার সুর দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবলাম, এ সুর তুমি কোথা পেলে বাঁশিওয়ালা। আমার সারাটা দিন যেন টালমাটাল —টালমাটাল। যেন আমি বিনি মদের বোতল। যেন আমি এক পাগল বাঁশিওয়ালা। শিরা ছিঁড়ে সুর তৈরি করে— সে সুরে আমি সারাদিন গাই। কাঁদি। কেন বাঁশিওয়ালা আমাকে দিল সারাদিন বাজাবার এই বাঁশি? আমি যে একে তাড়াতে পারি না। এ যে আগুনে দিলে পোড়ে না, ঝরে ওড়ে না। পোষা কবুতরের মতো নড়ে—চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উড়ে যায় না।

উঁচু—নীচু পথ। পাথর ছড়ানো। চড়াই—উতরাই ভেঙে বাঁশিওয়ালা চলেছে। শুকনো হাওয়ায় তার চামড়া ফেটেছে, পাথরে তার পা ফেটেছে। তবু তার চলবার শেষ নেই। সে পুব থেকে পশ্চিমে গেল। যেদিকে সূর্য ওঠে সেদিক থেকে যেদিকে সূর্য ডোবে সেদিকে গেল, যে পথে আমার বাবা গেছে তার বুড়ো ঘোড়া রেখে, যেদিকে মা গেছে আগুনের পাশে তার ছেলেকে বসিয়ে রেখে।

বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। খেতে আগুন দিলে ফসল ভালো হয়। মাটির কোষে কোষে বৃষ্টির জল ঢুকবে, বীজধান কেঁচোর মতো ফুলবে, বুক ফাটিয়ে শিষ বের করবে আকাশে। আমি জানি বাঁশিওয়ালা আর ফিরবে না। কোনোদিন না। দাওয়ায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন আমার দিন গেল।

একদিন সকালে ঘোড়াটাকে দেখে মনে হল আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার সামনেই বুড়ো ঘোড়াটা কখন যেন আরও একটু বুড়ো হয়ে গেছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে আমি আমার মাকে ভাবলাম। কিন্তু মার মুখ আমার মনে এল না। রোদ লেগে ঘাসের বুক থেকে শিশির যেমন ভাপ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মার মুখটা হারিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচল, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা শান্ত ছায়ায় ডাকা দিঘির মতো সেই চোখ আমি আগের জন্মে দেখেছিলাম।

গাঁওবুড়ো আমায় দেখে চোখ কুঁচকে বলল, 'তুই যে রীতিমতো পুরুষমানুষ হয়ে উঠলি! কখন এত ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি, বেড়ে উঠলি আমাদের চোখের সামনে, টেরও পেলাম না।'

আমি লজ্জা পেলাম।

গাঁওবুড়ো বলল, 'তোর গড়নপেটন হয়েছে তোর বাবার মতন, চোখ দুটো পেয়েছিস মার। তা এবার তো জোয়ান হলি, কাজকর্মে লেগে যা। বসে থাকিস না। দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস, ঘর সামলে রাখিস।'

আমি ভাবলাম গাঁওবুড়োকে বাঁশিওয়ালার কথা বলব।

আমার চোখের দিকে চেয়ে গাঁওবুড়ো হাসল, 'জানি রে, জানি, তোর কাছে এক বাঁশিওয়ালা এসেছিল। সে মাত্র একবারই আসে। মাত্র একবার।' গাঁওবুড়ো তার নড়বড়ে মাথাটা দোলাল, 'তাই তো বলছি দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বসে থাকিস না। ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। ঘরদোর সামলে রাখিস।'

চন্দ্রা এসে বলল, 'তুই নাকি পয়সা দিয়ে বাঁশির সুর কিনেছিস?'

আমি বলি, হুঁ।'

চন্দ্রা আমার কাছে এসে বসল, 'পাখি কিনেছিস, আর খাঁচা কিনিসনি? সুর কিনেছিস আর বাঁশি কিনিসনি? তবে তোর ঘরে রইল কী, তোর নিজের বলতে থাকল কী? কিনতে হয় এমন জিনিস কিনবি যা হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যায়, চোখ দিয়ে দেখা যায়, যাকে ধরে ছুঁয়ে দেখে মনের সুখ, ভালো না লাগলে যাকে বেচে দিয়ে আবার পয়সা পাওয়া যায়।'

এই বলে ও হাসল। বলল, 'আমি আর কতকাল তোর জন্য ভাত বয়ে আনব? তোরই তো ভাত দেওয়ার বয়স হল। তুই কাজকর্ম করবি, না সারাদিন দাওয়ায় বসে হাঁ করে আকাশ গিলবি?'

আমি বললাম,'জানি না।'

'গাঁওবুড়ো বলছিল ঘরে মেয়ে না দিলে জোয়ানগুলো কাজকর্মে মন দেয় না।'

এই বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ওর বাসন্তী রঙের ডুরে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে উড়তে ফাগনলালের দাওয়া পেরিয়ে মৌরিখেতের পাশ দিয়ে ওর শরীরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। খুব পাতলা বুটিদার একটা মেঘ রোদের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। সেই ছায়াটা একটু সময়ের জন্য ওর মুখের ওপর থাকল। বাতাস ওর চারদিকে একটু খেলা করল। ওর চারপাশে উড়ে বেড়াতে লাগল কয়েকটা মৌমাছি।

আমি বাঁশির সুর কিনেছি বলে গাঁয়ের বুড়োরা আমার নিন্দে করল। দুঃখ করে বলল, আমার ঘরে কিছু থাকবে না। যেমন করে আমার বাবা থাকল না, মা থাকল না। গাঁয়ের জোয়ান মরদরা পিঠে চাপড়ে গেল! এই তো চাই। বাঁশির সুর কিনবি, পাখির ডিম কিনবি। যেমন করে পারিস উড়িয়ে দিবি রোজগারের টাকা। আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের রোজগারের ভাবনা কী? দেখছিস না বুড়োগুলোর দশা, দু—আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরো আয়ুটা খরচ হয়ে গেল। ওরা আমাদের বেহিসেবি বলে। কিন্তু সামনের শীতে ওরা যখন মরবে তখন তো আমরাই থাকব। এই শুনে বুড়ো ঘোড়াটার কাছে গেলাম। ও আমার কাঁধে ওর প্রকাণ্ড মাথাটা রাখল।

কখন আমার শরীর দীঘল হয়েছে, হাত—পা কোমর হয়েছে সরু, আমার চামড়ায় টান লেগেছে, রুক্ষ হয়েছে মুখ তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ও যেন টের পেল। আমার কাঁধে মুখ ঘষে শরীর কাঁপিয়ে ওর খুশি জানাল। ওর গাছের কাণ্ডের মতো এবড়োখেবড়ো মুখে আমার গাল রাখলাম। রেশমের মতো কেশর আমার হাতে খেলা করল। আমি বললাম, 'বুড়ো, তুই আমার বাপ। কোনো ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।'

এই শুনে পাঁজর কাঁপিয়ে ও নিশ্বাস ছাড়ল। ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে বলে দুঃখ কোরো না। ও বুড়ো হচ্ছে তার মানে তুমি বড়ো হয়েছ। কবে শীত আসবে তার জন্য দুঃখ করে দিনগুলোকে চলে যেতে দিয়ো না। মনে রেখো, দু—আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্রোতের জল বয়ে যায়। আটকানো যায় না। সামনের শীতে ঘোড়াটা যদি মরে, তুমি থাকবে।

'বুড়ো, তুই আমার বাপ।' আমি বললাম, 'কোনো ভাবনা করিস না বুড়ো, আমি তোকে দেখব।'

ঘোড়াটা পুরোনো ঠান্ডা শরীর দিয়ে আমার শরীর থেকে তাপ নিল। আমি দু—হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে রইলাম। যেন আমি পুরোনো প্রকাণ্ড একটা বটগাছের আশ্রয়ে আছি।

চন্দ্রা এসে বলল, 'সারাদিন ঘরে বসে কী বকিস একা একা?'

আমি শান্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। ওর শরীর ঘামে ভিজে তেল তেল করছে। দু—চোখে মিটিমিটি আলো। এ কেমন আলো? আমি কোনোদিন এমন আলো দেখিনি। ওর শরীর থেকে কেমন একটা মাতাল মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম বোধহয় কোনো ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। এ কেমন ফুল? জানি না। কেমন তার রং? জানি না।

ও আমার হাত টেনে বলল, 'চল, তোকে আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব।'

'কী জিনিস?'

ও ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'সে একটা রাজার বাড়ি। খুব অদ্ভুত।'

'কোথায় সেটা?'

ও হাসল, 'আছে আছে। তোর খুব কাছেই আছে। অথচ তুই দেখিসনি।'

চন্দ্রা ওর বুকের কাপড় সরিয়ে নিল। তারপর কাপড়টা ওকে একা রেখে মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখে হাত চেপে ও বলল, 'এ এমন রাজা যে দখল নেয় না, দখল ছাড়েও না। আমি সারাদিন সব কাজ ফেলে তার বাড়ি পাহারা দেব কেন?'

ওর বেলেমাটির মতো শরীরের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেলাম।

চোখে হাত চেপে ও কাঁদছিল, 'আমার সারা দিনের কাজ পড়ে থাকে। আনমনে আমার বেলা বয়ে যায়। তোর বাঁশিওয়ালা কি তোকে একথা বলেনি?'

সেই অচেনা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এ কেমন ফুল জানি না। কেমন তার গন্ধ জানি না। আমার বুক ফেটে কান্না এল। আমি ভেবেছিলাম, যে বাঘটি রোজ পথ আগলে থাকে, বড়ো হয়ে তাকে মেরে ফেলব। কিন্তু ক—টা বাঘকে মারব আমি? গাঁওবুড়ো বলেছিল, ঘরদোর সামলে রাখিস। গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল বাঁশির সুর কিনিস না।

চন্দ্রা দু—হাতে আমার মাথাটা টেনে নিল। বলল, 'আমি তোকে কতক বুঝি কতক বুঝি না!'

ওর বুক, ছিঁড়ে—নেওয়া ফুলের বোঁটার মতো আমার কপালে, চোখের পাতায় নরম হয়ে লেগে লেগে মুছে গেল।

ও বলল, 'একদিন তুই পাহাড়ে যাবি কাঠ কুড়োতে। সেদিন আমি তোর ঘর পাহারা দেব। পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালব বাইরে, যেন তুই পাহাড় থেকে দেখতে পাস।'

বাঁশিওয়ালা তার প্রথম সুরে বলেছিল, ঘর বলতে তোর কোনো কিছুই নেই। কোনোদিন ছিল না। বৃথাই তুই সারা বিকেল আগুন জ্বেলে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলি। যারা পাহাড়ের ওপারে গেছে তারা আর ফিরবে না। আমি কাঁদতে লাগলাম।

চন্দ্রা কেঁদে কেঁদে বলল, 'তুই যদি আমাকে ছেড়ে না যাস, আমিও যাব না। আমরা ঘর বাঁধব।'

ওর চোখের জলে আমার মাথা ভিজল। আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। চুমু খেল আমার ঠোঁটে। জন্মের পর আমরা যেমন ছিলাম তেমনি হয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার বুড়ো ঘোড়াটা আরও বুড়ো হয়েছে। কুটকুট করে সারাদিন ঘাস খায়, কখনো ঝিমোয়।

বাতাসে গরম হলকা ছুটল। বুড়োরা বলল, 'এইবার আকাল এল। ঘাট শুকোবে, মাঠ ফাটবে। সেই বর্ষা যতদিন না আসছে।'

কাছাকাছি মাঠের ঘাসগুলো হলদে হয়ে এল। তাই আমি একদিন বুড়ো ঘোড়াটাকে দূরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। সন্ধেবেলা ও নিজেই খুটখুট করে ঘরে ফিরতে লাগল। কিন্তু একদিন ও ফিরল না। সারা সন্ধে আমি দাওয়ায় বসে রইলাম পথের দিকে চেয়ে। দূরের পাহাড় ঝাপসা হয়ে এল। ও এল না। আকাশে মস্ত বড়ো চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় বান ডাকল দিগন্ত জুড়ে। কিন্তু পেটের নীচে নিজের বাঁকাচোরা বুড়ো ছায়াটা নিয়ে টুকটুক করে ও ফিরল না। অনেক ভেবে আমি হাতে দড়ির ফাঁস নিলাম। তারপর পথে নামলাম। মনে মনে বললাম : যখন আমি ছোটো ছিলাম তখন কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বুড়ো, তোকে আমি চলে যেতে দেব না। আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। চলতে চলতে আমি ধানখেত ছাড়িয়ে, মরা মটর শাকের পাশ দিয়ে, বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান পেরিয়ে গেলাম। তারপর দিগন্ত জোড়া মাঠ। মাঠে বান ডাকা সমুদ্রের মতো টলমল করছে জ্যোৎস্না। কিন্তু তার কোথাও আমার বুড়োর ছায়া নেই।

আমি পাগলের মতো সারা মাঠ বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম। আমার ভাঙা গলার ডাক আমাকে ঘিরেই ঘুরতে লাগল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'বুড়ো, আমি তোকে শেষপর্যন্ত খুঁজে দেখব।'

আমি মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আমার চারধারে ঘন গাছ। আলো আর ছায়ার মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম। তারপর আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হল কেউ যেন আছে। কাছেই— পাশেই। মৃত শুকনো পাতাগুলোতে শব্দ হল। মনে হল, যেন কোনো আত্মা আমার পিছু নিয়েছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। যেন সেই আত্মা আমার হাত ধরল, তারপর আমাকে চেনা পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলল কোথাও। আমি ভাঙা গলায় বুড়োকে ডাকতে লাগলাম। বন পার হয়ে আমি একটা জলার ধারে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম, আমি এর আগে কখনো এখানে আসিনি। এত জ্যোৎস্না আমি কোনোদিন দেখিনি। জলাটা মস্ত বড়ো। তার ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও যেন কিছু দেখছে। আমি ডাকলাম, 'বুড়ো, বুড়ো!'

ও শুনল না। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, 'বুড়ো, তোকে আমি পেয়েছি।'

ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখাল। তারপর ভয় পেয়ে ও সরে গেল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ও চিৎকার করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। ওর ছায়াটা এবড়ো খেবড়ো মাঠের ওপর টাল খেতে লাগল। আমি ওর পিছনে ছুটলাম। প্রাণপণে ওকে ডাকলাম। সেই ভীষণ ভয়ংকর জ্যোৎস্নার মধ্যেও বুড়ো আমাকে চিনতে পারল না। আমি দড়ির ফাঁসটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর শেষবারের মতো ওকে ডাকলাম। ও শুনল না। কাকে যেন ও দেখতে পেয়েছে। কে যেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফাঁসটা ছুড়ে দিলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাতধরা দড়িটা থরথর করে কাঁপল। আমি বুঝলাম ফাঁসটা ওর গলায় পড়েছে।

আমি বললাম, 'বুড়ো আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।'

আমি কাছে এগোতেই বুড়ো চিৎকার করে ছুটতে চাইল। ফাঁসের দড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বুড়ো দড়িটা ছিঁড়ে চলে যেতে চাইল। আমি দড়িটা ছাড়লাম না। বললাম, 'বুড়ো, আমি শেষপর্যন্ত লড়াই দেব।'

বুড়ো শুনল না। ছেড়ে যেতে চাইল। আমি ধরে রইলাম।

কিন্তু বুড়োকে একসময়ে থামতে হল। চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ফাঁসটা ওর গলায় আটকে গেছে। ও দম নিতে পারছে না। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, 'বুড়ো তোকে আমি যেতে দেব না। আমি শেষপর্যন্ত লড়াই দিয়েছি।

এই বলে আমি ওর গলার ফাঁসটা খুলতে চাইলাম। কিন্তু ফাঁসটা খুলল না। নীচু হয়ে দেখলাম দড়ির গায়ে ছোট্ট একটা গিঁটে ফাঁসটা আটকে গেছে, গভীর হয়ে বসেছে বুড়োর গলায়।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কপালে বিনবিনে ঘাম ফুটল। কিন্তু ফাঁসটা নড়ল না। বুড়ো ছটফট করতে লাগল। আমি দড়িতে দাঁত দিলাম। দড়িটা লোহার মতো বসেছে। আমার গলার রগ ফুলল, রক্তে ভরে গেল, সারাটা মুখ। বুড়ো আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ চিৎকার করে বললাম, 'বুড়ো, আমি ফাঁসটা খুলব, খুলব।'

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। আমার গা থেকে পিতৃহত্যার সমস্ত পাপ মুছে নিতে চাইল। তারপর সেই ভয়ংকর জ্যোৎস্নার ভেতর ওর দুটো চোখে ঘোলা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'বুড়ো, এই ফাঁসটা দিয়ে আমি তোকে ধরতে চেয়েছিলাম।'

আমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। ভাবলাম— আমার হাত দিয়ে কে তোকে মেরেছে আমি আমি তা জানি না। জানি না।

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে রোজগার করতে। আমার মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে। আমাদের ঘোড়াটা গিয়েছিল জলার ধারে, ঘাস খেতে। কেউই আর ফিরল না।

গাঁওবুড়ো একদিন সবাইকে ডেকে বলল, 'শোনো তোমাদের এক গল্প বলি। গাছের তলায় ধুনি জ্বেলে একটা সাধু বসে থাকত। তাকে মস্ত বড়ো সাধু ভেবে গৃহস্থরা তার চারধারে হাতজোড় করে থাকত। একদিন একটা লোক এসে বলল, সাধুবাবা, আমার ইচ্ছে তোমাকে কিছু খাওয়াই। সাধু রাজি হল। লোকটি কিছু রুটি কিনে আনাল। তারপর আবার বলল, সাধুবাবা, তুমি এই শুকনো রুটি কী করে খাবে? তোমা লোটাটা দাও, দুধ নিয়ে আসি। সাধু খুশি হয়ে লোটা দিল। লোটা নিয়ে লোকটা সেই যে চলে গেল আর ফিরল না।'

সবাই বলল, 'তারপর?'

গাঁওবুড়ো বলল, তারপর লোটার শোকে সাধুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কী কান্না! সবাইকে ডেকে ডেকে বলল, 'দেখ দেখ, চোট্টার কাণ্ড দেখ, আমাকে এক জোড়া রুটি খাইয়ে আমার রুপোর লোটাটা নিয়ে ভেগেছে।'

সবাই বলল, 'তারপর?'

গাঁওবুড়ো হাসল, 'যার লোটা চুরি যায় সে বোকা। কিন্তু সেই লোটার শোকে যে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে সে আরও বোকা।'

এই বলে শীত আসবার আগেই গাঁওবুড়ো মরে গেল। গাঁয়ের বুড়োরা জমায়েত হয়ে বলল, 'জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ। চলতে চলতে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খেলছে। এ খেলার শেষ নেই।'

শীত আছে শুনে বুড়োটা ভয় পেল। বলল, 'এবার ঘর ছাড়তে হবে।'

কেউ বলল, 'ঘর আর কোথায়! ওই তো নড়বড়ে পাতার ছাউনি, রোদ মানে না, জল মানে না!'

বুড়ো ঘোড়ার মতো খুটখুট করে শীত এল। তারপর বুড়োদের কাঁধে মাথা রেখে তাদের দেহ থেকে তাপ শুষে নিতে লাগল। বুড়োরা পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালল। গোল হয়ে ঘিরে বসল। তারপর প্রাণপণে বলতে লাগল, 'কে যেন জন্মের পর স্রোতে ভাসিয়েছিল। তাই চেয়ে দেখলাম মাথার ওপর ছাদ নেই, চারিদিকের দেওয়াল নেই।'

কেউ বলল, 'অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলছিলাম কোনো ভিন—গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে। তারপর অন্ধকার হল যারা ছিল সাথের সাথী তাদের মুখ দেখা যায় না, পাশে কে চলছে জানা যায় না। অন্ধকারকে গাল পাড়ি, কিন্তু ঠাহর করে দেখলে এ অন্ধকারও সুন্দর।'

কেউ বলল, 'যাব আর কোথায়, সেই ফিরে আসতেই হয়। অণু অণু হয়ে আমি বাতাসে মাটিতে মিশব। কিন্তু দ্যাখো, তারপর একদিন পাহাড়ে মেঘ জমবে, বৃষ্টি আসবে, বাতাস ভিজবে, মাটির কোষে কোষে ঢুকবে জল। তখন আমি ফুল হয়ে ফুটব, নদীর জল হয়ে বয়ে যাব, বাতাস হয়ে খেলব, মেঘ হয়ে ভাসব।' এইসব শুনে গাঁয়ের জোয়ানগুলো হাসল।

তাই আমি চন্দ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম।

আমার মা বলেছিল, 'বাইরে একটি আগুন জ্বেলে রেখো। পাহাড় থেকে আমি যেন দেখতে পাই তুমি ঘরে আছ, তুমি ভালো আছ। ঘর সামলে রেখো, কোথাও যেয়ো না।'

দাইমা বলেছিল : আমার কাছে চল। আমার ছেলে নেই, তোকে ছেলের মতো পালব।

বাঁশিওয়ালা বলেছিল : বৃষ্টির জল লেগে বীজধান ফলবে। বুক ফাটিয়ে শিষ বের করবে আকশে। বড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।

গাঁওবুড়ো বলেছিল : ঘরদোর সামলে রাখিস। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। মনে রাখিস বাঁশওয়ালা মাত্র একবার আসে।

আমি বলেছিলাম : বুড়ো, তুই আমার বাপ। ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।

আমি আগুন জ্বেলেছিলাম। ঘর আগলে ছিলাম। তবু কেন যে আমার বাবা গেল বিদেশে, রোজগার করতে। আমার মা গেল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে। আমার ঘোড়াটা গেল জলার ধারে, ঘাস খেতে।

কীট

একদিন নীলা চলে গেল।

একদিন—না—একদিন চলে যাওয়ার কথাই ছিল নীলার। তাই না যাওয়া এবং যাওয়ার মধ্যে খুব একটা তফাত হল না। সুবোধ নিজেই গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে নীলাকে গাড়িতে তুলে দিতে। বিদায় মুহূর্তে স্বামী—স্ত্রীর যেমন কথা হয় তেমন কিছুই হল না। রুমাল উড়ল না, চোখের জল পড়ল না, এমনকী গাড়ি যখন ছেড়ে যাচ্ছে তখন জানালায় নীলার উৎসুক মুখও দেখা গেল না।

নীলা গেল তার বাপের বাড়ি মধুপুরে। সেখানেই থাকবে, না আর কোথাও যাবে তার কিছুই জানল না সুবোধ। শুধু জানল নীলার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই ; অনেকদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এরকমটাই হবে। খুব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল ব্যাপারটা।

খুব যে খারাপ লাগল সুবোধের— তা নয়—। ভালোও লাগল না অবশ্য। তার সম্মানের পক্ষে, পৌরুষের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই ভালো নয়। কত লোকের কত জিজ্ঞাসাই যে এখন তার ঘরে উঁকি মারবে তা ভাবতেও ভয় লাগা উচিত। তবু সব ভেবেও সুবোধের মন শান্তই রইল। খুবই শান্ত। বাসে জানালার ধারে বসবার জায়গায় গঙ্গার সুন্দর হাওয়া এসে লাগছিল। এখন বসন্তকাল। কলকাতায় চোরা গরম শুরু হয়ে গেছে। বাতাসটুকু বড়ো ভালো লাগল সুবোধের। লোহার প্রকাণ্ড জালের মধ্যে দিয়ে সে উৎসুক চোখে গঙ্গার ঘোলা রূপ, নৌকো, জাহাজের মাস্তুল আর কলকাতায় প্রকৃতিশূন্য আকাশরেখায় প্রকাণ্ড বাড়িগুলোর জ্যামিতিক শীর্ষগুলি দেখল। মনোযোগ দিয়ে দেখল, দেখায় কোনো অন্যমনস্কতা এল না। ভালোই লাগল তার। এমন অলসভাবে আয়েসের সঙ্গে অনেককাল কিছু দেখেনি সে। বিয়ের পর থেকেই তার মন ব্যস্ত ছিল, গত দশ বছর ধরে সেই ব্যস্ততা, সেই উৎকণ্ঠা আর বিষণ্ণতা নিয়েই সে সবকিছু দেখেছে। আর দশ বছর পর সেই ব্যস্ততা হঠাৎ কেটে গেছে। বড়ো স্বাভাবিক লাগছে সবকিছু। বহুকালের চেনা পুরোনো কলকাতার হারানো চেহারাটি হঠাৎ তার চোখে আবার ফিরে এসেছে আজ।

অনেকক্ষণ ধরে চলল বাস। ট্রাফিকের লাল বাতি, মন্থরগতি ট্রাম, রাস্তা পেরোনো মানুষের বাধা। সময় লাগল, কিন্তু অস্থির হল না সুবোধ। কোনোখানে পৌঁছোনোর কোনো তাড়া নেই বলে জানালার বাইরে তাকিয়ে ঘিঞ্জি ফুটপাথ, দোকানের সাইনবোর্ড, দোতলা বাড়ির জানালায় কোনো দৃশ্য— কত কি দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে রইল।

সন্ধের মুখে ঘরে এসে তালা খুলল সে। বাতি জ্বালল, জামাকাপড় ছাড়ল, হাত—মুখ ধুল, চুল আঁচড়াল, তারপর একখানা চেয়ার টেনে জানালার পাশে বসে পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে দেখার কিছু নেই। ঢাকুরিয়া বড়ো ম্যাড়ম্যাড়ে জায়গা, প্রায় আট বছরের টানা বসবাসে এক জায়গার সব রহস্য নষ্ট হয়ে গেছে।

চেনাশুনোও বেড়েছে অনেক। এবার জায়গাটা ছাড়া দরকার। দু—এক মাসের মধ্যেই। যতদিন নীলার বাপের বাড়ি থাকাটা লোকের চোখে স্বাভাবিক দেখায় ততদিনই নিরুদবেগে থাকতে পারে সুবোধ।

তারপর অচেনা একটা পাড়ায় তাকে উঠে যেতে হবে।

ঘরের দিকে চেয়ে দেখল সুবোধ। জিনিসপত্র বেশি কিছু নিয়ে যায়নি নীলা, কেবল তার নিজস্ব জিনিসপত্র ছাড়া। তাই ঘরটা যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে। কেবল আলনায় নীলার শাড়িগুলোর রঙের বাহার দেখা যাচ্ছে না, আয়নার টেবিলে রূপটানের শিশিকৌটোগুলোও নেই। তাই তফাতটা খুব চোখে পড়ে না। যেমন নীলার থাকা এবং না থাকার মধ্যে নিজের মনের তফাতটাও সে ধরতে পারছে না।

না, ব্যাপারটা মোটেই ভালো হল না। গভীরভাবে ভাবলে এর মধ্যে লজ্জার—ঘেন্নার অনেক কিছু খুঁটিনাটি তার লক্ষে পড়বে। মন—খারাপ হওয়ার মতো অনেক স্মৃতি। তবু কী এক রহস্যময় কারণে মনটা হালকা লাগছিল সুবোধের। জানালার কাছে বসে রইল, সিগারেট খেল। নীলা থাকলে এখানে বসেই এক কাপ চা পাওয়া যেত। সেটাই কেবল হচ্ছে না। মাত্র এক কাপ চায়ের তফাত। তবে চা করার একটা লোক রাখলেই তো তফাতটুকু বুজে যায়। ভেবে একটু হাসল সুবোধ। হাতঘড়িতে প্রায় আটটা বাজল। তাদের রান্নার লোক নেই, নীলাই রাঁধত। সুবোধ ভেবেছিল হোটেলে খেয়ে আসবে। তারপর ভাবল হোটেলে খেতে গেলে তফাতটুকু আরও বেশি মনে পড়বে। তাই সে ঠিক করল রান্নার চেষ্টা করলেই হয়।

রান্নাঘরে একটা প্রেসার কুকার ছিল। কেরোসিনের স্টোভে সেইটেতে ভাতে ভাত রান্না করে খেল সুবোধ। দেখল এই সামান্য রান্নাটুকুতে সমস্ত রান্নাঘরটা সে ওলটপালট করে দিয়েছে। আবার সেই তফাত! সুবোধ আপনমনে হাসল। তারপর বিছানা ঝাড়ল, মশারি টাঙাল, বাতি নেভাল— এইসব কাজই ছিল নীলার। শুয়ে শুয়ে সে অনেকক্ষণ মশারির মধ্যে সিগারেট খেল সাবধানে। ঘুম এল না। নীলা মাঝরাতে পৌঁছোবে আসানসোলে। সেখানে ওর জামাইবাবুকে খবর দেওয়া আছে, ওকে নামিয়ে নেবে। কয়েকদিন পরে যাবে মধুপুরে। নীলার এখন বোধহয় সুখের সময়। ঘুরে ঘুরে বেড়াবে খুব। এখন এই রাত এগারোটায় নীলা কোথায়! কী করছে নীলা! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। কাল থেকে তার ঝরঝরে একার জীবন শুরু হবে। মাত্র ছত্রিশ বছর তার বয়স, এখন নতুন করে সবকিছুই শুরু করা যাক। সময় আছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে তার মনে পড়ল সারারাত সে অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন দেখেছে। অধিকাংশ স্বপ্নেই নীলা ছিল। একটা স্বপ্নে সে দেখল— সে অফিস থেকে ফিরে এসেছে। এসে দেখছে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে দরজার কড়া না নেড়ে দরজার গায়ে কান পাতল। ভিতরে নীলা আর একজন পুরুষ কথা বলছে। মৃদু স্বরে কথা, সে ভালো বুঝতে পারছে না, প্রাণপণে শোনার চেষ্টা করল সে। বুঝল কথাবার্তার ধরন খুবই অন্তরঙ্গ। ভয়ংকর রেগে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সুবোধ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার হাত এত দুর্বল লাগছিল যে মোটেই শব্দ হল না। ভিতরে কথাবার্তা তেমনিই চলতে লাগলে, সে চিৎকার করে নীলাকে ডাকল— দরজা খোলো, বলতে গিয়ে সে টের পেল, সে মোটেই চিৎকার করতে পারছে না। 'দরজা খোলো' বলতে গিয়ে সে ফিসফিস করে বলছে 'জোরে কথা বলো।' এরকম বারবার হতে লাগল। এত হতাশ লাগল তার যে ইচ্ছে করছিল দরজার সামনেই সে আত্মহত্যা করে। ভাবতে ভাবতে সে একই সঙ্গে চিৎকার করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। অবশেষে দরজায় মৃদু শব্দ হল, থেমে গেল ভিতরের অন্তরঙ্গ কথা, তারপর হঠাৎ দরজা খুলে গেল। বিশাল শরীরওলা একজন পুরুষ দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল। চমকে উঠল সুবোধ। চেনা লোক— মনোমোহন। তার অনেকদিন আগেকার বন্ধু। হায় ঈশ্বর! মনোমোহন কোথা থেকে কী করে যে এল। রাগে দুঃখে ঘেন্নায় লাফিয়ে উঠে মনোমোহনের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল সুবোধ। কিন্তু পারল না। পা আটকে যাচ্ছিল, যেন এক হাঁটু জল ভেঙে সে দৌড়োবার চেষ্টা করছে। মনোমোহন দু—তিন লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে পিছু ফিরে দেখল, নীলা অসংবৃত শাড়ি পরে দরজায় দাঁড়িয়ে নিস্পৃহ মুখে তার খোলা চুলের ভিতরে আঙুল দিয়ে জট ছাড়াচ্ছে। কাকে যে আক্রমণ করবে সুবোধ, তা সে নিজে বুঝতে পারছিল না। রাগ দুঃখ ঘেন্নার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র একটা আনন্দকেও সে টের পাচ্ছিল। পাওয়া গেছে, নীলাকে এতদিনে

সুবিধেমতো পাওয়া গেছে। এইরকম স্বপ্ন আরও দেখেছে সে রাতে। কখনো নীলাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখা গেল, কখনো বা দেখা গেল নীলা এরোপ্লেনে বা নৌকোয় দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে।

সকালের উজ্জ্বল আলোয় জেগে উঠে সুবোধ স্বপ্নগুলোর কথা ভেবে সামান্য জ্বালা অনুভব করল বুকে। বস্তুত নীলার সঙ্গে কারও প্রেম ছিল এটা এখনও পর্যন্ত প্রমাণসাপেক্ষ। মনোমোহনের স্বপ্নটা একেবারেই বাজে। কারণ নীলার সঙ্গে তার বিয়ের অনেক আগে থেকেই মনোমোহনের সঙ্গে পরিচয়। মনোমোহনের সঙ্গে আর দেখা হয় না সুবোধের। মনোমোহন বোধহয় এখন পুলিশে চাকরি করে— তার ঘর সংসার আছে, সে নিরীহ মানুষ। স্বপ্নে যে কত অঘটন ঘটে!

তবু বুকে মনে কোথাও একটু জ্বালার ভাব ছিলই সুবোধের। স্টোভ জ্বেলে সে চা করল। চা—টা তেমন জমল না, লিকার পাতলা হয়েছে, চিনি বেশি। সেই চা খেয়ে সকালবেলাটা কাটাল সে। ঝি এসে বাসন—কোসন মেজে দিয়ে গেছে, তবু নিজে আজ আর রান্না করবে না সুবোধ। আজ ছুটির দিন— রবিবার। দুপুরে গিয়ে কোনো হোটেলে খেয়ে আসবে। সকালবেলাটায় সে ঘরের কোথায় কী আছে তা ঘুরে ঘুরে দেখল। এখন সবকিছু তাকেই দেখতে হবে। নিজেকে নিজেই চালাতে হবে তার। ব্যাপারটা যে খুব সুবিধেজনক হবে না— তা বোঝা যাচ্ছিল। বিয়ের আগে সে ছিল মা বোন বউদিদের ওপর নির্ভরশীল। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই গড়পাড়ের সেই যৌথ সংসার ছেড়ে চলে এল ঢাকুরিয়ায় নীলাকে নিয়ে। কখনো সে একা থাকেনি বিশেষ। যে কয়েকবার নীলা একটু বেশি দিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছে সে কয়েকবারই মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে সুবোধ। কাজেই এখন একা একা সংসারের মতো কিছু চালানো তার পক্ষে মুশকিল। মাকেও আর আনা যায় না— বাতে অম্বলে এই বুড়ো বয়সে মা বড়ো জবুথুবু হয়ে গেছে। তা ছাড়া মাকে আনলেও স্থায়ীভাবে আনা যায় না, গড়পাড়ের সংসার ছেড়ে মা এখানে থাকতেও চাইবে না বেশিদিন। এর ওপর আছে মায়ের অনুসন্ধানী চোখ— এক লহমায় বুঝে নেবে যে নীলা আর আসবে না।

নীলা আর আসবে না ভাবতেই সকালবেলায় একটু কষ্ট হল সুবোধের। কষ্টটা নিতান্তই অভ্যাসজনিত। দশ বছর একসঙ্গে বসবাস করার অভ্যাসের ফল। নীলা না থাকলে হরেক রকমের অসুবিধা। সেই অসুবিধাটুকু বাদ দিলে মনটা বেশ তাজা লাগল তার। বেলা বাড়লে রাতের স্বপ্নগুলোর মধ্যে একমাত্র মনোমোহনের স্বপ্নটা ছাড়া আর কোনো স্বপ্নই তার মনে থাকল না। মনোমোহনের সঙ্গে নীলার কিছুই ছিল না— সুবোধ জানে। তবু স্বপ্নটার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু আছে বলেই তার মনে হচ্ছিল। হয়তো এই ঘরে,তার এই সংসারের মধ্যে থেকেও নীলা কখনো ঠিক পুরোপুরি সুবোধের ছিল না। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই সুবোধের এইরকম ধারণা শুরু হয়। গড়পাড়ের বাড়িতে বাচ্চচা ছেলে—মেয়ের অভাব ছিল না। দুই দাদার গোটা পাঁচেক ছেলে—মেয়ে। তাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি তেমন পাকেনি তাদের কাছে সে প্রায়ই গোপনে জিজ্ঞেস করত, সে অফিসে চলে গেলে নীলা কী কী করে, বিকেলে ছাদে যায় কিনা, নীলার নামে কোনো চিঠি এসেছিল কি না। বস্তুত কেন যে সেসব জিজ্ঞাসা করত সুবোধ তা স্পষ্টভাবে নিজে আজও জানে না। বাপের বাড়ির কোনো লোক এসে নীলার খোঁজ করলে সে বিরক্ত হত। কখনো কখনো ঠাট্টার ছলে সে নীলাকে জিজ্ঞেসও করেছে বিয়ের আগে নীলার জীবনে কে কে পুরুষ এসেছে। সুবোধের মনের গতি তখনও ধরতে পারেনি নীলা, তাই ঠাট্টা করেই উত্তর দিত— ছিল তো, সে তোমার চেয়ে অনেক ভালো। ঠাট্টা জেনেও মনে মনে ম্লান হয়ে যেত সুবোধ। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই বাড়িতে একটা গণ্ডগোল শুরু হল মেজদাকে নিয়ে। মেজদার কারখানায় গণ্ডগোল হয়ে লক—আউট হয়ে গেল। ছ'মাস পরে কারখানাটা হাতবদল হয়ে গেল। মেজদা পুরোপুরি বেকার তখন। লোকটা ছিল বরাবরই একটু বন্য ধরনের, হইচই করা মাথা—মোটা গোঁয়ার মানুষ। চাকরি গেলে এসব লোকের সচরাচর যা হয় তাই হল। বাংলা মদ খেয়ে রাত করে বাসায় ফিরত। গোলমাল বা চেঁচামেচি করত না, কিন্তু মাঝে মাঝেই কান্নাকাটি করত অনেক রাত পর্যন্ত। তিন ঘরের ছোট্ট বাসাটায় ঠাসাঠাসি লোকজনের মধ্যে ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল। মেজদার মদ খাওয়ার স্বভাব ছিলই, কিন্তু আগে মাত্রা রেখে খেত, পুজো পার্বণ বা অন্য উপলক্ষ্যে বেশি খাওয়া হয়ে

গেলে বাসায় ফিরত না। কিন্তু চাকরি যাওয়ার পর লোকটাকে রোজই মাত্রার বেশিই খেতে হত, আর বাসা ছাড়া অন্য জায়গাও ছিল না তার। প্রতি রাত্রেই মেজদাকে গালাগাল করত সবাই, মা বলত— ওকে রাতে ঘরে ঢুকতে দিস না। বউদি সামলাত বটে, কিন্তু কিছুদিন পর বউদিরও ধৈর্য থাকল না। কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে গেল বউদি। সে সময়ে সত্যিই মুশকিল হল মেজদাকে নিয়ে। তাকে সামলানোর লোক কেউ রইল না। মাঝে মাঝে সদরের বাইরেই সারারাত শুয়ে থাকত মেজদা। দরজা খুলত না কেউই। সে সময়ে এক বৃষ্টির রাতে নীলা উঠে গিয়ে মেজদাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। সুবোধ জেগে থাকলে নীলাকে এ কাজ করতে দিত না। যখন জাগল তখন নীলা উঠে গিয়ে দরজা খুলেছে। রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে নীলাকে ধরল সুবোধ— কোথায় গিয়েছিলে? নীলা দুর্বল গলায় উত্তর দিল — মেজদাকে দরজা খুলে দিতে। ভীষণ রেগে গিয়ে সুবোধ চেঁচিয়ে বলল— কী দরকার তোমার? মাতাল, লোফার, লুম্পেন ওই ছোটো লোকটার কাছাকাছি তুমি কেন গিয়েছিলে? সে কেন তোমার গায়ে হাত দিল? নীলা এবার অবাক হয়ে বলল— গায়ে হাত দিল। কই, না তো। সুবোধ তবু চেঁচিয়ে বলল—আমি নিজে দেখেছি সে তোমার হাত ধরে আছে। অন্ধকারে নীলার মুখের রং দেখা গেল না, নীলা একটু চুপ করে থেকে বলল— চেঁচিও না। বিছানায় চল। বলে দরজায় খিল দিল নীলা। সুবোধের সমস্ত শরীর জ্বলে গেল। সে বলল— কেন গিয়েছিলে? তোমাকে আমি বারণ করিনি ওই লোফারটার কাছাকাছি কখনো যাবে না? নীলা সামান্য হাঁফ ধরা গলায় বলল— দরজা খুলে না দিলে উনি সারারাত বৃষ্টিতে ভিজতেন। সুবোধ ছিটকে উঠল— তাতে কী হত! মাতালের সর্দি লাগে না। কিন্তু তাকে তুমি প্রশ্রয় দাও কেন? এ বাসায় তার আপনজন কেউ নেই? লোফারটা তোমার হাত...। সামান্য কঠিন হল এবার নীলার গলা— তুমি নিজে দেখেছ? বাস্তবিক সুবোধ কিছুই দেখেনি, সে উঠে দেখেছে নীলা ঘরে ফিরে আসছে, তবু কেন যেন তার মনে হয়েছিল ওরকম কিছু একটা হয়েছে। তাই সে গলার তেজ বজায় রেখে বলল— হ্যাঁ, দেখেছি। নীলা আস্তে আস্তে বলল— উনি মাতাল অবস্থাতেও চিনতে পেরে আমায় বললেন— তোমাকে কষ্ট দিলাম বউমা। আমার হাতে ওঁর হাত লাগেওনি। সত্যিই কি তুমি নিজে দেখেছ। সুবোধের আর তেমন কিছু বলার ছিল না, তবু সে খানিকক্ষণ গোঁ গোঁ করল। সারারাত ঘুমের মধ্যেও ছটফট করল। জ্বালা যন্ত্রণা হিংস্রতার এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি। হাতের কাছেই নীলা, তবু কেন নীলাকে দূরের বলে মনে হচ্ছে কে জানে! পরদিন থেকে ব্যাপারটা অন্য চেহারা নিল। রাতে সুবোধের চিৎকার সবাই শুনেছিল, সম্ভবত হাত ধরার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে নিয়েই মা আর বড়দা কিছু বলেছিল মেজদাকে, মেজদার সম্বন্ধে তখন ওরকম কোনো ব্যাপারই অবিশ্বাস্য ছিল না। সুস্থ অবস্থায় সম্ভবত মেজদাও বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল কি না। তাই পরদিন থেকেই মেজদা কেমন মিইয়ে গেল। দিনের বেলাতে আর বাসায় থাকতই না। নীলা সুবোধকে এ ব্যাপারে সরাসরি দায়ী করেনি, কিন্তু তখন থেকেই আলাদা বাসা করার জন্য সুবোধকে বলতে শুরু করে নীলা। তাই বিয়ের দু—বছরের মাথায় সুবোধ আলাদা হয়ে এল।

তবু শান্তি ছিল না সুবোধের। যাতায়াতের পথে দেখত রকে বসে পাড়ার ছেলেরা মেয়েদের টিটকিরি দিচ্ছে,পথে ঘাটে দেখত সুন্দর পোশাক পরে সুপুরুষ মানুষেরা যাচ্ছে, কখনো বা বন্ধুদের কাছে শুনত চরিত্রহীনতার নানা রঙদার গল্প। সঙ্গে সঙ্গেই নীলার কথা মনে পড়ত সুবোধের। পৃথিবীতে এত পুরুষ মানুষের ভিড় তার পছন্দ হত না। তার ইচ্ছে নীলাকে সে সম্পূর্ণ পুরুষশূন্য কোনো এলাকায় নিয়ে গিয়ে বসবাস করে। অফিসে বেরিয়ে বোধহয় সে অনেকবার মাঝপথে বাস থেকে নেমে পড়েছে। মনে বিষের যন্ত্রণা। একটু এদিক ওদিক ঘুরে চুপিচুপি ফিরে এসেছে বাসায়। নিঃসাড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছে দোতলায়, দরজায় কান পেতে ভিতের কোনো কথাবার্তা হচ্ছে কি না শুনতে চেষ্টা করেছে। তারপর আস্তে আস্তে দরজায় কড়া নেড়েছে। প্রায়ই দরজা খুলে নীলা অবাক হত— এ কী, তুমি! খুব চালাকের মতো হাসত সুবোধ, বলত— দূর রোজ অফিস করতে ভালো লাগে? চলো আজ একটা ম্যাটিনি দেখে আসি।

শেষের দিকে নীলা হয়তো কিছু টের পেয়েছিল। আর তাকে দেখে অবাক হত না। শক্ত মুখ আর ঠান্ডা চোখে চেয়ে একদিন বলেছিল— চৌকির তলাটলাগুলো ভালো করে দেখে নাও।

ধরা পড়ে মনে মনে রেগে যেত সুবোধ। নিজের সঙ্গে নিজেই বিজনে ঝগড়া করত— কিন্তু একটা কিছু মনে না হলে আমার মনে এরকম সন্দেহ আসছে কেন! আমার মন বলছে কিছু একটা আছেই। বাইরে থেকে আর কতটুকু বোঝা যায়।

তবু নীলা চেখের জল ফেলেনি কোনোদিন। ঝগড়া করেনি। কেবল দিনে দিনে আরও গম্ভীর, শীতল, কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। সুবোধের ধরাছোঁয়ার বাইরেই চলে যাচ্ছিল নীলা। বছর চারেক আগে পেটে বাচ্চচা এল তার। তখন আরও রুক্ষ আরও কঠিন দেখাল নীলাকে। হাসপাতালে যাওয়ার কয়েকদিন আগে সে খুব শান্ত গলায় একদিন সুবোধকে বলেছিল— শুনেছি মেয়ের মুখে বাপের ছাপ থাকে, আমার যেন মেয়ে হয়। সুবোধ অবাক হয়ে বলল— কেন? নীলা মৃদু হেসে বলল— তাহলে প্রমাণ থাকবে যে সে ঠিক বাপের মেয়ে। মুখের আদল তো চুরি করা যায় না। মেয়েটা বাঁচেনি। বড়ো রোগা দুর্বল শরীর নিয়ে জন্মেছিল। আটদিন পর মারা গেল। মুখের আদদল তখনও স্পষ্ট হয়নি। কোথায় যেন একটা কাঁটা এখনও খচ করে বেঁধে সুবোধের। নীলা কথাটা যে কেন বলছিল।

তারপর থেকে সুবোধ জানত যে নীলা চলে যাবে। আজ কিংবা কাল। আজ কাল করে করেও বছর তিনকে কেটে গেল। খুব অশান্তি কিংবা ঝগড়াঝাঁটি কিছুই হয়নি তাদের মধ্যে। বাইরে শান্তই ছিল তারা। ভিতরে ভিতরে বাঁধ তুলে দিল কেবল। অবশেষে নীলা চলে গেল কাল।

সারা সকাল কাটল নির্জনতায়, ঘরের মধ্যে! একরকম ভালোই লাগছিল সুবোধের। দশ বছরের উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, রাগ— এখন আর তেমন অনুভব করা যায় না। কোনো দুঃখও বোধ করে না সে! সন্দেহ হয় নীলাকে সে কোনোদিন ভালোবেসেছিল কি না। সে বুঝতে পারে না ভালো না বেসে থাকলে নীলার প্রতি ওরকম অদ্ভুত আগ্রহই বা তার কেন ছিল! গত দশবছরে নীলার কথা সে যত ভেবেছে তত আর কারও কথা নয়। দুপুরের দিকে ঘরে তালা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বিয়ের আগে যেমন হঠকারী দায়িত্বহীন সুন্দর সময় সে কাটিয়েছে সে—রকমই সুন্দর সময় আবার ফিরে এসেছে আজ। বাধাবন্ধনহীন। মনটা ফুরফুরে রঙিন একটি রুমালের মতো উড়ছে। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়স তার, সামনে এখনও দীর্ঘ জীবন — দায়দায়িত্বহীন। তার চাকরিটা মাঝারি গোছের। উঁচু থাকের কেরানি। তাদের দু—জনের মোটামুটি চলে যেত। এবার একা তার ভালোই চলবে। নীলা টাকা চাইবে না বলেই মনে হয়। চাইলেও দিয়ে দেওয়া যাবে। মোটামুটি নীলার ভাবনা থেকে মুক্তিই পেয়েছে সে। এবার পুরোনো আড্ডাগুলোয় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। এবারে গ্রীষ্মে প্রতিটি ফুটবল খেলাই দেখবে সে। রাতের শোয়ে দেখবে সিনেমা। ছুটি পেলেই পাড়ি দেবে কাশ্মীর কিংবা হরিদ্বারে, দক্ষিণ ভারত দেখে আসবে। এবার থেকে সে মাঝেমধ্যে একটু মদ খাবে। খারাপ মেয়েমানুষের কাছে যায়নি কোনোদিন, এবার যাবে। আর দেখে আসবে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। মুক্তি— মুক্তি— তার মন নেচে উঠল।

হোটেলে খেয়ে আর ঘরে ফিরল না সুবোধ। সিনেমায় গেল। দামি টিকিটে বাজে বই দেখে বেরিয়ে গেল কলেজ স্ট্রিটে। ঘিঞ্জি পুরোনো একটা চায়ের দোকানে আট নয় বছর আগেও তাদের জমজমাট আড্ডা ছিল। সেখানে পরপর কয়েক কাপ চা খেয়ে সন্ধে কাটিয়ে দিল সুবোধ। পুরোনো বন্ধুদের কারোই দেখা পেল না। বেরিয়ে পড়ল আবার।

সন্ধে সাতটা। কোথায় পাওয়া যায়!

অনেকদিনে আগে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে শখ করে মদ খেয়েছে সুবোধ। সঙ্গীছাড়া কোনোদিন খায়নি। মদের দোকানগুলোকে সে ভয় পায়। তবু আজ একটু খেতে ইচ্ছে করছিল তার। উত্তেজনার বড়ো অভাব বোধ করছিল সে।

বাসে ট্রামে ভিড় ছিল বলে সে হেঁটেহেঁটে এসপ্ল্যানেডে এল। অনেক মদের দোকানের আশেপাশে ঘুরে দেখল। বেশি বাতি, বেশি লোকজন, হইচই তার পছন্দ নয়। অনেকগুলো দেখে সে গলি—ঘুঁজির মধ্যে একটা ছোট্ট দোকান পছন্দ করে ঢুকল। ভিতরে আলো কম, দু—চারজন লোক বসে আছে এদিক—ওদিক। কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে— আবছা আলোয় তাদের মুখ বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েগুলোর দিকে বেশি তাকাল না সুবোধ। ফাঁকা একটা টেবিলে দেওয়াল ঘেঁষে বসল। বেয়ারা এলে একসঙ্গে তিন পেগ হুইস্কির হুকুম করল সে।

বেশিক্ষণ লাগল না। অনভ্যাসের মদ তার মাথায় ঠেলা মারতে থাকে। আস্তে আস্তে গুলিয়ে যায় চিন্তাভাবনা, শরীরের মধ্যে একটা অবোধ কষ্ট হতে থাকে, পা দুটো ভারী হয়ে ঝিনঝিন করে। এই তো বেশ নেশা হচ্ছে— ভেবে সুবোধ কাউন্টারের কাছে দাঁড়ানো একটি মেয়ের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি পরিচিতার মতো হাসে। সুবোধ হেসে তার উত্তর দেয়। পরমুহূর্তেই গ্লাসে চুমুক দিয়ে চোখ তুলে সে দেখে মেয়েটি তার উলটোদিকের চেয়ারে বসে আছে। মেয়েটি কালো, মোটা থলথলে, বয়স ত্রিশের এদিক—ওদিক। মেয়েটি বলে— বাব্বাঃ, তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু খাওয়াও তো।

কোনো—কোনো বন্ধুর কাছে এদের কথা শুনেছে সুবোধ। তাই অবাক হয় না। মেয়েটির জন্যও এক পেগের হুকুম দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে— তোমার ঘর কোথায়?

—কাছেই। যাবে?

—মন্দ কী?

—তবে আরও দু—পেগের বলে দাও। তাড়াতাড়ি বলো। এরপর বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবোধ আরও দু—পেগের কথা বলে দিয়ে হাসল— মদ খাও কেন?

—তুমি খাও কেন?

—আমার বউ চলে গেছে।

—আমার স্বামীও চলে গেছে। বলেই মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে বলে— শোনো, ঘরে যেতে কিন্তু ট্যাক্সি করতে হবে। হেঁটে যেতে নেশা থাকে না।

—ট্যাক্সি! হাঃ হাঃ। বলে হাসল সুবোধ। তার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। বলল

—আমার বউয়ের গল্প তোমাকে শোনাব আজ—

—খুব ছেনাল ছিল?

—না না। ছেনাল নয় তবে অন্যরকম—

—চলে গেল কেন?

—সেটাই তো গল্প।

—ওরকম আকছার হচ্ছে। তোমার বউয়ের দুঃখ আমি ভুলিয়ে দেব।

—দুঃখ! বড়ো অবাক হল সুবোধ। দুঃখের কোনো ব্যাপারই তো নয় নীলার চলে যাওয়াটা! তবু নেশার ঘোরে এখন তার মনটা হু—হু করে উঠল। দুঃখিত মনে সে মাথা নেড়ে বলল— হ্যাঁ, খুব দুঃখের গল্প—

—কেটে যাবে। বিলটা মিটিয়ে দাও।

বিল মেটাল সুবোধ। তারপরও গোটা ত্রিশেক টাকা রইল ব্যাগে। মেয়েটা আড়চোখে দেখে বলল— তুমি কি আমার ঘরে সারারাত থাকবে?

—মন্দ কী? সুবোধ হাসল।

—ত্রিশ টাকায় হবে না কিন্তু।

—হবে না?

—হয়! বলো না, এই বাজারে...ত্রিশ টাকায় ঘণ্টা দুই, তার বেশি না।

—না। ত্রিশ টাকায় সারারাত।

—পাগল!

—তবে কেটে পড়ো। আমি কেরানির বেশি কিছু না।

দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি। গ্লাস নিঃশেষ করে আঁচলে মুখ মুছল। বলল—মদ খাওয়ালে, ভালোবাসলে, ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

—কেটে পড়ো।

—ঠিক আছে। চলো। ত্রিশ টাকাতেই হবে, আহা তোমার বউ চলে গেছে— না? ঠিক আছে, চলো তো দেখি তোমার বউ ভালো না আমি ভালো। বলতে বলতে সুবোধকে হাত ধরে টেনে তুলল মেয়েটা।

ট্যাক্সিতে সুবোধ মেয়েটির কাঁধে মাথা রেখেছিল। সস্তা প্রসাধন আর তেলের বিশ্রী গন্ধ। তবু মুখ সরিয়ে নিতে তার ইচ্ছে করছিল না। মেয়েটি ট্যাক্সিওয়ালাকে নানা জটিল পথে নিয়ে যেতে বলছে। কথা আর কথায় বুক ভরে আসছিল সুবোধের। সে অনর্গল কথা বলছিল— নীলার কথা, কাল রাতের স্বপ্নের কথা, মেজদার কথা, মরা মেয়েটার কথা। কখনো সে বলছিল সে এবার বেড়াতে যাবে হরিদ্বারে, যাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, ফুটবল ম্যাচ দেখবে। একা—একাই থাকবে সে। মেয়েটি কোনো কথাতেই কান দিল না। শুধু মাঝে মাঝে বলল— শুয়ে পড়ো না বাপু গায়ের ওপর। পুরুষমানুষগুলো যা ন্যাতানো হয়, একটু দুঃখ—টুঃখ হলেই গড়িয়ে পড়ে। কথাগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারছিল না সুবোধ। দুঃখ! দুঃখ কীসের! মেয়েটি জানেই না তার মন রঙিন একখানা রুমালের মতো উড়ছে।

ট্যাক্সি যেখানে থামল সে জায়গাটা সুবোধ চিনল না। শুধু টের পেল গোলকধাঁধার মতো খুব জটিল প্রকাণ্ড একটা বাড়ির মধ্যে সে ঢুকে যাচ্ছে। অনেক সিঁড়ি, সরু বারান্দা, আবার সিঁড়ি— বিচিত্র অচেনা লোকজন, মাতাল, বেশ্যা, ফড়ের গা ঘেঁষে মেয়েটি তাকে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে নীলার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে। অথচ, জানে না দুঃখই নেই আসলে। ভেবে সে হাসল— ভালো জায়গায় থাকো তুমি— কী যেন নাম তোমার!

মেয়েটি বলল— অনিলা।

হাসল সুবোধ— চালাকি হচ্ছে?

—কেন?

আমার বউয়ের নাম তো নীলা।

—ওমা! তাই নাকি! বলোনি তো।

—বলিনি?

—না। মাইরি...

—চালাকি হচ্ছে? অ্যাঁ!

মেয়েটি হাসে— সত্যিই আমি অনিলা। তোমার বউয়ের উলটো। দেখো প্রমাণ পাবে। খুব সুন্দরী ছিল তোমার বউ? ফরসা?

—না। কালোই। মন্দ না।

—খুব কালো?

—না। শ্যামবর্ণ। এই আমার গায়ের রং।

—ওমা! তুমি তো ফরসাই?

—যাঃ— হাসল সুবোধ। লজ্জায়।

ঘরখানা ভালোই। ছিমছাম। বসতে ঘেন্না হয় না। পরিষ্কার বিছানাটাই আগে চোখে পড়ল সুবোধের। ভারী মাথা নিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বলল— মদ খেয়ে কিছু না হয়। উত্তেজনা লাগছে না।

—আর খাবে?

—না। পয়সা নেই।

—পয়সা না থাক, ঘড়ি আংটি আছে। জমা রেখে খেতে পার। পরে পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে।

—না। আর খেলে ঘুম পাবে, বমিও হবে।

—তবে থাক।

সুবোধ মেয়েটিকে অনাবৃত হতে দেখছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হল, জিজ্ঞেস করল— আজ কি তোমার আর খদ্দের আছে? তাড়াতাড়ি করছ কেন?

—মেয়েটি হাসল— আছে। কিন্তু তোমার কী! তোমাকে আলাদা বিছানা করে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। তুমি টেরও পাবে না।

—পাব না?

—না।

মেয়েটি কাছে আসে। আস্তে আস্তে উঠে বসে সুবোধ— তুমি তো অনিলা!

—হুঁ।

—দূর। তাহলে হবে না। বলে হাই তোলে সুবোধ।

—কেন?

সুবোধ উত্তর দেয় না! অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে থাকে। নীলা! নীলা! এখন কোথায়। তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খায়। পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ পুরুষ তার মধ্যে নীলা একা কোথায় চলে গেল? কী করছে এখন নীলা?

মেয়েটি বলে— আমার দিকে তাকাও। দ্যাখো না আমাকে।

সুবোধ গোরুর মতো নিরীহ চোখে তাকায়। হাসে। বলে— দুর। তোমার দ্বারা হবে না।

— কেন?

—তুমি তো পরিষ্কার মেয়ে। কিচ্ছু লুকোনো নেই তোমার। তোমাকে একটুও সন্দেহ হয় না।

—বাঃ! তা তুমি চাও কী?

—সন্দেহ করতে। বলতে বলতে হাসে সুবোধ। হেসে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

চিহ্ন

অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে জ্বলন্ত মোমবাতি।

হলুদ আলোয় যেন জলের মধ্যে জেগে আছে ইভার মুখ। মুখখানা এখন ভৌতিক। একটু নীচুতে আলো, শিখাটা হেলছে, দুলছে, কাঁপছে। ইভার মুখে সেই আলো। গালের গর্তে, চোখের গর্তে, কপালের ভাঁজে ছায়া। মুখখানা যেন বা এখন ইভার নয়। ইভা এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে। মাঝখানের পরদা উড়ছে হাওয়ায়।

অমিত বলে— সাবধান। পরদায় আগুন না লাগে!

ইভা কিছু বলল না। জলে ক্লান্ত সাঁতারু যেমন শ্লথ গতিতে ভেসে যায়, তেমনি এ ঘর থেকে ও ঘরে চলে গেল।

অন্ধকারে চৌকিতে বসে আছে অমিত। তার কোল ঘেঁষে পাঁচ বছরের ছেলে টুবলু আর তিন বছরের মেয়ে অনিতা। যখনই কারেন্ট চলে যায় তখনই অমিত তার দুই ছেলে—মেয়েকে ডেকে নিয়ে বিছানায় বসে থাকে। বড্ড ভীতু অমিত। অন্ধকারে কোথায় কোন পোকামাকড় কামড়ায় কিংবা আসবাবপত্রে হোঁচট লাগে। কিংবা খোলা পড়ে—থাকা ব্লেড বা ইভার পেতে—রাখা অসাবধান বঁটিতে গিয়ে পড়ে। কিংবা এরকম আর কিছু হয় সেই ভয় তার। বুক ঘেঁষে ছেলে—মেয়েরা বসে আছে বুকের দুই পাঁজরে দু—জনের মাথা। অমিত ঘামছে।

—একটা মোমবাতি এ—ঘরে দেবে না? অমিত চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

রান্নাঘর থেকে ইভার উত্তর আসে না! ইভা ও রকমই। আজকাল দু—তিনবার জিজ্ঞেস না করলে উত্তর দেয় না।

—কী গো? অমিত বলল।

ইভা আস্তে বলে— মোমবাতি দিয়ে কী হবে? তোমরা তো বসেই থাকবে এখন।

—অন্ধকারে কি ভালো লাগে?

—না লাগলেও কিছু করার নেই। মোমবাতি একটাই ছিল।

—ওঃ। অমিত সিগারেট ধরাল।

অনিতার মাথাটা বুক থেকে স্খলিত হয়ে কোলে নেমে গেল। তার দ্রুত শ্বাস—প্রশ্বাসের শব্দ হয়। ঘুমিয়ে পড়বে মেয়েটা।

অমিত নীচু হয়ে ডাকল— অনি, ও অনি!
—উঁ। ক্ষীণ পাখি—গলায় সাড়া দেয় অনিতা।
—এখন ঘুমোয় না মা, ভাত খেয়ে ঘুমোবে।
—খাবো না।
—খাবে না কি? খেতে হয়। গল্পটা শোনো।
ঘুমগলাতেই অনিতা বলে— বলো তাহলে।

এইটুকু বয়সেই কি টনটনে উচ্চচারণ মেয়েটার। পরিষ্কার কথা বলে, এতটুকু শিশুসুলভ আধো—কথার জড়তা নেই। অমিত মাঝেমাঝে ইভাকে বলে— আমরা ছেলেবয়সে এত পাকা কথা বলতে পারতামই না। এখনকার ছেলে—মেয়েরা কীরকম অল্প বয়সেই পাকা হয়ে যায়।

ঘুমন্ত মেয়েটাকে টেনে বসায় অমিত। মাথাটা আবার পাঁজরে লাগে। অনেকক্ষণ চুপচাপ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে টুবলু বলে— আমি ঘুমোই না। ঘুমোই বাবা?

—না তো। তুমি লক্ষ্মী ছেলে।

ছেলেটার জন্য কত মায়া অমিতের, ভারি ভীতু ছেলে, ঘরকুনো। এ—বয়সে যেমন দুরন্ত হয় বাচ্চচারা, তেমন নয়। রোগা দুর্বল ন্যাতানো। স্টেশন রোড—এর এক বুড়ো হোমিওপ্যাথ গত বছরখানেক যাবৎ ওষুধ দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেটার তেমন বাড়ন নেই। খেতে চায় না, কখনো ওর তেষ্টা পায় না, খেলে না। ইভার ইচ্ছে একজন চাইল্ড স্পেশালিস্টকে দেখায়। সেটা হয়তো ধারকর্জ করে দেখাতেও পারত অমিত। কিন্তু তার কলেজের একজন কলিগ ছেলেকে স্পেশালিস্ট দিয়ে দেখানোর পর যে খাওয়ার চার্ট আর ওষুধ বিষুধের ফিরিস্তি দিয়েছিল তাতে অমিত ভড়কে যায়। তাই গত একবছর যাবৎ ইভা বিস্তর অনুযোগ করা সত্ত্বেও অমিত গা করেনি। যাক গে, কৃষ্ণের জীব, টিকটিক করে বেঁচে থাক। বড়ো হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলে বয়সে অমিতও তো কত ভুগেছে, মাসেক ধরে রক্ত আমাশা, চিকিৎসা ফিকিৎসা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। গ্যাঁদাল পাতা বাটা, থানকুনির ঝোল, পুরোনো আতপ চালের গলা ভাত, পাড়ার এল এম এফ ডাক্তারের দেওয়া ক্যাস্টর অয়েল ইমালশান, এই খেয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে আজও বেঁচে আছে। তার ছেলেটাই বা তাহলে বাঁচবে না কেন?

সিগারেটের আগুন ফুলকি ছড়াচ্ছে। অন্ধকারে হাতড়ে অ্যাসট্রেটা ঠাহর করে অমিত। সাবধানে ছাই ঝাড়ে। বলে— একদিন একটা টিয়াপাখি উড়ে এল খরগোশের বাড়িতে, বলল— খরগোশ ভাই, আমি তোমার কাছে থাকব। খরগোশ— থাকবে তো। কিন্তু ঘর কোথায়! আমার তো ছোট্ট একটু খুপড়ি! টিয়াপাখি বলে— আমার বাসা পড়ে ভেঙে গেছে, এখন আমার ডিম পাড়বার সময়, তাহলে উপায়? তখন খরগোশটায় দয়া হল, একটা ছোট্ট খুপরি বানিয়ে দিল, টিয়াপাখিটাকে। টিয়াপাখি থাকে, ডিম পাড়ে, তা দেয় মনে ভারি আনন্দ, ডিম ফুটে বাচ্চচা বেরুবে। কত আদর করবে বাচ্চচাকে, উড়তে শেখাবে, খেতে শেখাবে, শিকার করতে শেখাবে। খরগোশ একদিন খাবার আনতে বাইরে গেছে, এমন সময়ে এক মস্ত ইঁদুর এসে হাজির। বলল— এই টিয়াপাখি, দে তোর দুটো ডিম। টিয়া বলল, কেন দেব? ডিম ফুটে আমার বাচ্চচা হবে, কত আদর করব, তোকে দেব কেন? ইঁদুর বলল— দিবি না তো। তবে রে বলে দাঁত বের করে কামড়াতে গেল...অনি ও অনি।

—উঁ।
—আবার ঘুমোচ্ছিস? বলে অমিত গলা ছেড়ে বলে— ইভা, ভাত হয়েছে? অনি ঘুমিয়ে পড়ছে যে।
—বাবা, তারপর? জিজ্ঞেস করে টুবলু।
—বলছি দাঁড়া। দ্যাখ না বোন ঘুমিয়ে পড়ছে! ও অনি!

হঠাৎ অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো আসে ইভা। কথা বলে না। নড়া ধরে হিঁচড়ে টেনে নেয় মেয়েটাকে। ছেলেটাকে টানতে হয় না। ভীতু ছেলে। অন্ধকারেই টের পায় মা—র মেজাজ ভালো নেই। সে রোগা পায়ে

লাফ দিয়ে নামে চৌকি থেকে। মার পিছু পিছু বাধ্য ছেলের মতো যায়।

দু—ঘরের মাঝখানে পরদা উড়ছে। ওপাশেরটা আসলে ঘর নয়। রান্নাঘর। সেখানে মোমের আলোর আভা। অন্ধকারে বসে অমিত সেই মৃদু আভার দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটা খেতে চাইছে না। ইভা তার হাতের চুড়ির শব্দ তুলে দুটো চড় কষাল। মেয়েটা কাঁদছে। ইভা চাপা স্বরে মেয়েকে বকছে এবং মেয়েকে বকতে—বকতেই বকার ঝাঁঝটা নিজের কপালের এবং ভাগ্যের প্রসঙ্গে বলে যাচ্ছে। অমিত চুপ করে বসে শোনে। ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে একটা লাথিতে মেয়েমানুষটাকে চুপ করায়।

লাথি যে কখনো মারেনি অমিত তা নয়। লাথি বা চড় চাপড় কয়েকবারই মেরে দেখেছে। লাভ হয় না। সদ্য সদ্য একটু ফল হয় বটে কিন্তু ইভা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

অবিকল ছাগলের মতো একটা লোক গলা পরিষ্কার করছে কোথায় যেন। 'হ্যা—ক' 'হ্যা—ক' শব্দটা শুনলে নিজেরও যেন বমি তুলতে ইচ্ছে করে।

কান্না থামিয়ে ছেলে—মেয়েরা এখন খাচ্ছে। গুন গুন করে এখন আবার সোহাগের গলায় ওদের গল্প শোনাচ্ছে ইভা। ইভাকে নিয়ে দিনের অধিকাংশ সময় ভাবে অমিত। বিয়ে করা তারা সুখী না অসুখী তা ঠিক বুঝতে পারে না। কেউই বোধহয় পারে না। মেয়েমানুষ জাতটার মুখের সঙ্গে মনের মিল নেই। যখন তারা খুবই সুখে আছে তখনও পুরোনো দুঃখের কথা তুলে খোঁটা দেবেই।

খেয়ে—দেয়ে ওরা এল। ইভা মশারি টাঙাল। ওরা গল্পের বাকি অর্ধেকটা না শুনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কারেন্ট এখনও আসেনি। পৃথিবীজোড়া অন্ধকার।

মোমবাতিটা মাঝখানে রেখে দু—ধারে নিঃশব্দে খেতে বসে ইভা আর অমিত, সম্পর্কটা সহজ নেই যেন। একধারে ছেলে—মেয়েদের এঁটো থালা পড়ে আছে। তাতে ডাল—ঝোল মাখা কিছু ভাত। অমিত আড়চোখে চেয়ে দেখল। এখন দু—টাকা আশি কেজি যাচ্ছে চাল। তাদের রেশন কার্ড নেই। বলল— ভাত নষ্ট করো কেন।

—কী করব? শেষ কয়েকটা গরাস খেল না।

—কম করে নেবে। গুচ্ছের গেলাতে চাইলেই কি হয়। ওদের পেটে জায়গা কত।

—দুটো ভাতই তো, আর কী ভালোমন্দ খায়! ঘি মাখন মাছ—মাংস কি যায় ওদের পেটে?

—গরিবের সন্তান, যা জোটে তাই খেয়ে বাঁচবে।

—মুরোদ না থাকলেই ওসব কথা বলে লোকে।

—চালের দাম জানো?

—জানতে চাই না।

মেয়েমানুষটা ঝগড়া পাকিয়ে তুলছে। রোগা, দুর্বল, রক্তহীন। তবু গলা এতটুকু ক্ষীণ নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ইভার। বিয়ের সাত বছর ধরে প্রতিদিন অমিত যত অন্যায় করেছে, যত অবহেলা, যত অপমান সব হুবহু মুখস্থ বলে যায়। মেজাজ ভালো থাকলে মাঝে মাঝে বলে— এরকম মেমারি নিয়ে লেখাপড়া করলে না ইভা, কেবল স্কুল ফাইনাল পাস করে বসে রইলে।

জ্বলন্ত মোমবাতির ওপর দিয়ে বাঘের চোখে ইভার দিকে চেয়ে থাকে অমিত। ইভাও চেয়ে থাকে বনবেড়ালের মতো। একটুও ভয় পায় না। ভিতরটা হতাশায় ভরে যায় অমিতের। কীরকম করলে কীভাবে তাকালে সেও একটু ভয় পাবে। একটু সমীহ করবে তাকে। অমিত আবার পাতের ওপর মুখ নামায়। লাল রুটিগুলো দেখে এবং ভাবতে থাকে সে হিপনোটিজম শিখবে। কিংবা আরও রাগি হয়ে যাবে। কিংবা একদিন কিছু না বলে কয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

নিরুদ্দেশও একবার হয়েছিল অমিত এক রাতের জন্য। পরদিন ফিরে দেখে ইভার কি করুণ অবস্থা। পাড়াসুদ্ধ মেয়েপুরুষে ঘর ভরতি, মাঝখানে পাথর হয়ে ইভা বসে, দু—চোখে অবিরল ধারা। তাকে দেখে সাতজন্মের হারানো ধন ফিরে পাওয়ার মতো উড়ে এসেছিল। তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই দৃশ্য

মনে পড়লে আজও বুকে ব্যথা করে। ইভার ভালোবাসাও তো নিখাদ। অমিতও কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। তেরাত্রি ইভাকে ছেড়ে থাকলে নিজেকে অনাথ বালকের মতো লাগে। সেই জন্যই ইভা বহুকাল বাপের বাড়ি যায় না। অমিতের জন্য।

চালওয়ালা দুঃখিত মুখখানি তুলল। ভ্রাম্যমাণ পুরুত কপালে চন্দনের আর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে গোঁজা বিল্বপত্র। শ্বাস ফেলে বলে— তিন টাকা দশ।

—বলো কী? অমিত চমকায়। তার মাস মাইনে একশো আশি প্লাস কলেজ ডি—এ। রেশন কার্ড নেই।

করুণ একটু হাসে চালওয়ালা— আজ তো এই দর। কাল আবার কী হবে কে জানে।

—গত সপ্তাহে দু'টাকা আশি করে নিয়েছি।

—গত সপ্তাহে! সে তো বাবু গত সপ্তাহ। বলে পাল্লা তুলে বলে— কতটা দেব?

দশ কেজি নেওয়ার কথা বলে দিয়েছিল ইভা। কিন্তু সাহস পেল না অমিত। বলল— চার কেজি।

—গত সপ্তাহে আপনাকে বলেছিলাম, কিছু বেশি করে নিয়ে রাখুন। এ সময়টায় দর চড়ে। চাল ওজন করতে করতে চালওয়ালা বলে। তারপর বিড়বিড় করতে থাকে রাম...রাম...দুই...দুই...তিন...তিন...

ক—বছর আগেও চাল কিনলে এক আঁজলা কি এক মুঠো ফাউ দিত। এখন আঙুলের ডগায় গোনাগুণতি দশ কি বারোটা চাল বাড়তি দিল।

ঘামে পিছলে নেমে এসেছিল চশমাটা। অমিত ঠেলে সেটা সেট করল। ইভাকে ধমক দিতে হবে। ছেলে—মেয়েদের পাতে যেন আর ভাত নষ্ট না হয়। আর, এবার থেকে ইভা আর অমিতের মতো ওরাও রাতে রুটি খাবে। পেটে সহ্য হয় না বললে চলবে না। সকলের ছেলে—মেয়ে রুটি খায় ওদের ছেলে—মেয়ে খাবে না কেন? খেতে—খেতে অভ্যাস হয়ে যাবে। ইভা হয়তো ঝগড়া করবে, তেড়ে আসবে, তবু বলতে ছাড়বে না অমিত।

বাজার আর চালের বোঝা দু—হাতে নিয়ে হাঁটতে—হাঁটতে অমিত ইভা কী বলবে এবং সে তার কী উত্তর দেবে তা ভাবতে—ভাবতে যায়। এবং মনে—মনে সে ঝগড়া করতে থাকে। প্রচণ্ড ঝগড়া করতে থাকে। প্রচণ্ড ঝগড়া। রাগে ফেটে পড়ে। ইভাকে লাথি মারে, চুলের ঝুঁটি ধরে হিঁচড়ে টেনে বের করে দেয় ঘর থেকে, বলে— ইঃ নবাবের মেয়ে।

কিন্তু সবই ঘটে মনে—মনে। একটু অন্যমনস্কভাবে সে রাস্তায় দূরত্ব অতিক্রম করতে থাকে। আজকাল ইভার কথা ভাবলেই তার মাথা আগুন হয়ে ওঠে। মনে—মনে সে যে কত গাল দেয় ইভাকে। ভালোও কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। এবং এই দুটি অনুভূতিই তাকে দু—ভাগে ভাগ করে খেয়ে নিচ্ছে।

ইভা রাগ করল না। মন দিয়ে অমিতের কাছে চালের দর, দেশের দুর্দিনের কথা শুনল। তারপর সংক্ষেপে বলে— দেখি।

—হ্যাঁ। দ্যাখো। গাঁয়ে মাস্টারি করতাম, সে বরং ভালো ছিল। শহরে নতুন প্রফেসারি নিয়ে এসে ফেঁসে গেছি। চেনাজানা লোকও তেমন নেই যে টপ করে হাত ধরব, দোকানেও ধারবাকি আনার মতো চেনা হয়নি। বুঝলে?

ইভা বুঝেছে। মাথা নাড়ল। এবং একটু পরে এক কাপ অপ্রত্যাশিত চা—ও করে দিল। ইকনমিক্স—এর সাহা বেঁটে এবং কালো, মুখখানা সবসময়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সহজেই উত্তেজিত হয় লোকটা, সহজেই আনন্দিত হয়। তার সঙ্গে মোটামুটি ভালোই ভাব হয়ে গেছে অমিতের। দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর দেখা হতেই লোকটা খুব উত্তেজিতভাবে বলল— এ হচ্ছে অঘোষিত দুর্ভিক্ষ। ফেমিন ইন ফুল ফর্ম।

—তাহলে সেটা ওরা ডিক্লেয়ার করুক।

তাই করে? ইজ্জতের প্রশ্ন আছে না? আমি সেদিন ঠাট্টা করে একজন ছাত্রকে বোঝাচ্ছিলাম, ইনফ্লেশন কাকে বলে। বলছিলাম, এখন দেখছ বাবা পকেটে টাকা নিয়ে যায় আর থলি ভরে বাজার করে নিয়ে আসে।

যখন দেখবে থলি ভরে নিয়ে যায় আর পকেট ভরে বাজার নিয়ে আসে তখনই বুঝবে ইনফ্লেশন। জার্মানিতে বিশ্বযুদ্ধের পর ওরকমই হয়েছিল। এখন দেখছি ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা দিনকে দিন তাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নাইনটিন সিকসটি ওয়ানের তুলনায় টাকার ভ্যালু...

কিন্তু এও ঠিক, সকালে তিন টাকা দশ কিলো দর—এ চাল কিনলেও অমিত টেরিকটনের হাওয়াই শার্ট পরে কলেজে এসেছে। পরনে জলপাইরঙা টেরিলিনের প্যান্ট, পায়ে বাটার জুতো, গাল কামানো। এখনও অধ্যাপকদের পরনে এরকমই পোশাক, কিংবা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি আর ভালো তাঁতের ধুতি। কিন্তু ক্লেশের চিহ্ন নেই।

একজন অধ্যাপক বলে— দক্ষিণ ভারত থেকে এক সন্ন্যাসী ডিক্লেয়ার করেছে সেভেনটি ফোর ইজ দি ব্ল্যাকেস্ট ইয়ার ইন দি হিস্টোরি অফ ম্যানকাইন্ড—

এ সবই হচ্ছে হাই—তোলা কথা। গায়ে লাগে না কারও। অধিকাংশ অধ্যাপকই অধ্যাপকসুলভ গম্ভীর, বিদ্যাভারাক্রান্ত চিন্তাশীল। দু—চারজন ছোকরা প্রফেসর একটু কথা চালাচালি করে হালকাভাবে। সামান্য একটু অস্বস্তিবোধ করে অমিত এখনও। দশ বছর স্কুল মাস্টারি করার পর হঠাৎ চাকরিটা পেয়েছে সে। অধ্যাপকদের মেলায় এখনও নিজেকে একটু ছোটো লাগে তার। যেন বা দয়ার পাত্র সকলের। কিন্তু তা নয়। এখানে কেউ কাউকে তেমন লক্ষ করেই না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাঁয়ে থেকে নোনা বাতাসে অমিত একটু কালো হয়ে গেছে, একটু গ্রাম্যও। তাই বোধ হয় সে একাই বসে—বসে সকালে শোনা অবিশ্বাস্যভাবে চালের কথা ভাবে। সেই মহার্ঘ ভাত এখনও তার পেটে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

কলকাতায় এসেই রেশন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছিল। এখনও এনকোয়ারি হয়নি। কবে যে হবে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আশুতোষ মুরুব্বি গোছের লোক। পলিটিকস করে, নেতাদের সঙ্গে ভালোবাসা আছে। সে অভয় দিয়েছিল।

কলেজের পর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অমিত গেল তার কাছে।

—একটু দেরি হতে পারে বুঝলে পেঁপেচোর! আশু বলে— রিসেন্টলি একগাদা ভুয়া কার্ড ধরা পড়েছে। এনকোয়ারি না করে নতুন কার্ড ইসু করবে না।

—তুমি তো জানোই ভাই, আমার লুকোছাপা কিছুই নেই। আমরা স্বামী—স্ত্রী আর দুটো মাইনর—

—হয়ে যাবে। ভেবো না।

—চালের দর আজ—

—জানি, আমিও তো ভাত খাই।

—আর দু—চারদিন খোলা বাজারে চাল কিনলে আমার থ্রম্বসিস হয়ে যাবে।

আশু হাসল। বলল, তুমি তো তবু পেঁপেচোর। আমি যে কেন্নো!

আশু বোধহয় প্রফেসরিটাকে তেমন ভালো চোখে দেখে না। অমিত চাকরিটা পাওয়ার পর থেকেই আশু তাকে প্রফেসরের বদলে পেঁপেচোর বলে ডেকে আসছে। কেরানি হল গে কেন্নো।

—দ্যাখো ভাই। বলে অমিত।

আশু তাকে খাতির করল। ক্যান্টিনে নিয়ে ফ্রুট স্যালাড খাওয়াল। কফিও খাওয়াতে—খাওয়াতে বলল— দুর্দিনের জন্য তৈরি হও। সারা দুনিয়ায় এবার ফলন কম। রাশিয়া, চিন সবাই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছে।

পিওর ম্যাথম্যাটিক্সের প্রফেসর অমিত এত খোঁজ রাখে না। তার বাড়িতে খবরের কাগজ নেই। উদবেগের সঙ্গে বলে— সে কী?

বলছি কী! কেবল ওই মার্কিন মুলুকেই যা ফলার ফলেছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইস্যুতে আমেরিকার সঙ্গে বাম্বু হয়ে গেছে আমাদের।

—দুনিয়ার মাটি কি শুকিয়ে যাচ্ছে আশু?

—শুকোবে না? যুবতী তো বুড়ি হয় ভাই।

যুবতী ও বুড়ির কথায় তৎক্ষণাৎ অমিতের ইভার কথা মনে পড়ে। বাস্তবিক যুবতী যে কী বুড়ি হয় তা অমিতের চেয়ে বেশি কে আর জানে! দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সেই গাঁয়ের কিশোরী মেয়েটি কত চট করে বুড়ি হয়ে গেল। ব্রোঞ্জের চুড়িওয়ালা এত ঢলঢল করে হাতে যে মনে হয় হঠাৎ বুঝি খসে পড়ে যাবে। হাতেটাতে শিরা উপশিরা জেগে আছে। ভেজাল তেলের জন্যই কিনা কে জানে, মাথার চুলও উঠে শেষ হয়ে এসেছে। মুখের ডৌল দেখে অমিতের চেয়েও বেশি বয়সী মনে হয়।

কত লোকের কত থাকে, কিন্তু অমিতের ওই একটা বই মেয়েমানুষ নেই। রাগ সোহাগ সব ওই একজনের ওপর। যুবতী বলো যুবতী, বুড়ি বলো বুড়ি, অমিতের ওই একটাই মেয়েমানুষ। ভাবতে—ভাবতে হঠাৎ অমিত মনে—মনে ঠিক করে, আজ ফিরে গিয়েই ছেলে—মেয়ে দুটোকে শোওয়ার ঘরে কপাট আটকে রেখে রান্নাঘরে ইভাকে জাপটে ধরে হামলে আদর করবে। ভাবতে—ভাবতে তার শরীর চনমন করে ওঠে। সারাদিনের নানা ক্লীবত্ব ভেদ করে পৌরুষ জেগে ওঠে।

চাঁদ নয়, হেমা মালিনী। অনেক ওপরে ধর্মতলার মোড়ে বড়ো বাড়িটার গায়ে লটকানো হোর্ডিং। হোর্ডিং জুড়ে যেন চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার মতো ঝরে—ঝরে পড়ছে হেমামালিনীর হাসি। অবিরল। এবং স্থির সেই হাসি। কে সি দাসের দোকানের উলটো দিকে যেখানে ট্রাম লাইনের কাটাকুটি সেইখানে একটু মেটে জায়গায় কে যেন জল ছিটিয়ে, ভিজিয়ে রেখেছে। সেই ভেজা মাটির ওপর পড়ে আছে একটি যুবতী মেয়ে। ভিখিরি শ্রেণির। মাটির রঙেরই একখানা শাড়ি জড়ানো। কিন্তু সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়েনি। বুকে পাছায় কিছু মাংস এখনও আছে। একটি স্তন কাত হয়ে ঝুলে মাটি স্পর্শ করেছে। আশেপাশে অমিত গুনে দেখল ঠিক চারটে বাচ্চচা। সবচেয়ে ছোটোটা বোধহয় বছর দুয়েকের। পুঁটো—পুঁটো সেইসব বাচ্চচারা উদোম ন্যাংটো। সবাই মড়ার মতো শুয়ে আছে। চোখ বোজা, কেউ নড়ছে না। শ্বাস ফেলার ওঠানামা লক্ষ্য করা যায় না। তাদের চারধারে মেলা দুই নয়া তিন নয়া ছড়িয়ে আছে। তারা কুড়িয়ে নেয়নি। কেউ কুড়িয়ে নেয়নি। দয়ালু মানুষেরাই পয়সা ফেলে গেছে। আবার এও হতে পারে ওইসব ঝড়ে পড়েছে হেমা মালিনীর হাসি থেকেই। কে জানে! অমিত চোখ তুলে দেখল, ভুল নয়, দশমী পুজোর দিন দুর্গামূর্তির হাস্যময় মুখে যেমন কান্নার চোখ ফুটে ওঠে তেমনিই হেমা মালিনীর চিত্রার্পিত মুখে দেবীসুলভ কারুণ্য।

দুর্ভিক্ষ? অমিত চমকে ওঠে। বড়ো হওয়ার পর সে আর দুর্ভিক্ষের কথা ভাবেনি। ধারণা ছিল, দুর্ভিক্ষ এখন আর হয় না। ভারতবর্ষে গম চাল না হলে আমেরিকায় হবে, থাইল্যান্ড, বার্মায়, অস্ট্রেলিয়ায় হবে। পৃথিবী থেকে মানুষ দুর্ভিক্ষ তাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন করে আবার বুক খামচে ধরছে একটা ভুলে যাওয়া ভয়।

পর মুহূর্তেই ভয়টা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে সে। ওই তো মেট্রোর আলো জ্বলছে। দপদপিয়ে উঠছে নানা বিজ্ঞাপনের নিওন সাইন। কত দামি—দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে দামাল, উত্তেজিত, আনন্দিত কলকাতা। ভিখিরির তুলনায় ভদ্রলোক বহু গুণ বেশি।

জায়গাটা পেরিয়ে যায় অমিত দুটি নয়া ছুড়ে দিয়ে। কুড়িয়ে নেবে তো! না কি মরে গেছে ওরা? আত্মহত্যা করেনি তো? না—না, তা করেনি ঠিক। ভিখিরিরা কতরকম অভিনয় করে তার কি শেষ আছে। এটাও একটা কায়দা!

একটু দোটানার মধ্যে থেকে ভারী মনে অমিত বাস স্টপে এসে দাঁড়ায়। বড্ড ভিড়। সে ঠিক এই সব ভিড়ে এখনও অভ্যস্ত নয়। দাঁড়িয়েই থাকে।

দুটো বাড়ন্ত যুবা কথা বলে বাসস্টপে। একজন বলে— কলকাতায় এই যে লোকে বাসে উঠতে পারে না, ঘণ্টার—পর—ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে অফিস টাইমে, কিংবা ঝুলে—ঝুলে যায়; ঠিক সময়ে কোথাও পৌঁছোতে পারে না। এর জন্যই দেখিস একদিন বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। দুমদাম ভদ্রলোকেরা প্যান্ট গুটিয়ে কাছা মেরে ইট পাট কেল ছুড়তে লাগবে, বেমক্কা, ভাঙচুর করে সব উলটেপালটে দেবে একদিন।

অন্যজন হাসে।

অমিত হাসে না। তার মনে একটা ভয়ের প্রলেপ পড়ে। চারিদিকে কী যেন একটা ধনুকের টান—টান ছিলার মতো ছিঁড়বার অপেক্ষায় আছে। যেন এক্ষুনি ছিঁড়বে এবং হুড়মুড় করে পৃথিবীটা ভেঙে পড়বে।
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? নাকি পৃথিবী জোড়া খরা, দুর্ভিক্ষ? নাকি মহাপ্লাবন আবার? কিংবা ছুটে আসবে অন্য একটি গ্রহ পৃথিবীর দিকে যেরকম একটা গল্প সে পড়েছিল ইন্টারমিডিয়েটের ইংরেজি র্যাপিডে।
রাতে শোওয়ার পর নিজস্ব মেয়েমানুষটাকে হাঁটকায় অমিত, হাঁটকায় কিন্তু যা ভুলতে চায় ভুলতে পারে না। কিছুই ভুলতে পারে না। ইভা তার বুক থেকে অমিতের হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, সারাদিন কত খাটুনি যায় বোঝ না তো, ঘুমোতে দাও।
পাশ ফিরে শোয় ইভা।
একটামাত্র মেয়েমানুষ থাকার ওই একটি দোষ। সে দিলে দিল, না দিলে উপোস থাক! অমিত এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় ভেবে পেল না। লাথি মারবে? মেরে দেখেছে অমিত, লাভ হয় না। লাভ নেই। খুব রাগ হয় অমিতের, কিন্তু রাগ চেপে শুয়ে থাকে। কিন্তু তখন বুকে একটা চাপ—বাঁধা কষ্ট হতে পারে। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে গেছে খরায়। বুড়িয়ে গেছে ফলনের পর ফলনে, এবার কালো এক দুর্ভিক্ষ এসে যাবে।
সে স্বপ্নে দেখতে পায়, কাৎ হয়ে শুয়ে থাকা মরা মেয়েমানুষের স্তন ঝুলে সেই মরা মাটি ছুঁয়ে আছে। আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে সে। আকাশ থেকে পয়সা বৃষ্টি হচ্ছে। শুকনো পয়সা ঠনঠন শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। কেউ কুড়িয়ে নিচ্ছে না।
তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাল ইভা। বলল— ফিরে শোও। বোবায় ধরেছে।
অমিত ফিরে শুল। আর তখন হঠাৎ দু—খানা হাতে তাকে কাছে টানল ইভা। চুমু খেল। বলল— এসো।

চালওয়ালার কপালে আজও ভ্রাম্যমাণ কোন পুরুত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে বিল্বপত্র! মুখ তুলে হাসল চালওয়ালা।
অমিত ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে— দর কী হে?
—কমেছে। পুরো তিন। একটু নীচে দু—টাকা আশি। বলে চালওয়ালা পাল্লা হাতে নেয়—কত দেবে?
কমেছে! কমেছে! ঠিক বিশ্বাস হয় না অমিতের।
—দশ কেজি। বলে অমিত।
চালওয়ালা মায়া মমতা ভরে চেয়ে হাসে। বলে— এখন কমতির দিকে।
ভারি ফুর্তি লাগে অমিতের। না, না, বাজে কথা ওসব। পৃথিবী জুড়ে দুর্ভিক্ষ আসছে এ কখনো হয়? চালের দাম কমে যাবে ঠিক।
অমিত হাঁটে। দু—হাতে বোঝা। কিন্তু ভারী লাগে না। আজ ইভা বেশি চাল দেখে খুশি হবে। খুব খুশি হবে।
চারদিকে কতরকম চিহ্ন ছড়ানো, দুর্ভিক্ষের আবার প্রাচুর্যেরও। মানুষ কখন কোনটা দেখে ভয় পায় কোনটা দেখে খুশি হয় তার তো কিছু ঠিক নেই।